জীবন-স্রোত

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীক্ষীরোদলাল দত্ত,
কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস
শ্রীপতি প্রেস
১৪, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা:
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
আর্ট-অ্যাণ্ড পাবলিসিটি সার্ভিস

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৬।

প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য তিন টাকা আট আনা মাত্র

নিবেদন

আমার লেখা সামাজিক উপন্যাস 'জীবন স্রোত' এর কাহিনী বাংলা ছায়াচিত্রে রূপ দিতে অগ্রণী হয়েছেন শতদল পিকচার্স লিমিটেড। এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শ্রীসুধীর কুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন রায় ইঁহাদের সাগ্রহ তৎপরতায় বইখানির চিত্র গ্রহণ কার্য্য সুরু হয়েছে ও আগামী ১৩৫৬ সালের ৯ই আশ্বিন ৺মহামায়ার পঞ্চমী তিথিতে 'জীবন স্রোতের' শুভ উদ্বোধন তারিখ ধার্য্য করেছেন, এজন্য ইঁহারা আমার শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদার্হ। আমার সাধনা ও স্বপ্নকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে যাঁরা তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা নিয়ে ভূমিকায়, সঙ্গীতে, পরিচালনায় অগ্রণী হয়েছেন সেই সব উদীয়মান ও খ্যাতনামা রূপশিল্পীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বইখানি প্রকাশ করবার সমস্ত দায়ীত্ব নিয়েছেন সুপ্রসিদ্ধ কমলা বুক ডিপোর কর্ত্তৃপক্ষ। বাংলার নারী সাহিত্যিক হিসাবে তাঁদের কাছে আমি বিশেষ ভাবে ঋণী। তাঁদের সাহায্য না হ'লে আমার লেখা পুস্তকাকারে বাহির হওয়া সুকঠিন হোত। আমার লেখার ভিতর দিয়ে যে আদর্শ সমাজের সামনে ধরেছি জানিনা আমার সে চেষ্টা ফলবতী হ'বে কি না। তার বিচারের ভার পাঠক পাঠিকাদের উপর। ইতি—

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্যা

পূজনীয়া মাতামহী শ্রীযুক্তা গোপালদাসী দেবীর

শ্রীচরণ কমলে

—আমার দীর্ঘ সাধনা-বৃক্ষের প্রথম ফুলের অর্ঘ্য 'জীবন-স্রোত' তাঁরই প্রাপ্য। আমি জানি এর আদর তাঁর কাছে হবে। ইতি—

সন ১৩৫৬ সাল,
১লা জ্যৈষ্ঠ, ভবানিপুর।

সেবিকা—জ্যোতিঃ

জীবন স্রোত

(এক)

নববধূ রমলাকে ঘরে এনে একদিকে রতনবাবুর সংসারে যেমন উন্নতি হ'ল সে বছর, ব্যবসাক্ষেত্রে যেমন হ'ল লাভ—অন্যদিকে কিন্তু তেমনি লোকসানেরও সূত্রপাত হতে দেখা গেল। যার জন্য একমাত্র ছেলে রবীনকেই বুঝি হারাতে হয়—এমনই পারিবারিক অশান্তি সুরু হ'ল।

বিয়ের ক'দিন পরই শোনা গেল,—রমলার সঙ্গে রবীনের মনের মিল হয়নি। এ খবর বাড়ীর আর সবার মতন কর্ত্তার কানেও পৌঁছে গেল। ছেলের বউ পছন্দ হয়নি—একথা শুনে রতনবাবু মুষড়ে পড়লেন।

রতনবাবু রমলাকে বাপের বাড়ী পাঠালেন না, ছেলের ডাক্তারী পরীক্ষা আসন্ন বলে, বৌ নিয়ে নিজে গেলেন দেশ-ভ্রমণে এবং ছেলের পরীক্ষার পর এলেন ফিরে।

এরপর হঠাৎ একদিন ছোট মেয়ে তড়িতার মুখে শুনলেন—রবীন যাবে রেলের ডাক্তার হয়ে—সারা পুল হচ্ছে পদ্মার সেইখানে কুলীদের চিকিৎসক হয়ে। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে, তিনি ডেকে পাঠালেন রবীনকে এবং সত্যি শুনে প্রবল আপত্তি তুললেন।—কল্‌কাতায় নিজে ডাক্তারখানা খুলে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে অনেক

অনুরোধ ও শেষ পর্য্যন্ত আদেশ করলেন। কিন্তু রবীনের জেদই বজায় রইল। সে চাকুরী করবেই।

ক্ষুব্ধ রতনবাবু ছেলের জেদের তীব্র প্রতিবাদ ক'রেও যখন তাকে নিরস্ত করতে পারলেন না, তখন দাসত্বেয় নিন্দা করে ধিক্কার দিলেন নিজের অদৃষ্টকে—আমি চিরদিন স্বাধীন প্রকৃতির লোক, আর আমার ছেলে হ'য়ে তুই যাবি পরের চাকরী নিতে! যে দাসত্বকে আমি চিরদিন ঘৃণা করি,—কখনো কোন অবস্থা আমায় স্বীকার করাতে পারেনি—কত ঝড় আমার এই মাথার ওপর দিয়ে গেছে—কত দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়েছি, তবে না আজ এত বড় হয়েছি, কোন অবস্থা আমায় তো নোয়াতে পারেনি—তুই বড় লোকের ছেলে হয়েছিস্ রবিন্! কিন্তু তোর বাবা গরীবেরই ছেলে ছিল।

রবীন্ নত মস্তকে, নীরবে শোনে পিতার কথা, কোন পরিবর্ত্তন তার আসে না তবু।

রতনবাবুর চোখে অশ্রু টলটল্ করতে দেখা যায়—পরের বাড়ী থেকে অনেক কষ্টেই মানুষ হয়েছিলাম, বহু লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলাম—তবু—তবু দাসখতে নাম লেখাইনি—মাথা পেতে তোর মতন বরণ করেও নিই নি—তুইও যাতে ঘৃণা করতে শিখিস্ তারই চেষ্টা করে এসেছি, সেই শিক্ষা-ই বরাবর দিয়েছি তোকে, আর আজ কিনা—তুই যাবি সেই চাকরী-ই নিতে! হায় রে! আমার সব শিক্ষা-ই বৃথা করে দিবি—

রতনবাবু আসন ত্যাগ করে উঠে যান অন্যত্র। যা ভাল বুঝিস্,—তাই কর ব'লে।

(২)

পরীক্ষার খবর বেরুবার কয়েক দিন পর রবীনের চাকরীর নিয়োগ পত্র এসে যায় শোনেন রতনবাবু, কিন্তু অন্তরের বেদনা আর ব্যক্ত করেন না, বোঝেন—রবীন তাঁর অবাধ্যতাচরণ-ই করবে। রবীনের যাবার দিনও এগিয়ে আসে শোনেন, তবু আর উচ্চবাচ্য ঐ নিয়ে করেন না, নিজের কাজ নিয়েই থাকতে দেখা যায়।

রবীনের যাওয়ার তোড়-জোড় চলে খুব আড়ম্বরের সঙ্গে ই—পোষাক-পরিচ্ছদের ফর্মাস দেওয়া, কেনাকাটার ধুম এত বেশী যে, চান করা, খাওয়ারও সময় নেই তার।

রবীনের মা বোঝেন, ছেলের মন কেন তাঁদের ওপর বিরূপ হয়েছে এবং কেন সে চাকরী নিয়ে বিদেশে যাচ্চে। সব বুঝেও তিনি নিরূপায়। কর্ত্তা কোন দিনই তো তাঁর কথা শোনেন না, ছেলে এদ্দিন শুনত, কিন্তু এবার সেও হাতছাড়া হয়ে যায়। কেঁদে কেটে অনেক বুঝিয়েও রবীনকে নিরস্ত করতে পারলেন না।

রবীনের সেই এক কথা—তোমরা তো আমায় চাওনি মা! এখন আর কেঁদে লাভ কি? না হলে কি একবারও আমার মত নেওয়ার দরকার বাবার মনে হত না?

মা বলেন—উনি সেকেলে মানুষ, অত বোঝেন-নি,—না হ'লে তুই একটা মাত্তর ছেলে—আর উনি তোর বাপ, আমি মা, আমরা তোকে অশান্তি দিতাম? আগে-ই তোর বলা উচিৎ ছিল রবীন, এখন ঐ ভদ্রলোকের মেয়ে' ওর দিকটা কি তোর ভাবা উচিৎ নয়?

রবীন মৃদু হেসে জবাব দেয়—ওর জন্যে ভাববার তো অনেক

লোকই রয়েছে মা, আমার জন্যে ভাব্‌বার-ই কেউ ছিল না। রবীনের মা বোঝেন, ছেলে কৃতসংকল্প, আর কিছু বলেন না।

ছোট বোন্ তড়িতা দাদার মন বোঝ্‌বার জন্যে জিজ্ঞাসা করে—বৌদিও যাচ্ছে তো?

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে রবীন্ বলে—না, ও যাবে কি?

ভৃত্যেরা উঠে পড়ে লেগেছে, কেউ বিছানা বাধ্‌ছে হোল্ডলে, কেউ সুটকেশ ট্রাঙ্ক গোছাচ্চে, রবীন দেখিয়ে শুনিয়ে দিচ্চে বসে—রমলা জলখাবার নিয়ে ঢোকে ঘরে। রবীন্ এতে উঠে দাঁড়ায়—পালাবার জন্যে ঘর ছেকে।

রমলা বুঝতে পেরে বলে—আপনি বসুন, আমি চলে যাচ্চি। মা খাবারটা দিয়ে যেতে বল্‌লেন—বল্‌তে বল্‌তে ও রেকাবিখানা টেবিলে রেখে বাঁ হাতে সদ্যস্নাত আলুলায়িত অবিন্যস্ত চুলের গোছাটা সরিয়ে দিতে দিতে মন্থর পায়ে চলে যায়।

রবীন যেন বাঁচে। ও আবার নিজের জিনিষ পত্তর কি কি নিতে হবে না হবে তারই নির্দেশ দেয়।

(৩)

কাল রবীনের যাওয়ার দিন। বড় বোন্ ললিতা ও মেজ বোন্ সুলতা ওরা আস্‌বে দেখা কর্‌তে। কাছেই সব শ্বশুর বাড়ী ওদের, রমলা তড়িতাকে বলে ভাই, কাল আর সুযোগ হবেনা, আজ-ই একবার দুপুরে তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও।

তড়িতা ওকে আশ্বাস দেয়, দেখা করিয়ে দেব—তুমি ভেবনা। কিন্তু তোমাকেও কথা দিতে হবে বৌদি, তোমার ওপর দাদা যে সব

অবিচার, যত অপমান করছে, সব বাবাকে একটা একটা করে বল্‌তে দেবে।

ব্যস্ত হয়ে রমলা বলে—ছিঃ, ঠাকুর ঝি, ওসব কথা কি গুরুজনদের কাছে বল্‌তে আছে! ওঁর যে তাতে লজ্জা আস্‌বে ভাই। তা ছাড়া কষ্ট হবে মনে। রমলার চোখ দুটো ছলছল্ করে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে—বলেই বা কি হবে আর—না বৌদি, বাবাকে জানানো উচিৎ; সে তুমি বল আর না বল, দাদা চলে গেলেই আমি নিশ্চয় বাবাকে সব বলব। কেন লোকজনের সাম্‌নে, ঝি-চাকরদের সাম্‌নে পর্য্যন্ত তোমায় অপমান করে কোন্ সাহসে! তড়িতা বলে।

রমলা ম্লান হেসে বলে—করুন, তুমি ওসব বাবার কাছে বলেই কি ওঁকে ফেরাতে পার্‌বে!

তড়িতা একটু উষ্ণ হয়ে বলে—পারি আর না পারি, তবু ওর কাণ্ডখানা তো সবাই জান্‌বে।

—ঠাকুরঝি। করুণ কণ্ঠে তড়িতা রমলার মুখের দিকে চায়। তারপর আর্দ্রস্বরে বলে,—তুমি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মের না বৌদি। আজ আট মাস হল তোমাদের বিয়ে হয়েছে,—ফুলশয্যার পরদিন রাত্রে যখন তোমাদের চুপচাপ দেখে বড়দি, মেজদিরা আশ্চর্য্যি হয়ে আলোচনা করছিল,—তখনো তুমি চাওনি স্বীকার করতে, মনে আছে।

তারপর একদিন যখন ধরে ফেল্‌লাম গুপ্তচরগিরি ক'রে ক'রে,—আর তোমায় ধর্‌লাম চেপে, তখন নেহাৎ অনিচ্ছায় পড়ে যেটুকু তুমি বলেছিলে, তার থেকে অনুমান করে নিয়েছিলাম এবং

যথাসময়ে দিদিদেরও জানিয়েছিলাম। মাকে ও বাবাকে সকলকেই তোমার কাছে শোনা কথাগুলো আমিই বলেছিলাম।

রমলা শুধু বলে—বেশ করেছিলে, কিন্তু বার বার আর বলে কি হবে! বিয়ে তো আর ফিরবে না—তা ফিরবে না বটে, তবে বড্ড বাড়াবাড়ি করছে কিনা, আর আমিও একটু অসহ্য মানুষ—

রমলা বলে—খুব হয়েছে, এখন যা বললাম, তাই কর। —তড়িতা। রবীন্ ডাকে ঘরের বাইরে থেকে।

—এস, আমি এখানে আছি।

রবীন্ ঘরের ভেতর আসে এবং সামনেই রমলাকে দেখে চলে যায়—যেতে যেতে বলে যায়—এ ঘরে আয়, কাজ আছে তোর।

রবীন্ অদৃশ্য হলেই তড়িতা পুনরায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে,—আচ্ছা, বল দিকি; এগুলো কি মানুষ বরদাস্ত করতে পারে বৌদি! কেন, তুমি বাঘ না ভালুক, না সাপ, যে তোমায় যেখানে দেখে—ছিঃ, ছিঃ, লেখা-পড়া শিখে মানুষের চিত্তের এত অবনতি—রমলা ওর মুখে হাত চাপা দেয়। তড়িতা সবলে ওর হাত সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়: —কি করে-ই যে তুমি সও ভাই, জানিনা। বাবাকে এ গোয়াতুমির—

রমলা সকরুণ চোখে চায়।—ঠাকুরঝি!

তড়িতা স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলে—তোমার ঐ চোখ দেখলে বড় মায়া হয় আমার বৌদি, আর কিছু বলতে পারি না, দাদার সব অপরাধও যেন ক্ষমা করতে ইচ্ছা হয়। তুমি ছেলেমানুষ, তাই এত বড় ব্যাপারটাও খুব ছোট করে দেখ্ছো বৌদি—পুনরায় দরজার বাইরে থেকে রবীন ডাকে—তড়িতা চলে যায়—কি বলছ বল।

রবীন্ বলে—আমার ঘরে চল্—কতকগুলো নাম লিখে দিবি

বালিশের ওয়াড়ে, আর রুমালে। রবীন্ আর দাঁড়ায় না ব্যস্ত হয়ে চলে যায়।

তড়িতা কি বল্‌তে যায়, কিন্তু বলা হয় না। রবীন্ তখন বারান্দা পার হয়ে চলে গেছে।

তড়িতা এসে রমলাকে বলে—চল বৌদি, তোমার দেখা করার সুযোগ মিলেছে, এই সময় ওকে পাওয়া যাবে। তড়িতা রমলার হাত ধরে টানে—এস দেরী করনা।

রমলার চোখে অভিমানের অশ্রু টল্‌টল্ করে ওঠে।—এখন তুমি যাও ঠাকুরঝি, আমি এর পরে যাব, হয়ত আমায় যেতে দেখলে কাজ হবে না, পালিয়ে যাবেন। দেখ্‌লে না, আমায় দেখে গেছেন বলে আর ঘরে ঢুক্‌লেন না—রমলা আঁচলে চোখ মুছে দাঁড়ায়। কত অপমান আর সইব ঠাকুরঝি!

তড়িতা একটা চাপা নিশ্বাস অনেক কষ্টে ফেলে। তারপর বলে—চেয়েছিলে একবার দেখা কর্‌তে, চল সময় নষ্ট করনা। ও এগিয়ে যায়, রমলা ভয়ে ভয়ে পেছনে যায়।

—দাদা, ডাক্‌ছিলে কেন! বল্‌তে বল্‌তে তড়িতা রমলার হাত ধরে ঘরে ঢোকে। ওকে দেয় ঠেলে ভেতরে, নিজে দাঁড়ায় দরজায়। বল কি কাজ আছে? রবীন্ কি একটা লিখছিলো, তড়িতার গলার আওয়াজে ওর দিকে চাইতে গিয়ে চোখ পড়ে রমলার দিকে।

তড়িতা ওকে কথা কইবার অবকাশ না দিয়ে বলে—তোমার কাজ বৌদিই করে দিতে পারে, আমায় আর খাটাও কেন? বলেই ও চলে যাবার উপক্রম করে।

জীবন স্রোত

রবীন্ ডাকে—এই শুনে যা—তড়িতা ফিরে দাঁড়ায়।—ও পারবে না, তুই দে,—

রমলা দরজার কাছে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, অনুচ্চ কণ্ঠে বলে—দাও না ভাই—জানো তো, আমার কাজ পছন্দ হয় না।

তড়িতা ওর দিকে একবার ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ করে রবীনের কাছে চলে যায়—দাও, কি দেবে।

রবীন্ এক গোছা রুমাল ওর হাতে তুলে দিয়ে বলে—খুব ভালো মনোগ্রাম করে দিবি বুঝ্‌লি?

—যা জানি তাই তো দোব, ভালো মন্দ অত বুঝিনে—বলে ক্ষিপ্র পায়ে বেরিয়ে যায় এক রকম ছুটে-ই। যাবার সময় দিয়ে যায় সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে রবীন্ আবার চোখ তুল্‌তেই দেখে—রমলা চুপ করে দাঁড়িয়ে। বুঝতে ওর দেরী হয় না ব্যাপারটা। বিরক্ত হয়ে ওঠে মনে মনে। রমলার অস্তিত্ব অস্বস্তি দেয় ওকে। তিক্তকণ্ঠে প্রশ্ন করে তুমি এখানে যে? রমলা নিরুত্তর। পুনরায় রবীন্ জিজ্ঞাসা করে—তড়িতা গেল, তুমি গেলে না?

রমলা এরকম প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল। তাই নির্ভীক ভাবে উত্তর দিল—তুমি কাল চলে যাবে চাকরী করতে, তাই দেখা করতে এসেছি—হয়ত কাল আর—

বাধা দিয়ে রবীন্ বলে—হয়েছে তো সে কাজ, এখন যেতে পার।

এক মুহূর্ত ওর দিকে চায় রবীন্, তারপর কাগজ চাপাটা নিয়ে নাড়া চাড়া করতে থাকে।

হঠাৎ রমলা ছুটে এসে ওর পায়ের কাছে বসে পড়ে!—এত নিষ্ঠুর

তুমি! এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি—রবীন্ পা টা সরিয়ে নেয়।—কি হচ্ছে কি—

অভিমান মিশ্রিত সজল কণ্ঠে রমলা বলে, মানুষ মানুষের সঙ্গে কি কথাও বলে না? এত-ই কি অপরাধ করেছি—ওর কণ্ঠ হতে স্বর বেরয় না। রবীনের দিক্ থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই।

অপমানে অভিমানে রমলার বুক যেন ছাপিয়ে ওঠে, ও-উঠে দাঁড়ায়। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলে--ভাল বাস্‌তে-ই না হয় পার নি,—কিন্তু তাই বলে কি কথা কইতে, কি কথার উত্তর দিতেও নেই। রমলার মুখ চোখ দিয়ে যেন ঝরে পড়ে অপমানের তীব্র জ্বালা।

এবার রবীন্ কথা কয়। বলে—দোষ গুণ নিয়ে সব সময়ে সব কিছুর বিচার হয় না রমলা, সে দিক্ দিয়ে যারা বিচার করে, তারা-ই ভুল করে বসে। মানুষের ভাললাগা না-লাগা বলে একটা জিনিষ আছে—বিশেষ করে আছে আমার ভেতর সেটা খুব বেশী মাত্রায়, একথা বোধ হয় অনেক বার বলেছি তোমায়। কিন্তু তুমি যদি না বোঝ—

বাধা দিয়ে আহতা রমলা বলে—কিন্তু কেন বুঝব বল্‌তে পারো? গুন্ দেওয়া ধনুকের মত ওর ভ্রু-যুগ কুঞ্চিত হয়।

রবীন্ ওর দিকে বারেক চেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। তারপর মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে বলে—কেন যে ভালো লাগে না, তাও অনেকবার বোধ হয় বলেছি—আজ তোমায় শেষবার—

রমলা প্রবল ভাবে বাধা দিয়ে ওঠে।—ও কথা বলতে নেই, ছিঃ, কাল চলে যাবে, আর আজও তোমার ঐ কথা! হয়ত কদ্দিন আর দেখা হবে না—ওর চোখ ছাপিয়ে ওঠে। রমলা আজ আর গোপন করতে চায় না অশ্রু, তাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে—দূরদেশে চলে যাচ্ছ,

তাও কি একটু মন কেমন করছে না? ওর চোখের জল এবার গড়িয়ে নামে গাল বেয়ে।

রবীন্ উদাস কণ্ঠে বলে—মন তো নেই রমলা, যদি থাকৃত—ম্লান হাসি দিয়ে কথা সমাপ্ত করে। একটু পরে কি ভেবে পুনশ্চ বলে—সবাই মিলে আমার মন দিয়েছে নষ্ট করে যে, তাই আর আজ সে ফিরে আস্ছে না, শত সাধ্য সাধনাতেও খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না, কি করি বল? না মায়ের চোখের জল, বাবার শাসন, স্নেহ, তোমার অনুনয়—ওর ওষ্ঠে আবার দেখা দেয় একটু সকরুণ হাসি। আজ আমার মনের দিকে চাইলে, খুঁজলে কারুর কিছু ফল হবেনা রমলা।

ও উঠে দাঁড়ায়। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলে—যা ভেঙে গেছে, তা আর গড়্বে না—এবার বোধ হয় হয়েছে। এখন যেতে পার।

স্বামীর মুখের নীরস কথাগুলো শুন্তে শুন্তে বিমূঢ় হ'য়ে গিয়েছিল রমলা। রবীনের কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, বাস্তব-জগতে ফিরে এল যেন ও। রবীন্ চলে যাবার উপক্রম করছে, তা বুঝ্তে পেরে-ই বলে।

—শোন, আর একটু খানি দাড়াও—হয়নি এখনো—রবীন্ বসে পড়ে চেয়ারে: রমলা নীরব। অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে রবীন্।—আজ আমার এভাবে বসে থাকবার সময় নেই, যা বল্তে হয় বলে ফেল চট্পট্—

বেদনা-বিগলিত কণ্ঠে রমলা প্রশ্ন করে, আচ্ছা, সত্যি কি আপনার—তোমার মন,—ফেরাবার কোন উপায় নেই? সত্যি; মানুষের মন-ভাঙ্লে আর গড়ে না? স্বামীর মুখের ওপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে চায়।

রবীন্ বিব্রত হয়ে ওঠে। এক মুহূর্ত্ত ভেবে নেয়, তারপর উত্তর

দেয়—না, মন বড় ঠুন্‌কো বস্তু রমলা, একবার যে দিক্ থেকে বেঁকে যায়, আর যায় না ঘুরে সেদিকে।

রমলা সজোরে নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর বলে,—তুমি যাকে চেয়েছিলে, যাকে ভালবেসে-ছিলে, তাকে তো আজও পেতে পার, তোমার মন তাকে দিয়ে দিয়েছ যখন,—তখন বিয়ে যদি আজ তাকেই কর, তা হলে তো সব ভাল হয়। তাই কেন কর না? একটুক্ষণ ওর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করে পুনরায় বলে—তাকে বিয়ে করতে পাও নি বলেই তো রাগ তোমার?

রমলার সরলতাপূর্ণ আন্তরিকতা মাখা কথা শুনে রবীন্ অধৈর্য্য হয়ে বলে—আর হয় না, যাকে চেয়েছিল মন, তাকে যখন-পায় নি, তখন, আর তাকেও চাইবে না, ও জিনিষই চায় না। দুঃখ তোমার জন্যেও হয় রমলা—আমার মতন লোকের হাতে পড়ে তোমারও জীবন ব্যর্থ হতে বসেছে, তুমিও দুঃখ পাচ্ছ, আর আমিই দিচ্ছি, এ কথা অনেক অবসর মুহূর্ত্তেই ভাবি, কিন্তু তবু, ভেবেও কিছু লাভ হয় না। তাই তোমার সঙ্গে কথা কইতে তোমার সান্নিধ্য পর্য্যন্ত বেশীক্ষণ আমার সহ্য হয় না বলে পালিয়ে যাই। সত্যি ভয় করি তোমাকে, এবং তোমার কষ্ট অভিশাপ হয়ে যে আমার জীবনের ওপর আঘাত করছে তাও বুঝি। কিন্তু তবু অবাধ্য মনকে ফিরিয়ে এনে তোমার দাবী, তোমার প্রাপ্য তোমায় দিতে পারিনে। আমার পালিয়ে যাওয়ারও কথা না কওয়ার এই একটা মস্ত বড় কারণ, আমি তোমার কাছে গোপন করতে চাই না, প্রথম দিন থেকেই বলেছি তাই, আজও আবার বল্‌ছি—ক্ষমা কর তুমি। রবীন্ সত্যি সত্যি হাত দুটো জোড় করে তুলে ধরে রমলার দিকে।

রমলা ধপ্ করে বসে পড়ে। মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে আসে—অঃ, মুহূর্ত্তে সাম্‌লে নেয় সে ভাব; তারপর ধীরে ধীরে বলে—ক্ষমা আমি করে-ই আছি, আমি তোমার স্ত্রী, আমার কাছে সব সময় সব অবস্থায় তুমি বড়, গুরুজন। আমার কাছে ক্ষমা পাওয়ার চেয়ে বড় হ'ল, মা, বাবা-এঁদের আশীর্ব্বাদ নেওয়া। তুমি তাকেই বিয়ে কর; আমি চলে যাব বাবার কাছে—তাই তুমি কর, কেন নিজের জীবন-নষ্ট করছ? ঠোঁট ওর কেঁপে ওঠে। বাবা—মায়েব মনেও কষ্ট দেওয়া-ই হচ্ছে। আমি চাই শান্তি, আমারও খুব অশান্তিই হচ্চে। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে ও।

—তাই হ'বে, তুমি যখন আদেশ করছ—রবীনের মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বলে—বিয়ে যা করেছি, করেছি—আর একটা ও করব না—তা ছাড়া বাড়ীর সঙ্গে তো সম্বন্ধ এবার কমে আস্‌ছে—যে বাবা-মা নিজের মতে—চল্‌তে অভ্যস্ত, ছেলের সুখ-শান্তি, তার মতামতের অপেক্ষা না রেখে; নিজেদের কর্ত্তৃত্ব-প্রিয়তার অভিমান বজায় রেখে চলতে চান, তাঁরা তাই নিয়ে থাকুন—তুমিও তাঁদের-ই সঙ্গে সুখ ভোগ কর! দামী কাপড় জামা পর, গয়না-পর,—গাড়ী চ'ড়ে হাওয়া খাও—কপালে যার সুখ আছে—বাধা দেয় রমলা। আর বলনা হয়েছে।

রবীন্ ভুরু কুঁচকে বলে—কেন? কি অন্যায় কথা-এটা? লুচি-পোলাও খাও, এ-তো আনন্দের কথা—আর আমি—কুলীদের নিয়ে তাদের-ই সেবায় আত্ম-নিয়োগ করে থাকি—মন্দটা কি? শান্তিতে জীবনটা কোন রকমে কাটিয়ে দিই—

রমলা নিজের গায়ের আর পরনের মূল্যবান শাড়ি ও গয়নার

দিকে চেয়ে, লজ্জায় ঘৃণায় হয় সংকুচিত, পরক্ষণেই হাতের এক গাছা করে চুড়ি রেখে, সব-গয়নাই এক এক খানা করে খুলে রবীনের পায়ের কাছে রাখে; তারপর উঠে আল্‌মারি খুলে কাপড় বাছ্‌তে থাকে। একখানা পাড় ওঠা কাপড় খুঁজে পায়, সেখানা একদিন বরখাস্ত করেছিল, আজ সযত্নে সেইখানাকেই ভাঁজ খুলে পাশের ঘরে ঢুকে প'রে আসে। তারপর রবীনের পায়ের কাছে বসে পড়ে।

রবীন্ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ চমকে চেয়ে বলে—একি! হঠাৎ—পায়ের কাছে গয়না, কাপড় পড়ে থাক্‌তে দেখে বলে—এসব খুল্‌লে কেন? পরে ফেল, পরে—হঠাৎ দরজার বাইরে কার যেন চুড়ির আওয়াজ হয়, রবীন্ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে ওঠে, রমলা ছিল চেয়ারের কাছেই বসে, ওর হাতটা ডিঙিয়ে যেতে গিয়ে একটা ঠোক্কর-লাগে,—রমলা হাত সরিয়ে নেয়।

বন্ধ দরজাটার দুটো—পাট এক সঙ্গে খুলে দেখে, দেখে না কাউকে-ই রবীন্, ফিরে এসে পুনরায় বসে—তুমি কিছু মনে করনা,—পা-টা লেগে গেল তোমার গায়ে,—আমি ইচ্ছে করে তোমার গায়ে পা দিইচি অন্ততঃ এটুকু মনে কর না!

রমলা বলে—তোমার স্পর্শই আমার চিরস্মরণীয় হয়ে থাক্‌বে—কিন্তু এ-কথা তুমি ভাব্‌লে কি করে, যে আমি ভাব্‌ব, তুমি ইচ্ছে করেই লাথি মেরেছ? তা-ছাড়া—কিছু তো বড় এসে ও যায় না তোমার—

বাধা-দিয়ে রবীন্ বলে—এসে যায় না—কিসে?—এই আমায়-ভাবা আর না-ভাবায়—রমলার বুক থেকে আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে সজোরে। একটু পরে বলে—কিন্তু আজ যখন তুমি নিজেই আমায় ছুঁয়েছ, তখন অনুমতি দাও, আমিও তোমার পা ছুঁই—

. . —আমার পা ছুঁয়ে তোমার লাভ-ই বা কি? আর প্রয়োজনই বা-কি আছে!

—কাল চলে যাবে, একটা প্রণাম করা তো আমার উ'চিৎ,—বেধে যায় মুখের কথা, একটু সময় লাগে আত্মস্থ হতে। বলে—সেদিন তুমি পা ছুঁতে দাও-নি তাই—অপমানে, অভিমানে কণ্ঠ রোধ হয়। কান্নার বেগ চাপ্‌তে গিয়ে, ও তাড়াতাড়ি উঠে চলে যায়। দরজা-টা একটু জোরে-ই খুলে ফেলে—রবীন্‌-বলে—এসব ফেলে রেখে যাওয়া হচ্ছে যে? নিয়ে যাও—

দরজার বাইরে তখন রমলা। ফিরে দাঁড়িয়ে বলে—দীনেশ চক্রবর্ত্তীর মেয়ে আর ও গয়না-কাপড় ছোঁবে না। একটু সরে আসে ভেতরে—তুমি যাকে বিয়ে করে আন্‌বে,—যাকে, ভালবাস, তাকে-ই পরি-ও। যতটা বোকা ভাব, ঠিক ততটা-ই নই। পাশকরা মেয়েই তুমি চেয়েছিলে বিয়ে কর্‌তে, তা' অবিশ্যি নই, কিন্তু তাই বলে—রবীন্‌ বাধা দেয়—তা' বুঝ্‌ছি কিন্তু এগুলো নিয়ে যাও।

রমলা দৃঢ় কণ্ঠে বলে—না, ও তোমার বাবা-মাকে-দিয়ে দাও গে। তুমি স্বামী, তুমি আমার গুরু, মায়ের মুখেও শুনেছি, আর রামায়ণ, মহাভারতেও পড়েছি,—শ্রীবৎস-চিন্তা, নল দময়ন্তীর উপাখ্যানে, হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার উপাখ্যানে, সীতার জীবন কাহিনীতে। সব বইতেই লেখে যখন, তখন নিশ্চয় তাই—তাঁরা যেমন অনেক কষ্ট সয়ে, এমন কি অগ্নি পরীক্ষার মতন কঠিন পরীক্ষা দিয়েছিলেন, স্বামীর বিশ্বাস পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্যে, আমিও তাঁদের-ই পথে চল্‌ব। বাবা-বলেন,—তাঁদের আদর্শ-ই নিতে, আমি তাঁদের আদর্শই বড় মনে করি।

পরম বিস্ময়ে রবীন্‌ ওর-দিকে চেয়ে থাকে।—

—তাই তো তুমি যে অনেক-কথা-ই বল্‌লে দেখি, এসব কি তোমার বাবার কাছে শেখা? না—?

—হ্যাঁ, বাবার-কাছেই-আমার যা কিছু সব-ই শেখা, আমার-ছোট-বেলায়-ই তো মা মারা যান্ কিনা? মায়ের কথা মনে হ'তে চোখ ছল্‌ছল্ করে আসে। সে ভাব-কাটিয়ে নেয় চট্‌করে। বলে—তাই তোমার—সব অপমান লোকের কাছে ঢেকে রাখ্‌বার জন্যে সবাই যে ভাবে সাজাতে চায়, সেই ভাবেই সাজি। শুধু তোমায় বাঁচাতে, তুমি সকলের চোখে ছোট হয়ে যাবে; লজ্জা পাবে—তাই—স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য দুনিয়ার-লোকের জানা, আর তাই নিয়ে আলোচনা হওয়া, আমার পক্ষেও গৌরবের নয়—

বিবাহিত জীবনের কয়েক মাসের সঞ্চিত বেদনার উৎস আজ উৎসারিত হবার এতটুকু সুযোগ পেয়েই হয় অশ্রু ও ভাষায় উৎসারিত। তরুণী নারী-হৃদয় আজ উদ্বেল হয়ে শত ধারায় আত্ম-প্রকাশ কর্‌তে চায়। চোখের জল আঁচলে মুছে সামনের কল্ ঘরে যায় এবং একটু পরে বেরিয়ে আসে চোখ-মুখ ধুয়ে। তারপর রবীনের পায়ের কাছে দুর থেকে প্রণাম করে, গলায় আঁচল জড়িয়ে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে—আমার সঙ্গেও এই শেষ দেখা, তুমি সুখী-হয়ো বিয়ে করে, এই আমার কামনা। রবীন্‌কে অবসর দেয় না কথা বল্‌বার—চলে যায় ত্রস্তে।

হতভম্ব রবীন্ সহসা বাস্তব-জগতে ফিরে আসে। চেয়ে দেখে রমলা নেই ঘরে। প্রথমে একটু বিব্রত হয়, তারপর—বিরক্তিও আসে অনেক খানি। ও মোটে প্রস্তুত ছিলনা, আজকের আলাপ—বিলাপের জন্যে—নিতান্ত-ই অপ্রত্যাশিত এ। রমলার ভেতর আজ যে

নারী-মূর্ত্তির সন্ধান পেল, এ-দেখ্‌বার আশা-ও করেনি কোন দিন। তাই বেশ—একটু ভ্যাবাচাকার মধ্যে ঘুরছিল মন-টা। বারবার পায়ের কাছের গয়না কাপড় গুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, আর মনের সঙ্গে তুমুল একটা দ্বন্দ্ব বাধ্‌বার উপক্রম দেখ্‌ছিল।

—কিন্তু না, এ ভাব বেশীক্ষণ প্রশ্রয় দিলে চল্‌বে না। ও উঠে যায় তড়িতার খোঁজে। দেখা হয় বারান্দার প্রান্তে, তড়িতাও আস্‌ছিল ওরই ফরমাসি রুমালগুলো হাতে নিয়ে।

—দেখ, তোমার পছন্দ মত হল কিনা! বলে ও দেখায় এক একখানা করে তুলে তুলে, বাঁ হাতের গোছাটা থেকে।

রবীন্ দেখে বলে—ঠিক হয়েছে। ওর হাত থেকে রুমালগুলো নিয়ে নেয়, তারপর বলে—তোর বৌদিকে একটু পাঠিয়ে দে তো তড়িৎ।

তড়িতা ওর কথায় বিস্ময় বোধ করে প্রথমে, তাই মুখের দিকে চায়। তারপর বোঝে যখন ব্যঙ্গ নয়, তখন আনন্দে ওর মন প্রায় লাফিয়ে ওঠে। দিচ্ছি বলে ক্ষিপ্র পায়ে চলে যায় বৌদির খোঁজে এবং রমলাকে দেখতে পেয়ে দেয় সুখবর।—তোমার ডাক্ পড়েছে, শীগ্‌গীর যাও। রমলা পান সাজছিলো রতনবাবুর জন্যে—তড়িতার কথার উত্তরে যাচ্ছি বলে, একটা পান মুড়তে সুরু করে। তড়িতা ওর হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে বলে—ভারী বোকা তুমি! যাও শীগ্‌গীর। তড়িতা ওকে উঠিয়ে দিয়ে পান নিয়ে বসে।

রমলা এসে দাঁড়ায়, রবীনের ঘরের দরজা ধরে। আমায় ডেকেছ?

রবীন্ আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে কি একটা দেখছিল, হেঁট করেছিল অল্প একটু মাথাটা। মাথা তুলে ঘাড় ফিরিয়ে বলে—হুঁ, ওগুলো

হয় পর, নয় নিয়ে যাও, এখানে ফেলে রেখে যাওয়ার মানে কি? একটু সরে এসে প্রসন্ন মুখে বলে—যখন এতটাই করেছ আমার জন্যে, তখন আর একটু উপকার আজকের দিনটাও কর।

কঠিন কণ্ঠে রমলা বলে—ও তুমি যা হয় কর, আমি আর পরব না। —যে গয়না আমার গায়ে ফোটে—ওর কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে আসে। তুমি যখন আজ তারই উল্লেখ করে বল্লে, আমি খুব সুখে আছি, তখন তোমায় আর কি বল্‌ব বল? চোখের জল ঝরে পড়ে কয়েক ফোঁটা।

রবীন্ কি বল্‌বে খেই পায় না যেন। ইচ্ছে হয়, এই মুহূর্ত্তে রমলার সঙ্গে একটা রফা করে ফেলে, কিন্তু আবার বাধে ও।

রমলা বলে—আজ আমি চললাম, তুমি চলে গেলে আমিও থাক্‌ব না এখানে, কিন্তু গয়নাও চাই না। যেদিন তোমার ভালবাসার দাবী করবার অধিকার পাব, এই ঘরে এই জীবনে, সেইদিন, তুমি নিজে হাতে পরিয়ে দিলে তবে পরব, নইলে—রমলা চলে যায় বিদ্যুতের মত। বাইরে বেরিয়ে ও দেখে ছুটে পালাচ্ছে তড়িতা ও তার পেছনে যায়, গিয়ে ঢোকে তড়িতার ঘরে।

তড়িতা ওর মুখের দিকে চেয়ে চম্‌কে ওঠে। তুমি বুঝি খুব কেঁদেছ, চোখ লাল হ'য়ে উঠেছে!

রমলা ওর কথার উত্তর না দিয়ে, তাড়াতাড়ি খাটের ওপর উঠে শুয়ে পড়ে। বিষন্না তড়িতাও আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না, সহানুভূতিতে মন ওর ভ'রে ওঠে।

(৪)

—তড়িত, রমলা কোথায় বল্‌তে পারিস্‌?—আজ আমার পান রাখেনি—বল্‌তে বল্‌তে রতনবাবু তড়িতার ঘরের দরজার কাছাকাছি এসে পড়লেন।

তড়িতা পিতার কণ্ঠস্বর শুনে, সাড়া দেয়—যাই বাবা। দেখা হয় দরজার কাছেই।—বৌদির বোধ হয় জ্বর হয়েছে, আমিই দিচ্ছি পান। বলে ও বেরিয়ে যায়।

পান নিয়ে তড়িতা ফিরে এসে দেয় ওর বাবার হাতে ডিবে। রতনবাবু জিজ্ঞাসা করেন—কোন্‌ ঘরে বউমা? তড়িতা বলে উত্তরে—আমার ঘরে।

ব্যস্ত হয়ে তিনি আসেন। দেখেন, আগা গোড়া চাদর ঢাকা দিয়ে রমলা শুয়ে। বিছানায় গিয়ে তিনি বসেন। তারপর রমলাকেই উদ্দেশ করে বলেন—মুখ পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়েছ কেন মা? এমন করে কি ঢাকা দিতে আছে!—তাই বলি, আজ পান নিয়ে মা আমার দাঁড়িয়ে নেই কেন? তড়িতার হাতে পানের ডিবে দিয়ে বলেন—রাখ টেবিলে।

তড়িতা পিতার আদেশ পালন করে।

রতনবাবু বলেন—বউমার মুখের ঢাকাটা খুলে দাও। হঠাৎ জ্বর হ'ল কেন বলত? তড়িতা উত্তর দেয় না, চাদর-টা মুখের সরিয়ে দেয়। রতনবাবু বলেন, থার্মোমিটারটা নিয়ে এস রবীনের ঘর থেকে, টেম্পারেচার-টা নিয়ে নাও, দেখে যাই।

উদ্বিগ্ন রতনবাবু রমলার কপালে হাত দিয়ে জ্বর পরীক্ষা করেন। তড়িতা থার্মোমিটার নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে, ওর বাবার হাতে দিতে যায়।—তুমিই-দাও মা—কিন্তু আমায় যে বড় ভাবিয়ে তুল্‌লে মা!

বাধা দেয় রমলা।—ও কিছু নয়, বাবা, এখুনি—ছেড়ে যাবে—অল্প একটু হয়েছে—থার্মোমিটার দিতে আর হবে না, তেমন কিছু নয়।—হোক মা, একবার দেখা ভাল। পাখা বন্ধ কর্ তড়িৎ। তড়িতা পাখা-বন্ধ করে এসে অন্য পাশে গিয়ে বসে।

থার্মোমিটার দেওয়া হয়। রতনবাবু ওর মুখের কান্নায় থম্‌থমে ভারী মুখখানার দিকে তাকিয়ে বলেন—জ্বর-টা বেশীই হয়েছে, মুখখানা টস্‌টস্ করছে।

তড়িতা বলে—হতে পারে। ও জানে জ্বর নয়, কেঁদে, কেটে মুখের চেহারা ঐ-রকম হয়েছে। কিন্তু সে কথা বল্‌তে পারে না।

রতনবাবু বলেন—ঘড়ি দেখ্‌ছিস্ তো?—হাঁ বাবা, হয়েছে। ঘড়ির দিক্ থেকে চোখ্ ফিরিয়ে থার্মোমিটার তুলে দেখে; জ্বর বেশী নয় বাবা; দু'-পয়েণ্ট কম একশো।

রতনবাবু মেয়ের হাত থেকে থার্মোমিটার নিয়ে বেশ করে দেখেন।—তাই-তো! আর একবার দাও, ঠিক দেওয়া হয়নি। গা এত-গরম, জ্বর অত কম হ'তে পারে না! তিনি আর একবার কপালে হাত রাখেন। পিতার আদেশ মত পুনরায় তড়িতা থার্মোমিটার দেয়, নিতান্ত অনিচ্ছায় রমলাকেও নিতে হয়।

রতনবাবু রমলাকে প্রশ্ন করেন—হঠাৎ জ্বর হ'ল কেন বলত? সকাল থেকেই শরীর খারাপ হয়েছিল না-কি?

রমলা সংক্ষেপে উত্তর দেয়—হুঁ।

—রবীন্‌কে ডাক্, আমার বড্ড দেরী হয়ে গেল,—ওষুধ-পত্তর দিক্—

তড়িতা ইতিমধ্যে থার্মোমিটার দেখে, পিতার হাতে দিয়ে বলে—সেই একই এবারও উঠেছে বাবা। বোধ হয় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা—ও রবীন্‌কে ডাক্‌তে যায়।

রতনবাবু ভাল করে দেখে বললে—তাই হবে—জ্বর তো তেমন বেশী নয়। ওটা খাপের ভেতর পুর্‌তে পুর্‌তে রমলাকে পুনশ্চ প্রশ্ন করেন—গায়ে কি খুব ব্যথা হয়েছে মা? দেখি হাতখানা একবার—রতনবাবু নিজের হাত বাড়িয়ে দেন রমলার দিকে।

রমলা বলে—থাক্ বাবা হাত দেখে আর কি-ই বা হবে? আপনি যতটা ভাব্‌ছেন,—বাধা দিয়ে রতনবাবু বলেন—না-না, ও কথা-কথাই নয়, একটু থেকেই বেশী হয়। রোগ যত কমই হোক্, অবহেলা কখনো করতে নেই মা!

রবীন্ এসে দাড়ায়।—আমায় ডাক্‌ছেন বাবা?

—হাঁ, ডেকেছি। বউমাকে একটা ওষুধ-বিষুধ তুমি দিতে পারবে, না ডাক্তার আন্‌তে পাঠাব? তাই জিজ্ঞাসা করার জন্যেই ডেকেছি। খুব অপ্রসন্ন হয়েই কথাগুলো বলেন রতনবাবু।

রবীন্ স্তব্ধ হয়ে এক মুহূর্ত্ত থাকে, তারপর আস্তে আস্তে সম্মতি জানিয়ে চলে যায়।

রমলার বিয়ের পর থেকে, রতনবাবুর মনেও সংসারে বেশ একটু অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে এবং ক্রমশঃই সেটা ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্‌ছে, বিশেষ করে রবীনের চাকরী-নিয়ে-বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে বাড়ীর কারুর মনেই শান্তি নেই। রতনবাবু সেদিন হাল্ ছেড়ে দিয়েছেন, একজেদী ছেলে, যা খুসী—করুক্ বলে। কিন্তু তাই বলে

তাঁর পিতৃহৃদয়ে শান্তি তো নেই। রতনবাবু উঠে পড়েন। তড়িৎ! আমি তা'হলে যাই এখন, রণেন আস্‌তে পার্‌ছে না, তুমি বিজনকে একটা খবর দিও টেলিফোনে, কি রকম ধাত বৌমার তাতো জানিনে—চিন্তিত রতনবাবু বেরিয়ে যান্‌ দোকানে।

রমলার শ্বাশুড়ীও খবর পেয়ে আসেন ব্যস্ত হয়ে।—সেকি বউমা! এই তো ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, এর মধ্যে জ্বর এলো! কাছে এসে কপালে হাত দিয়ে দেখেন। তারপর অংসখ্য প্রশ্নে রমলাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন—রমলার তরফ থেকে সংক্ষিপ্ত উত্তর আসে।

তড়িতা ওষুধ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে এবং রমলার মুখে ঢেলে দেয়। মা প্রশ্ন করেন মেয়েকে,—কর্ত্তা জানেন তো?

তড়িতা জানায়—তিনি এতক্ষণ এখানেই বসেছিলেন, এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন। আমি ওর ছোড়্‌দাকে খবরটা দিয়ে আসি মা। বলে ও—চলে যায়। মা বলেন—শীগ্‌গীর আয়, বেলা অনেক হয়েছে, রবীন্‌ আর-তুই খেয়ে নে—রমলার মাথার কাছে বসে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।—আজ-ই কি তোমার অসুখ করে বস্‌ল—বৌমা! মেয়েরা ওবেলা আস্‌বে, রবীন্‌ কাল যাবে, ভরা দুকুর বেলা, আহা! মুখের ভাত ক'টাও খাওয়া হ'ল না—রমলা চুপ্‌ করে চোখ বুঁজে শুয়েছিল, তেমনি শুয়ে রইল।

তড়িতা ফিরে আস্‌তেই মা বলেন—দেখ্‌ রবীনের চান-করা হ'ল কিনা, খাবি চল্‌।

তড়িতা কাছেই একখানা চেয়ারে বসে পড়ে, বলে—ভাল লাগ্‌ছে না কিছু। বৌদির অসুখ হল, দাদা কাল যাবে—এ যেন একটা কি রকম বিশ্রী লাগ্‌ছে।

—তাতো লাগ্‌ছে সবারই—বল্‌তে বল্‌তে তিনি উঠে পড়েন।—তা' হ'লে, কি খাবে—বলতো বউমা? একটু গরম দুধই না হয় খাও? আর একটা কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি মাথা-পা টিপিয়ে নাও। বলে ওর উত্তরের জন্যে আর অপেক্ষা করেন না, চলে যান।

রমলাও আপত্তি করতে পারে না, শাশুড়ীর ভয়ে। তড়িতা তখনো বসেছিল। রমলা বলে—তুমি এইসব করলে—সব্বাইকে বলে, ঢাক্ পিটিয়ে, ভারী আনন্দ হচ্চে, নয়?

তড়িতা মুখ টিপে একটু হেসে জবাব দেয় নন্দটা কি করেছি শুনি? এখন বুঝি যত দোষ আমার হল? ভালো! তড়িতা চলে যায় রমলার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে। যার মধ্যে ছিল অনেক কিছুর ইঙ্গিত।

(৫)

বিকেলে ললিতা, প্রণতা আসে, রবীনের সঙ্গে দেখা করতে। রবীন্ কি একটা কাজে বেরিয়েছে, দেখা হয় না,—রমলার অসুখ শুনে ওর ঘরেই সবাই আসে। রমলা একাই শুয়েছিল, অসুখ তো সত্যই নয়; কেঁদে মাথা ধরেছিল মাত্র; এখন সেটা কমে এসেছে। তাই গায়ের ঢাকা খুলে ফেলেছে, ঘরে এখন কেউ নেই দেখে। হয়ত একটু তন্দ্রা-ই এসেছিল, হঠাৎ প্রণতার কণ্ঠস্বরে চম্‌কে চেয়ে দেখে, ওর খুব কাছে দাঁড়িয়ে, ওরা তিন বোনে। রমলা চোখ খুল্‌তেই জিজ্ঞাসা করে ললিতা···জ্বর-হ'ল কখন? রমলা উত্তর দেয়—জ্বর নয় ভাই,—মাথাটা একটু-ধরেছিল, এখন সেরে গেছে।

ওরা সবাই ওর বিছানায় উঠে, ওকে ঘিরে বসে, কেউ একখানা

হাত, কেউ মাথা টিপতে সুরু করে। শুধু তড়িতই চুপচাপ বসে. থাকে। রমলা মৃদু আপত্তির সুরে বলে—এ-কি ভাই—তোমরা যেন—ললিতার কচি ছেলেটা-ঝিয়ের কোলে কেঁদে ওঠে। ধমক দিয়ে ললিতা বলে—ওদের ওদিকে নিয়ে যাও, বৌদির কষ্ট হবে। দু'একটী—ছেলে ঘরে ঢুক্‌তেই তাড়া দেয়—যা-তোরা দিদিমার কাছে যা। এখানে ছেড়ে দিচ্চ কেন ওদের! ছেলেরা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে চলে যায়।

রমলা বলে—কি যে সব কর, তার ঠিক নেই; এলেই বা এ ঘরে, তাতে হয়েছে কি? চাদর খানা টেনে গায়ে দিতে দিতে কুশল প্রশ্ন করে। আজ কাল সব ডুমুরের ফুল হয়েছ, আস্‌তে সময় হয় না—ইতিমধ্যে ওর অলঙ্কারহীন হাত খানার ওপর ললিতার নজর পড়ে যায়। বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করে—ওমা, একি গো—বৌদি! হাতে এক গাছা করে চুড়ি-কেন? সঙ্গে সঙ্গে গলা, কান, সব জায়গারই দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়।—এ-আবার—কি ফ্যাসান হয়েছে?

ললিতার কথায় সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রণতা বলে—সত্যিই তো! নেড়া বুচো কেন? সঙ্গে সঙ্গে ওরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চায় তড়িতার দিকে। তড়িতা নিরুত্তর।

উত্তর দেয় রমলা। বলে—অসুখ সারলে পরব।

ললিতা বলে—তা বলে কাপড় খানা ও কি এই রকম পরে? একি ব্যাপার রে তড়িৎ? এ কি বিশ্রী পাড ওঠা—কাপড় এ এল কোথা থেকে? অবাক্ বিস্ময়ে ওরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করে।

রমলার লজ্জিত মুখের পানে তড়িতা চায়। ওজানে—সব কথাই, কিন্তু বল্‌তে পারে না। একটু আগে নিজের কানে সবই শুনেছে, তাই ওর নিরাভরণ অঙ্গ ও মলিন কাপড় দেখে বিস্ময়ও বোধ করে

নি, কৌতূহলও জাগে নি বরং তার পরিবর্ত্তে এসেছে অনেক খানি শ্রদ্ধা, ভক্তিতে চিত্ত ওর বিগলিত হয়েছে একদিকে, অন্যদিকে নিজের দাদার ওপর রাগে মন ওর ভরে উঠেছে। ঘৃণায়, অশ্রদ্ধায় বিকৃত হয়েছে। লজ্জায় এই পরের মেয়েটির কাছে মাথা ওর নীচু হয়ে গেছে। হয়ত কিছু বল্‌ত আজ রবীনকে। নেহাৎ কাল চলে যাবে, তাই—তড়িতা শুধু এই কথাটা ভাব্‌ছিল—যে এই সূত্রে ওর বাবাকে সব কথা-জানাবার সুবিধে পাবে। এখন আর ভাঙে না, বৌদির মুখের উত্তরটা শোন্‌বার জন্যে উৎকর্ণ থাকে।

রমলা প্রণতাদের অজস্র প্রশ্নে খুব অসহায় বোধ করে। কিন্তু তবু উত্তর তো দিতে হবে। তাই স্বভাব মধুর হাসি হেসে বলে—আচ্ছা ঠাকুরঝি! তোমাদের অত ছোট জিনিষের ওপর নজর কেন? বাইরের ভড়ংই কি সব?

প্রণতা বলে—অত জানিনে বৌদি, অন্তর বাইরে নিয়ে কোন দিন অত তলিয়ে দেখি না, জানি না। হেসে ওঠে ললিতা।

—বাইরেরটাও দরকার বৌদি, শুধু মন নিয়েও চলে না।

—তেমনি হাসির সঙ্গেই রমলা বলে—চলে না হয় ত, স্বীকার করি—ঠাকুরঝি।

—কিন্তু মনই তো আসল, সে যদি না চায়, তবে পরবে কে? মানুষের মনই না চালায় মানুষকে, আর মনের পরিচয়ই আসল পরিচয়, আমার বাবা বলেন। আমারও তাই মনে হয়, বাইরের যা' কিছু দেখ্‌তে ভাল, সত্যি,—কিন্তু মন আর ব্যবহারই হ'ল আসল, তাই—নকুলবাবু আর কুমুদবাবু আসেন এই সময়ে ঘরে, রমলা মাথার কাপড় একটু টেনে দিয়ে শোয়।

—বৌদির অসুখ কি দিন বুঝেই হ'ল না কি?—কর্ত্তা কাল চলে যাচ্ছেন,—এ্যা!

তড়িতা জবাব দেয় কুমুদবাবুর আগের কথার।—অসুখ তো আর পাঁজিপুঁথি দেখে, দিন ক্ষণ দেখেও হতে পারে না, কেন না, অসুখ কারু সম্মতিক্রমে বা সময়ের অপেক্ষা করে না জামাইবাবু! সে তার নিজ খেয়ালেই চলে থাকে।

ওঁরা দু'জনে ততক্ষণ আসন গ্রহণ করেন। নকুলবাবু বলেন—বৌদি! আপনার উকিলটি তো বেশ যোগাড় করেছেন দেখ্ছি। সবাই হেসে ওঠে।

তড়িতা বলে—তা কি করব বলুন, বেচারাকে যে সপ্তরথীতে ঘিরেছে কি না, রুগী মানুষ, একা আর কত জনের কথার উত্তর দেবে? সহানুভূতির ভান্ করে কুমুদবাবু বলেন—তা' বটে! তাই শালী ওঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছে, তা ভাল, বৌদি? আপনার উনি গেছেন কোথায়? দর্শন মিল্ল না এখনো! তারপর বৌদি-তো প্ল্যান করে যাওয়া আট্‌কে দিতে বেশ রুগী-হয়ে শুয়েছেন—দেখি! তড়িতার দিকে চেয়ে, রুগীর অবস্থা—এবেলা কেমন?

তড়িতা ঝঙ্কার দিয়ে বলে—জানিনা কেমন, রুগী-তো কাছেই রয়েছে, জিজ্ঞাসা করুন। আমি কিছু বল্‌তে গেলেই-তো আবার উকিল বল্‌ছেন।

নকুলবাবু বলেন—আহা, চট্‌ছ কেন? তোমাকে তো গৌরবের আসন-ই দেওয়া হয়েছে।—না, শালী আমার যে রকম রোখাল, আর মুখ ফোঁড়, ব্যারিষ্টার হ'তে পারত, পুরুষ হ'লে।

—আর মেয়ে হয়েছি বলে বুঝি পারি না ভাব্‌ছেন, নয়?

কি আর বলব? বলে তড়িতা মুখে এক রকম শব্দ করে হেসে ফেলে।

—তারপর, বৌদি, আজকের এই অসুখটা কি, বিরহের আশু সম্ভাবনায় হ'ল, না-কি—বলে তড়িতার দিক্ থেকে ফিরে পুনরায় রমলাকে নিয়ে পড়েন।—আপনারা লোকের পেছনে খুব দেখি জোঁকের মত লাগ্‌তে পারেন। বলে তড়িতা হাসে।

রমলা উত্তর দেয় এবার।—নিশ্চয় বিরহে, আপনার বুঝি কোঁ কোঁ করে জ্বর আসে, ঠাকুরঝি একদিন এইখানে আসবার নাম করলে?

—আরে, বাঃ, এই যে বোবারও বোল্ ফুটেছে দেখছি! এই তো চাই—না, কলকাতার মাহাত্ম্য আছে, আগের তুলনায়—

কুমুদবাবু বাধা দেন—সহরের আবহাওয়া, তার ওপর পাশে তড়িতার মত দোসর—

ললিতা এতক্ষণে কথা কয়। বলে—একবারে সোনায় সোহাগা! বলে তড়িতার দিকে চায় একটু বক্র ভাবে।

বড়দি, তুমিও ওঁদের দলে যোগ দিলে! তবে উঠি, আমার তরফে একজনও নেই। ও সত্যিই উঠে যায়। চেপে ধরেন উঠে নকুলবাবু ওর আঁচল।

—এই পালাও কোথা! বস, বলে বসিয়ে দেন। তড়িতা পুনরায় আসন গ্রহণ করে বলে—না পালিয়ে আর উপায় কি?—মানুষ তো বসে বসে মার খেতে পারে না! ওর কথায় সবাই হেসে ওঠে।

রমলা সায় দিয়ে বলে—ঠিক বলেছ, ওঁরা যেন আক্রমণ করতেই আজ সেজে এসেছেন দল বেঁধে।

—বৌদি আগের তুলনায় সত্যি অনেকখানি মানুষ হয়ে গেছেন, একথা স্বীকার করতেই হবে শালীর হাত-যশ আছে।

তড়িতা একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করে। পুরাতন ভৃত্য মধু চা এবং সিঙ্গাড়া এনে হাজির করে এই সময়ে।

—জামাইবাবুদের চা কোন্ খানে দোব ছোড়্দিদিমণি? তড়িতাকে জিজ্ঞাসা করে।

—কেন, ও ঘরে দাও গে না। চলুন, আমরা ও ঘরে যাই, রমলার দিকে চেয়ে বলে—তুমি একা থাক ভাই, এতক্ষণের মারের ধাক্কাটা সাম্লে নাও। তড়িতা ওঁদের ডাকে—আসুন মশাইরা।

নকুলবাবু বলেন—বেশ বসেছি ভাই। আর উঠিয়ো না, দোহাই তোমার, আর যদি কোন দিন কিছু বলি—তড়িতা হেসে ওঠে—হয়েছে আর বল্তে হবে না। দাও মধু, এই খানেই দাও।

—ব্যস্ এইবার তো ছোড়দিদিমণির হুকুম পেয়েছ, ব'লে কুমুদ-বাবু তড়িতার ওপর কটাক্ষ করেন।

ললিতা নেমে আসে, খাট থেকে। —বলে বৌদি এঘরে একা থাক্বে,—ওর মুখের কথা শেষ হতে পায় না; মধু ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে-ছিল, বলে—তাহলে কোথায় দোব? বলে তড়িতার পড়ার টেবিলের দিকে যায়। তড়িতা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—তাই ব'লে আমার পড়ার টেবিলে নয় মধু, ও ঘর থেকে হাল্কা টেবিল, ছোট ছোট টি-পয় দু'চারটে নিয়ে এস। মধু কৃত্রিম রাগের সঙ্গে বলে—তোমায় নিয়ে আর পারিনে ছোড়দিদি, ভারী খাটাও। বলে হেসে চলে যায় এবং অনতিবিলম্বে আরও দু' একজনের সাহায্যে গোটা কতক ছোট টেবিল এনে হাজির করে ও প্রত্যেকের সাম্নে একটা করে রাখে।

—শালীর জন্যে গরম সিঙ্গাড়া গুলো গেল জুড়িয়ে বোধ হয়, নয় মধু! বলে মধুর হাত থেকে ডিস্ খানা ছোঁ দিয়ে নিয়ে নেন নকুলবাবু। তারপর হুকুম দেন চা দিতে।

প্রনতা উঠে চা পরিবেশন করতে যায়, তড়িতা দেয় তাড়া।—তুমি বস মেজদি, ও কাজ আমিই পারব। বেচারা ভালো মানুষ গোছের, তাই কোন দিনই বড় একটা পেরে ওঠে না, বিশেষ করে তড়িতার সঙ্গে।

রমলার দিকে আধ খানা সিঙ্গাড়া-টা হাতে তুলে ধরে কুমুদবাবু বলেন—খাবেন একটু?

রমলা হাত নেড়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করে।

নকুলবাবু বলেন অসুখ হ'লে সিঙ্গাড়ায় না হয় দোষ আছে, কিন্তু চা-য়ে তো দোষ নেই—দাও তড়িতা, বৌদিকে আগে এক কাপ চা দাও।

নকুলবাবুর কথার অনুসরণ করে কুমুদবাবু বলেন—অসুখ হলে বরং ওটা বেশীই চলে। কিন্তু বৌদির চা চলে তো? বলে রমলার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে উত্তর না পেয়ে তড়িতাকে প্রশ্ন করেন—শালী! তুমি তো জানো বল না?

তড়িতা সবাইকে চা দিয়ে নিজের ছাঁকতে ব্যস্ত, বলে ঘাড় নেড়ে—না, বৌদি ও রসে বঞ্চিত।

ললিতা বলে—তা হোক্, আজ একটু খেতেই হবে। আমরা সবাই খাচ্ছি, আর বৌদি বেচারী মুখ শুকিয়ে শুয়ে থাক্‌বে। দে, বৌদিকে দে।

রমলার মুখের ওপর বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে ধরেন—

নকুলবাবু। বলেন কি, এদ্দিন কল্‌কাতা সহরে রয়েছেন, আর চা-খেতে শিখলেন না? আচ্ছা বেরসিকা লোক তো?

রমলা হাসে, সহরে আছি আজ, না হয় খাব, কিন্তু কাল যদি পাড়াগাঁয়ে থাকি, তখন?

—আহা, সে তো বাপের বাড়ী, দু'দিনের জায়গা, না হয় দু'মাস গেলেন, তার বেশী তো নয়? না হয় নিয়ে যাবেন সঙ্গে দু'দশ পাউণ্ড চা—তা ছাড়া জিয়াগঞ্জ, সে তো খুব পল্লীও নয়! দোকান বাজার স্কুল সবই আছে।

রমলা বলে—দু'দশ দিনের জন্যে হ'লে নিয়ে যাব, কিন্তু যদি চির-দিনের জন্যে থাক্‌তে হয়, তাহলে?

তড়িতা ছাড়া বাকি চারজনেই এক সঙ্গে চম্‌কে ওঠে রমলার কথায়। এবং পরক্ষণেই রমলার মুখের দিকে প্রায় এক সঙ্গেই সবাই চায়, ও পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করে। সকলের চোখে মুখের কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা, জমা হয়েছে যে, তা বোঝা যায়।

নকুলবাবু চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে, হাত দুটো জোড় করে বলেন, —মাপ করুন বৌদি, চা খেতে আর আমরা অনুরোধ করব না এরপর! সামান্য চায়ের ব্যাপারে এত বড় অকল্যাণকর কথা মুখে এল!

ললিতা ও প্রণতা তড়িতার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে এবং চোখে চোখে কি একটা কথাও হয়ে যায়।

রমলা এবার তড়িতাকে বলে—আমায় দাও চা! বাইরে থেকে উঁকি দেয় রবীন।—বাঃ, সব আসর জমিয়ে ফেলেছ দেখছি।

—তুমিও যোগ দিতে পার—বলে নকুলবাবু ডাকেন। এস হে এস।

—আমার আজ আর সময় নেই, কাজ অনেক্। তড়িতা!

আমার চা পাঠিয়ে দে ও ঘরে। বলে ও চলে যায় খুব ব্যস্ততা দেখিয়ে।

—মধু, দাদাবাবুর চা দিয়ে এস। বলে তড়িতা বাইরে অপেক্ষমান ভৃত্যের প্রতি আদেশ দিয়ে, বাঁ হাতে বৌদির জন্যে চা ঢালে।

—শালী! তোমার দাদাটির আজও কি সেই ম্যানিয়াটা সারেনি না-কি?

রমলার কাছে চা পৌছে দিয়ে ফির্‌তে ফির্‌তে উদাসকণ্ঠে তড়িতা জবাবে বলে—কই, দেখছি না তো তার লক্ষণ কিছু।

—বৌদি তা'হলে আজ ও দুঃখই ভোগ করছেন? বল কি শালী! এ তো বড় ভয়ানক কথা—রমলার দিকে ফিরে বলেন—সে কি বৌদি! আজও স্বামীর মন জয় করে বাঁধতে পারলেন না? নাঃ, কোন ক্ষমতা নেই দেখছি আপনার? তড়িতার দিকে মুখ ফিরিয়ে, নেন, তাই কি উনি বিবাগী হয়ে যাচ্ছেন, না কি? তুমি একটু বলনা গো! তড়িতা নীরব।

ললিতা চায় তড়িতার দিকে, ইঙ্গিত পূর্ণ দৃষ্টিতে। নকুলবাবু বীর দর্পে এবার ওঠেন :—নাঃ, হ'ল না, এরা ধর্মঘট করেছে, আমার কথার জবাব দেবে না—যাই, ঝগড়া করে আসি, বলে চলে যান্‌।

কুমুদবাবুও সার্টের আস্তিন্‌ গুটিয়ে ওঠেন—চলুন, দরকার হলে রবীনের সঙ্গে হাতা-হাতিও করব আজ বৌদির জন্যে। এত বড় অবিচার সে করছে—বেরিয়ে যান দেখে ভীত হয় রমলা।

ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে—ঠাকুর জামাই!

কুমুদবাবু ফিরে দাঁড়িয়ে বলেন—আঃ, পেছু ডাকে, এত বোকা কেন আপনি! কি বল্‌ছেন, বলুন।

মিনতি-মাখা কণ্ঠে রমলা বলে—সত্যিই যেন কিছু বল্‌বেন না; কাল চলে যাবেন—ওর কণ্ঠে কাতর অনুনয় যেন ঝরে পড়ে।

ললিতার দিকে ফিরে বলেন—শুনছ, তোমার—দাদার ওপর বৌদির দরদের কথা? রমলার বিছানার কাছে দু'পা সরে এসে বলেন—বৌদি, ভাই, আপনায় এই ঠাকুরঝিটিকে একটু পায়ের ধুলো দেবেন—বলে ললিতার মাথাটি দেন আদর করে একটু নেড়ে। কিন্তু সে যে এত দুর্ব্যবহার কর্‌ছে আপনার ওপর—সেই বিয়ের সময় থেকে আজও, তার কি? তড়িতাকে এবার প্রশ্ন করেন আজও সেই একই রকম আছে? একটু কমেনি?

তড়িতা কৃত্রিম রাগের সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। আমি অত জানি না মশাই! যাদের ব্যাপার, তাদের জিজ্ঞাসা করুন না কেন!

—আহা, চট্‌ছ কেন, তারা যে দু'জনে দু'রকম। একজন ঢেকে রাখতে চান, বলে রমলার দিকে কটাক্ষ করেন, আর একজন এড়িয়ে যেতে চান্। তুমি হচ্ছ ঘরের লোক, তাই—হয়েছে, আর আপনারা হলেন বাইরের লোক, নয়?—তা নয়? আমরা থাকি অন্য বাড়ী।

রমলা মনে মনে ভয় পায়। যার জন্যে এত সব চেষ্টা, আজ বুঝি যায় ভেসে।

তিনি চলে গেলেন আর কথা কাটাকাটি না করে। পেছনে যায় ললিতারাও। তড়িতা উঠে আসে রমলার কাছে।—কি বিশ্রী কাণ্ড বৌদি, লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে যাচ্ছে। রমলা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মুখে ঢাকা দেয়।

ললিতারা এসে প্রণাম করে। কাল পাকুশী যাচ্ছ? ললিতা বলে। রবীন্ গোছ-গাছ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, রামপদ হাতে হাতে সব

ঘুমিয়ে দিচ্ছে, সদলবলে ওরা এসে যায় ঘরে। নকুলবাবু আসন গ্রহণ করেই কাজের কথা পাড়েন—তুমি যে দেখছি খুব ব্যস্ত হে? ডাক্তার বাবু! রবীন্ হাতের কাজ সারতে সারতে বলে—একটু হয়েছি বৈকি, যেতে হবে এক দেশে যখন.—ভাল, তুমি গিয়ে আস্তানা গাড়লে, আমি কিন্তু আগেই যাব,—তা বলে রাখছি। বড় দেখে এবং ভালো দেখে বাড়ী নিও।

কুমুদবাবু ললিতা প্রণতা ওরা এক সঙ্গে ব'লে ওঠে, বারে, আর আমরা বুঝি যাব না! ভারী এক্‌লা যেঁড়ে লোক তো!

রবীন্ হ্যাণ্ডব্যাগ গোছাচ্ছিল, মুখ তুলে বলে, আগে আমাকেই যেতে দাও, তারপর সবাই যাবে তো!

নকুলবাবু বলেন তুমি তো আগামী কাল্‌কে নিশ্চয় যাচ্ছ, তারপর আমরাও দেশটা দেখতে যেতে চাই এই আর কি! কিন্তু গিয়ে আবার চিঠি চাপ্‌টি ছাড়্‌বে তো?

নকুলবাবুর কথার অনুসরণ করে কুমুদবাবু বলে ওঠেন, না, পদ্মার দৃশ্য দেখে বিলকুল সবাইকে ভুলে যাবে? দেখো তা যেন যেওনা ভুলে, এক্‌লা মনোরম দৃশ্য উপভোগ করনা যেন, তাহলে আমাদের শাপ কিন্তু লাগবে তা বলে দিচ্ছি।

প্রণতা হাসে। ললিতা বলে—না, দাদা ঠিক নেমন্তন্ন দেবে, দেখে নিও।

—দেখা যাবে, এখন দাদার সপক্ষে কথা কইলে, ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে, এরপর খোঁচা খেতেও হতে পারে, এ কথা মনে রেখো।

ললিতা বলে—দেখছ দাদা—দেখছ নয়, শুনছ দাদা, বল্‌তে হয়। বলে নকুলবাবু হেসে ওঠেন।

প্রণতা অল্পভাষিণী। ও বলে—বাব্বা! এত কি তোমরা জানো!
সেই থেকে কান, প্রাণ সব গেল একেবারে।—তা অমন যায়, একটু সহ্য কর্‌তেও হয়। বলে কুমুদবাবু রবীন্‌কে জিজ্ঞাসা করেন—সঙ্গে যাচ্ছে কে কে?

সহজ কণ্ঠে রবীন্ উত্তর দেয়—রামপদ, আর উড়ে ঠাকুর।—বাঃ, সঙ্গী দুটি চমৎকার তো! এরাই হ'ল, তোমার প্রবাসের সাথী, কি বল? নকুলবাবু সায় দিয়ে বলেন—নাঃ, বাছাই করার বিলক্ষণ ক্ষমতা, একথা বলতেই হবে, তারিফ না করে পারি না—হায়রে, বৌদি যদি—উড়ে ঠাকুর হতেন, বৌদি না হয়ে—তাহ'লে আজ তাঁর ডাক্ পড়ত—খুব গম্ভীর হয়ে বলেন উনি। ওঁর কথা শেষ হতে না হতে সবাই হেসে ওঠে। কেবল রবীন্‌ই আরও গম্ভীর হয়।

প্রণতাকে নকুলবাবু বলেন—ভাল করে শুনে রাখ, আর কখনো আমার সঙ্গে যেতে চেওনা কোথাও, আর যাব বল্‌লেই ঐ উত্তর দেব, তোমার দাদার, পথের সঙ্গী বাছাই করার আদর্শ আমিও নেব। এ-ইঙ্গিত যে কার উদ্দেশে করা হল, তা ঘরের সবাই বুঝলে—এক ভৃত্য রামপদ ছাড়া। কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে শব্দভেদী বাণ ছোড়া হ'ল, তার মনের ঠিক সেই জায়গাটি-তে গিয়ে বিঁধলো কিনা, তার সঠিক্ তথ্য পাওয়া গেল না।

ঘরের সবাই হঠাৎ অন্য রাজ্যে যেন গিয়ে পড়্‌ল মুহূর্ত্তে। সবাই বিশ্বম্ভর মূর্ত্তির হয়ে উঠ্‌ল সজীব সংস্করণ। তবু যে আঘাত করলে, তার একটু আত্মপ্রসাদজনিত আনন্দ এল বৈকি! আর যাকে করা হল আঘাত, সেও নিশ্চয় একটু আহত হ'ল। না হলে দু'পক্ষই কখনো রণে ভঙ্গ দিতে চায় না। রবীন্ না হয় রাশভারী লোক,

স্বভাবতঃ গম্ভীর। কিন্তু এ পক্ষ তো—তা নয়। এরপর আর কথাবার্ত্তা হয় না, বিদায় নিয়ে ফিরে আসে রমলার ঘরে সবাই। ওরা দেখে, ইতিমধ্যে রতনবাবু ও বিজন্ এসে গেছেন। মেয়েরা ছুটে গিয়ে পিতার পায়ের ধুলো নেয়, বিজনকে নমস্কার করে মায়ের সঙ্গে দেখা কর্‌তে চলে যায়। কুমুদবাবু ও নকুলবাবু এঁরাও আসেন। রতনবাবু ভৃত্যকে ডাক্ দেন, মধু। মধু দৌড়ে আসে।—দু'খানা চেয়ার দে।

—বস্‌ছি, ব্যস্ত হবেন না, তারপর বিজনবাবু, ভাল তো! ব'লে, নমস্কার করে নকুলবাবু বসেন।

রমলার ছোড়্‌দা বিজন, সেও কুশল প্রশ্ন করে। শিষ্টাচার প্রভৃতি শেষ করে নকুলবাবু—শ্বশুরের সঙ্গে আলাপ করেন।—দাদা কাল-ই যাচ্চেন, এই সময় বৌদিরও হ'ল অসুখ, আপনি একা, দোকান, বাড়ী দুটো দেখা কি সম্ভব, এই বয়সে!

রতনবাবু একটু সকরুণ হাসি হাসেন। আর বাবা, যার অদৃষ্টে যা আছে, তা হবেই। বাড়ীতে ডাক্তারখানা খুলে বস্‌লে সবই দেখা হ'ত, তা' ওর হ'ল না, পরের চাক্‌রী-ই বেছে নিলে যখন, আর কি বল্‌ব? দুপুরে বেরিয়ে যাই, আর ফিরি রাত দশটায়, তাও রণেন আছে বলে, খানিকটা বাঁচি। আজ তোমরা আস্‌বে, বৌমার জ্বর, —তাই একটু সকাল্ ফিরেছি। চল আমার ঘরে যাই। বিজন, তুমি বাবা একটু বস বৌমার কাছে। ওঁরা চলে গেলে, রমলা বাড়ীর খবর নেয় একে একে। রবীন্ এক সময় বিজনকে ডেকে পাঠায়, এসেছে শুনে এবং কাল ট্রেনে তুলে না দেওয়া পর্য্যন্ত রবীন্ ওকে ছাড়ে না। নিতান্ত অনিচ্ছায়ই বিজনকে সে রাত্রিটা থেকে যেতে হয়, রমলার মুখ চেয়েই শুধু।

বন্ধুত্বকে আত্মীয়তায় আরো ঘনিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে বিজন একদিন রমলাকে বন্ধু রবীনের হাতেই তুলে দিয়েছিল, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, তাই ওদের বন্ধুত্ব আজ আত্মীয়তায় পর্য্যবসিত হলেও তা' সুখেরও হয়নি, গভীরও হয়নি। এ খবর বিজন যেদিন তড়িতার কাছে পায়, সেইদিন থেকে মনে মনে রমলার কাছে নিজেকে অপরাধী করেই আস্‌ছে। রমলার এই বিবাহও তার থেকে পাওয়া যে দুঃখ, এর জন্যে সে ই একমাত্র দায়ী। খবরটি একদিন তড়িতা দিয়েছিল এই ভেবে; তার দাদার বন্ধু তো, যদি কেউ ফিরিয়ে আন্‌তে পারে রবীনের মন রমলার দিকে, তবে একমাত্র বিজন পারে। তড়িতার ছিল এই বিশ্বাস। কিন্তু ওর কথা শুনে বিজন যখন বলে—আমার নিজের বোন্—বোন না হয়ে রমলা যদি অচেনা মেয়ে হ'ত, তাহলে হয়ত সে পারত—বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে দু'চার কথা রবীন্‌কে বল্‌তে—কিন্তু এক্ষেত্রে তা হবে না, তাছাড়া রমলা যখন কোন দোষ-ই করেনি, তখন কি নিয়ে যাবে বল্‌তে ? রবীনের ওপর ওর মন সেইদিন হতে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে, ওঠ্‌বার কথাও। তবু আজও ওকে আস্‌তে হয়, নিরুপায় হয়ে।

বিজনের দারুন অস্বস্তি হয় তখন-ই, যখন দেখে সহিষ্ণুতা-পরায়ণা হাসিমুখী রমলাকে। ওর সঙ্গে যখন কথা কয়, তখন কি একটা অশান্তির ঝড় মনে বইতে থাকে, যার জন্য রমলার কাছে বেশীক্ষণ বস্‌তেও সাহস করে না।

রবীনের সঙ্গে দেখা করে বিজন তখনই ফিরে এ ঘরে আসে। রমলার শ্বাশুড়ী দাঁড়িয়ে, দেখে করে প্রণাম।—আজ আপনার দেখা-ই পাইনি মোটে—আশীর্ব্বাদ করে রবীনের মা বলেন—কি করে আর

দেখ্‌বে বাবা ; বউমা পড়ে, রবীন কাল যাবে, মেয়েরা এসেছে। এই সব ঝঞ্ঝাট নিয়ে আছি। বউমা এবেলা কি খাবে বলত ?—ওমা, দাদা ডাক্‌ছে তোমায়। বল্‌তে বল্‌তে তড়িতা এসে প্রবেশ করে। বিজনকে বলে—কি ভাগ্যি বসে আছেন দেখ্‌ছি, আমি তো ভেবেছিলুম চলে-ই গেছেন, বিশেষ দরকার আছে আজ আপনাকে, একটু বসুন আস্‌ছি—বলে ও চলে যায়।

রমলার শ্বাশুড়ী বলেন—আজ না হয় একটু দুধ খেয়েই যাক্ পাঠিয়ে দিই গিয়ে—বল্‌তে বল্‌তে তিনি চলে যান। বিজনও তাঁর কথায় সায় দিয়ে বলে, তাই খাবে। তড়িত পুনরায় ঘরে আসে এবং দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বসে। তারপর কোন ভূমিকা না করেই বলে—দাদা তো কাল পাকৃশী যাচ্চে, কিন্তু বৌদির যাওয়ার কি ব্যবস্থা করা যায় বলুন তো ? আজ না হোক্, দু'দিন পরেও তো দিয়ে আসা যায় ?

বিজন তড়িতার মুখের দিকে এক মুহূর্ত্ত চেয়ে উত্তর দেয়—তা হয় না তড়িতা, বিয়ের পর থেকে যে আজ আট মাসের মধ্যেও একই বাড়ীতে বাস করে নিজের খেয়াল নিয়েই চল্‌ছে, সেই লোককে কি বিদেশে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই সে নেবে ? ও নেহাৎ মেয়েলী আনা বুদ্ধি—

হতাশ হয়ে তড়িতা বলে, তবে কি বৌদির এত বড় জীবন নিরর্থকই হয়ে থাক্‌বে ছোড়দা ? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিজন বলে—আমাদের হাতে তো এই গুরুতর অন্যায় সহ্য করা ছাড়া কোন উপায় নেই তড়িতা।—তা হলে দাদা চলে যাওয়ার পর বাবাকে সব কথা খুলে বলা ছাড়া উপায় নেই ছোড়দা, আমি ভেবে রেখেছি তাই বলুব। না হলে বৌদির ভবিষ্যৎ জীবন যে কি ভাবে যাবে তার ঠিক নেই।

হয়ত দাদা কাল আর একটা বিয়ে করবে—তখন ও ভেসে যাবে, বাবার, মায়ের এঁদের তো বয়েস হয়েছে, তা ছাড়া মানুষ কে কখন যাবে না যাবে তার ঠিকও নেই—আর আমিও তো এখানে বরাবর থাকব না—লজ্জায় তড়িতা মুখ নীচু করে—শেষের কথাটা বলে। কিন্তু আপনার বোনটিকে আজ বুঝিয়ে বলুন, সে যেন ছেলেমি করে বাধা না দেয়। মুখ তুলে তড়িতা বলে। কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বিজন বলে—তড়িতা তোমারই লেখা পড়া শেখা সার্থক হয়েছে—একজন পরের জন্যে—আমার বোনের জন্যে তুমি যে রকম ভাবছ দেখ্‌ছি—আমার মা বেঁচে থাকলেও এর চেয়ে বেশী ভাবতে পারতেন না। কিন্তু ওদের কথা আমায় আর বলনা, তোমাদের বাড়ী আসা কমিয়েছি শুধু রমলার-ই দুঃখে তড়িতা—আবার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ও। তারপর বলে—রবীনের ব্যবহারে রমলার কাছে আমি চির অপরাধী হয়ে আছি—বাধা দিয়ে রমলা বলে—তোমার অপরাধ এতে কোন্‌খানে—অপরাধ যদি কিছু থাকেই তবে তা আমারই আছে। —জানি তুই আমার দোষ দিবিনে রমা, বলতেও দিবি নে মুখ ফুটে, তবু আমার মনে যে অনেক সময়েই জাগে এও সত্যি বলেই জেনে রাখ্‌।

সায় দেয় তড়িতা—বাবার, আমারও ঠিক ঐ কথা ছোড়দা, কিন্তু বৌদির মত তা নয়। ও নিজের মাথায় সব দোষ তুলে নিয়ে আমাদের সবাইকে মুক্তি দিতে চায়।

রমলা মুখ টিপে একটু হেসে বলে, ছোড়্‌দা এলে খুব মজা হয় তোমার, বেশ ক'রে দু'কথা বলে নিতে পার আমায়, কিন্তু যে কথাটা সোজা, সেটা যে কেন তোমরা বোঝ না—তাই আমি ভেবে পাইনে—

বিজন রমলার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—কোন্ সোজা কথাটা আমরা বুঝি না ?

ম্লান মুখে রমলা বলে—আমার অদৃষ্টের যে ফের, তার ফল ভোগ তো আমাকেই করতে হবে, আমার জন্যে কেন তোমরা তার ফল ভুগ্‌তে যাবে ? সেটা তো তোমাদের পাওনা নয়। আমার ভাগ্যের ওপর দোষ দাও, নইলে এমন হবে কেন ছোড়্‌দা ! তুচ্ছ একটা কারণে এত বড় একটা কাণ্ড—রমলার দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ দু'জনেই ওরা পায় শুন্‌তে।

বিস্ময়ের সঙ্গে বিজন রমলার মুখের দিকে চায়।– এত সব কথা তুই কোত্থেকে শিখ্‌লি রে ?

—দুঃখই শিখিয়েছে বোধহয় ছোড়্‌দা, নইলে মানুষ তো কেউ হাতে ধরে শেখায়নি, তোমরাও শেখাও নি, তবে কার নাম করে দেব বল ? রমলার মুখে মৃদু হাসি দেখা দেয়। আমিও তাই ভাবি এক এক সময়, এত সব কে শেখায় ? নিজেকে জিজ্ঞেস্ করে উত্তর পাই—দুঃখই মানুষকে শেখায়।

—বেশ। বলে তড়িতা উঠে যায়।

(৬)

—ডাক্তারবাবু, আপনি যদি মেয়েদের আনেন—আমিও তাহ'লে আনতে পারি। না হলে একলা থাকার—

বাধা দিয়ে রবীন্ বলে—কেন, বেশ তো আছি আমরা, অস্থায়ী বাসা, এখানে সংসার পাতিয়ে লাভ কি? কখন্ কোন্ সময়ে হয় ত পদ্মাদেবী এই চালাগুলো ভাসিয়ে নেবে, তার চেয়ে বাড়ীগুলো আমাদের তৈরী হোক্, তবু এর চেয়ে নিরাপদ হওয়া যাবে—তখন আন্‌বেন।

—আপনার বুঝি বিয়ে হয় নি? তাই ভয় দেখাচ্ছেন?

রবীন্ বলে—তবে আসুন, এই অসুবিধের মধ্যে—মেয়েদের কষ্ট হবে, নিজেদের কত অসুবিধে তার ঠিক নেই—

পদ্মার বুকে সারাপুল তৈরী হচ্ছে, তার জন্যে এসেছে যত ইঞ্জিনিয়ার, কণ্ট্রাক্টর, আর এসেছে তারা, যারা পুলটি গড়বে, সেই কুলী মজুরের দল—আর তাদেরই চিকিৎসক হয়ে এসেছে রবীন্। ডাক্ তার সব সময়েই প্রায় আছে, কারণ মোটে একজনই ডাক্তার, তখনো হাঁসপাতাল তৈরী সম্পূর্ণ হয়নি, অন্যান্য ডাক্তারও আসেনি, ছোট্ট একটা বাড়ীতে, করগেটের চালায় রবীনের ডাক্তারখানা, দুজন মাত্র কম্পাউণ্ডার নিয়ে।

রবীন্‌কে কাজেই ওখানকার সবাই এক দিনেই চিনেছে, একজন মাত্র ডাক্তার। ট্রলি করে ঘুরে বেড়াতেও হয় অনেক সময় লাইনের ওপর দিয়ে, ঝড়, জল, রোদ সব কিছুকেই উপেক্ষা করে। রোগীর সেবায় ও সম্পূর্ণ আত্ম নিয়োগ করেছে মন প্রাণ দিয়ে, এবং এখানে এসে ও পেয়েছে অনেকখানি শান্তি।

পদ্মার নোনা ইলিশমাছ খেয়ে কুলী মহলে সেদিন কলেরা দেখা দিয়েছে। রবীনের এতটুকু অবসর নেই নিশ্বাস ফেলবার। সারা দিনই কুলীদের বস্তীতে রোগী দেখে বেড়ান, উপযুক্ত নয় একাজে কম্পাউণ্ডার গুলোও তেমন, হঠাৎ এত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে পর্য্যাপ্ত ওষুধও নেই, ও খুব মুস্কিলে পড়েছে। সেই কল্‌কাতা থেকে কখন ওষুধ আসবে, রাগে আর অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত রবীন্ ফিরেছে বাসায় অনেকটা রাত্রে সবে, এমন সময় এলো সেই ভদ্রলোক। যার সঙ্গে হয়েছে ওর আলাপ, ঘনিষ্ঠতায় আজ এসেছে, সেই গিরীন্‌বাবু এসে উপস্থিত।—আমায় কাল একটা ইঞ্জেকসন দিয়ে দেবেন তো ডাক্তার-বাবু। একটু থেমে বলেন—বড় ভয় কচ্ছে, যে রকম চারদিকে—

রবীন্ সার্ট খুলতে খুলতে বিরক্ত হয়েই বলে—আসুন দিয়েই দিই এখুনি। ওর মেজাজ তিক্ত হয়ে আছে, তা বুঝতে দেরী হয় না গিরীন্‌বাবুর।

একটু সংকোচের ও সহানুভূতির সঙ্গেই বলেন, কাল দেবার কথাই বল্‌ছি ডাক্তারবাবু, আজ এই মাত্তর ফির্‌ছেন—নতুন রুগী আজও অনেক বোধ হয়?

রবীন পোষাক ছেড়ে কাপড় খানা কোন রকমে কোমরে জড়িয়ে চেয়ারে বসে পড়ে বলে—ওঃ, অনেক! বাবা প্রাণ আমার গেল। কদিন কলেরার রুগী ঘেঁটে ঘেঁটে, আর না জিরিয়ে না ঘুমিয়ে গেলুম আর কি—খেতে পর্য্যন্ত পার্‌ছি না, এমন একটা ঘেন্না হয়েছে মশাই—বলে ওঁর দিকে চায়। আমার যে আবার কি হবে তার ঠিক নেই। শরীরও ভাল নেই, আর রোজ এতটা রাত্রে চান্ ও করতে হচ্ছে—রামপদ! জল গরম হল?

গিরীনবাবু সভয়ে উত্তর দেন—আপনি এই সময় যদি পড়েন, তবে তো আরো মুস্কিল—খুব সাবধানে থাকুন। বলে এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে কোন কিছু না পেয়ে মাটিতেই বসেন।

—আজ রাত্তিরে আর কিছু খাচ্ছিনা মশাই, যে রকম রোগের ধুম, সারা রাত-ই হয়ত জাগতে হবে। রামপদ গরম জল একটু চড়িয়ে দাও, শুধু একটু চা খাব।

সভয়ে গিরীন্‌বাবু বলেন—যে রকম রোগের প্রকোপ চলেছে, আর দু'দিন পরে হয়ত কাজ বন্ধ হয়ে যাবে—মুখ ওঁর শুকিয়ে আসে।

গরমজল, সাবান, তোয়ালে প্রভৃতি ঠিক করে রামপদ খবর দেয়। রবীন্ বলে—বেটারা খুব সস্তার মাছ পেয়ে গাদা গাদা খেয়ে নিজেরা তো মরছে, আর সেই সঙ্গে আমাকেও মারছে, উঃ, কি অমানুষিক পরিশ্রম যে করতে হচ্ছে, ডাক্তার হয়ে ঝক্‌মারি করেছি মশাই—বলতে বলতে ওঠে—আবার এখুনি রিপোর্ট লিখতে বসতে হবে—ও চলে যায়। গিরীন্‌বাবুও বাসায় ফেরেন।

রাত্রে রবীনের শোওয়া আর হয়না, ডাকের ওপর ডাক্ আসে নতুন রুগীর খবর নিয়ে। রবীন্ যায় কুলী বস্তীতে এবং গিয়ে যা দেখে, তাতে গিরীন্‌বাবুর ভবিষ্যৎবাণী মনে পড়ে যায়।

প্রায় তিন ভাগ কুলী কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে এবং বাকি যারা, তারা পালিয়েছে ওখান থেকে। কয়েক দিন কাজকর্ম বন্ধ থাকে এবং কর্তৃপক্ষও বিব্রত হয়ে ওঠেন। কল্‌কাতা থেকে প্রয়োজন মত ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার ও ওষুধ পত্র সরবরাহ করেন এবং ঈশ্বর দি, দামুকদিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সুস্থদের সরিয়ে দেন, সেই কয়দিনের জন্যে, যে কয়দিন রোগের প্রকোপ না কমে।

গিরীন্‌বাবু শুধু থাকেন, বাসার মেয়েদের পাঠিয়ে দিয়ে। কুড়ি বাইশ দিন ধরে রবীনের স্নানাহার ও শয়ন, নিদ্রা তো দূরের কথা, বিছানার সঙ্গে দেখা শোনা পর্য্যন্ত হয় না, রোগীদের সেবায় বিশ্রাম হীন হয়েই ও করেছে অক্লান্ত পরিশ্রম, দরকার হলে নার্সিং ও করেছে এবং ওর চিকিৎসার তৎপরতায় অনেক রুগীর প্রাণও ফিরিয়ে এনেছে।

পাক্‌শীতে রবীনের খুব নাম হয়ে গেছে এই কয়দিনের মধ্যে এবং কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এ খবর পৌছে গেছে। ওর কাজে সন্তুষ্ট হয়েই তাঁরা ওর পদোন্নতি ও স্থায়ী চাকরীর, সেই সঙ্গে ওর পরিবারের জন্যে কোয়ার্টার ইত্যাদিরও ব্যবস্থা শীগ্‌গীর করবেন জানিয়েছেন।

রতনবাবু রবীনের খবর অনেক দিন পান্‌ নি, চিঠির ওপর চিঠি লিখেও উত্তর পান্‌ নি, ভয়ে ভাবনায় তাঁর পিতৃহৃদয় যে পরিমাণে ব্যাকুল, তার চেয়ে অনেকখানি বেশী উতলা হয়ে পড়েছেন ওর মা, এবং কর্ত্তাকে তাগিদ দিয়ে করিয়েছেন শেষ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাম, কিন্তু তারও কোন উত্তর নেই।

রণেনের কদিন অসুখ, সে আছে পড়ে, রতনবাবু বুড়োমানুষ ব্যবসা নিয়ে একা বিব্রত; তাই রমলার ছোড়দা বিজনকে পাঠিয়েছেন অনেক করে বলে কয়ে যে, ওর খবরটা যদি আনতে পারে সে, ওর বন্ধু।

বিজন ওঁদের পরিবারের অবস্থা দেখে ও রবীনের এই হৃদয় হীনতায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই যায়, দু'কথা শুনিয়ে আসবার সুযোগ পেয়ে।

রবীনের কদিনের চিঠি পত্র এবং কাগজ টেবিলে জমা হয়ে আছে, সময় হয়নি পড়বার বা দেখবার। মাত্র ও নিয়েছে সই করে বাপের টেলিগ্রাম খানা এবং সেটা পড়েছে, কিন্তু তার উত্তর দেবার ও সময়

পায় নি। আজ রোগের হিড়িক্ অনেক কম, তাই একটু সময় পেয়েছে, অন্য ডাক্তারদের ওপর ভার দিয়ে এসেছে আজ রাত্রিটার। টেবিলের স্তূপাকার চিঠি পত্র বাছতে বাছতে অনেকগুলো চিঠি পায়, ওর বাবার লেখা ও তড়িতার লেখা। রবীনের খবর না পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়েই ওঁরা ঘন ঘন পত্র দিয়েছেন। পত্রগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নেয় ও তারপর বসে উত্তর লিখতে, এমন সময়ে সহসা আসে বিজন। ঘরে ঢুকেই রবীন্‌কে নিবিষ্ট হয়ে লিখতে দেখে কোন ভূমিকা না করেই বলে বিজন।

—একি! সুস্থ-সবল শরীরে এখানে বসে আছ,—রবীন্ ওর কণ্ঠস্বরে চোখ্ তুলে চায়। হাতের কলম হাতেই রয়ে যায়, বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে বিজনের দিকে। সে ভাব সাম্‌লে নিয়ে প্রশ্ন করে—বিজন যে, কতক্ষণ এসেছ?

—এই তো আস্‌ছি, কিন্তু তোমার খবর কি? তোমার মা বাবার পেটে-অন্নজল যাচ্ছেনা,—চিঠি, এমন কি টেলিগ্রামেরও উত্তর নেই—ভেবে ভেবে সারা হয়ে আমায় পাঠালেন তোমার খবর জান্‌তে! বিস্মিত বিজনের মুখ থেকে কথা-কয়টি বেরিয়ে আসে। কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে, চোখে মুখে ও বেশ একটু-বিরক্তি দেখা যায়।

রবীন্ বুঝতে-পারে এবং হাতের কলম নামিয়ে রেখে স্বভাব-সিদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বলে—তুমি যেমন দু'কথা-বল্‌বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছ, আমি তা নেই।—মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বলে—বস, স্থির হও, তারপর আমার অবস্থার কথা শুনে যা বল্‌তে হয় বল। বলে বাঁ হাতে তুলে ধরে অসমাপ্ত পত্রখানা। দেখ বাবাকেই-এই মাত্র চিঠি লিখ্‌তে

বসেছিলাম। ডান হাতের-কলমটাও তুলে উঁচু করে ধরে—এখন বোধ হয় তোমার বিশ্বাস হবে যে, সত্যিই-চিঠি লিখ্‌ছিলাম? বলে জিজ্ঞাসু চোখে চায় বিজনের দিকে। বিজন তখনো দাঁড়িয়েই আছে দেখে বলে মোলায়েম সুরে—তুমি যে দেখ্‌ছি দাঁড়িয়েই রইলে। মিলিটারী মেজাজে এসেছ আর সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে ও আছ, বস, বস, ট্রেন থেকে এলে—রামপদ! দু'কাপ চা দাও। বলে ভৃত্যের উদ্দেশে একটা হাঁক দেয় রবীন্। ভেতর থেকে উত্তর-আসে দিচ্ছি দাদাবাবু।

নিতান্ত অনিচ্ছাতেই রবীনের অনুরোধে বিজন বসে। রবীন্ প্রশ্ন-করে—বাবা-মা সবাই-ভাল আছেন তো? আমার-ওপর অযথা অন্যায় রাগ কর-না বিজন, প্রায় তিন-চার হপ্তা ধরে আমার যে কি অবস্থা গেছে, তা' বল্‌বার নয়। কাগজে নিশ্চয় তোমরাও তার খানিকটা-খবর পেয়েছ। বলে উত্তরের আশায় ওর মুখের ওপর দৃষ্টিপাত করে। কিন্তু উত্তর পায় না, তাই সাফাই দেওয়ার মতই-বলে যায়, তুমি, হয়ত বা মা-বাবা সবাই-চটে আছে বিজন, কিন্তু কোথা দিয়ে কি ভাবে যে দিন্ রাত গেছে আমার,—তা বলতে পারিনা। বোধ হয় ভাল করে নিঃশ্বাস ও নিতে পাই নি সব দিন। আজই মাত্র বস্‌তে পেয়েছি। রামপদ দু'কাপ-চা এনে হাজির করে। রবীন বিজনের দিকে এক পেয়ালা সরিয়ে দিয়ে বলে, চা খেয়ে খুসী-মনে কথা কও, কি-ছেলেমি কর্‌ছ, নাও হাত মুখ ধোও, ওঠ। রামপদ জল এনে দা'ও—আর-তোমার দাদাবাবুর কদিনের অবস্থার বর্ণনাটা এঁকে দিয়ে দাও একটু—বলে চায়ের পাত্রে চুমুক দেয়। রামপদ জল ও তোয়ালে দিয়ে চলে যায় দেখে, রবীন্ বলে—দুজনার মতন রান্না কর্‌তে বলে দাও ঠাকুরকে।

—আচ্ছা, সে আর আমায় বল্‌তে হবে না, আমি বলেই দিয়েছি দাদাবাবু। বলে একমুখ হেসে চলে যায় রামপদ।

বিজন হাত মুখ ধুয়ে এসে বসে রবীনের ক্যাম্পখাটে, চায়ের প্রলোভন ছাড়্‌তে পারে না। কাজেই তার যথারীতি সদ্‌ব্যবহার করে। রান্নার কথাটা ওর কাণে গেছে তাই, নানা আপত্তি দিয়ে জানায়—পরের ট্রেনেই আমায় ফিরতে হবে, নাইট-ডিউটি আছে।

রবীন্‌ খালি পেয়ালাটা-নামিয়ে রাখ্‌তে রাখ্‌তে বলে—রেখে দাও তোমার নাইট-ডিউটি। এসেছ যখন কষ্ট করে-আমায় বক্‌তে, আর পদ্মার-কূলে, দেখে যাও পদ্মার সৌন্দর্য্য, শ্রী—উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে রবীনের মন। চল একটু বেড়িয়ে আসি।

রবীনের এতটা সাগ্রহ ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের উত্তরে বিজন আর জোরাল প্রতিবাদ করতে পারে না, শুধু মৃদু ভাবে বলে—কাল ভোরেই কিন্তু আমাকে ফিরতে হবে। আজ অবিশ্যি একজনের ওপর দায়িত্ব দিয়ে এসেছি, কি জানি ট্রেণের ব্যাপার—ঠিক সময়ে ফিরতে পারি-না পারি,—আমার ও সময় খুব কম —

রবীন্‌ উঠে জামা পরতে-পরতে বলে—কালকের ভাবনা কাল ভেবো, এখন ওঠ—আমার রামপদর হাতের এক কাপ্‌ চা খেয়ে ভোরেই যেও,—চমৎকার-চা তৈরী-করতে আজ কাল ও এখানে এসে শিখেছে, খেলে-তো ? বিজন ছোট্ট একটা ঘাড়-নাড়া দেয়। অর্থাৎ ভালো। পথে বেরিয়ে রবীন্‌ বলে—একটা বেলা কাল থাকতে-পার,—দিনের বেলা না হলে পুলটা দেখার সুবিধে হবে না,—এত চমৎকার পুল, একটা দেখ্‌বার জিনিষ—

—দেখেই-যেও না হয়।

—আবার এলেই হবে—উদাস কণ্ঠে বিজন বলে। তুমি তো পুল শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আছ এখানে, তবে আর কি—।

—আছি বটে, কিন্তু আমার-তো ঘুরে বেড়ানোর—চাকরী, দামুক-দিয়ায় কখনো, ঈশ্বরদিতে কখনো, কোথায় কখন থাকি ঠিক নেই।

দূরে কুলীদের বস্তীতে সারি-সারি আলো দেখা যায়। অদূরে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কোয়ার্টার-গুলো জনহীন। বাড়ীগুলোয় আলো জ্বালা নেই, ভূতের মত, অন্ধকারে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে।

রবীন্‌রা পদ্মার তীরে তীরে অনেকটা দূর পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আসে। গ্রীষ্মের শেষ, আষাঢ়ের সুরু সবে মাত্র, পদ্মার নির্মল হাওয়ায় গরম বোধ হয় না ও অঞ্চলে। ফাঁকা জায়গা, পদ্মার তীরে ঠিক নয়—তবু খুব এমন দূর ও নয় পোয়া দেড়েক পথ। ওরা বেড়িয়ে অনেকটা রাত্রে বাড়ী ফেরে যখন, তখন কুলীদের কোয়ার্টার গুলোর প্রায় বেশীর ভাগ অন্ধকার হয়ে গেছে।

রবীনের বাসার অনতিদূরে দু'একজন কণ্ট্রাক্টরও ইঞ্জিনিয়ার-যারা আছেন, কেবল তাঁদেরই বাসায় দেখা যাচ্ছে আলো। বাসার ফিরে দেখে, নীরেনবাবু ও গিরীন্ বাবু-লণ্ঠন হাতে বসে।

বিস্মিত রবীন্ প্রশ্ন করে—এত রাত্রে যে, খবর কি? গিরীন্‌বাবু বলেন—দামুকদিয়া হতে কাল পোলা-পানেদের নিয়া আস্‌লাম, অসুখ বিসুখ একটু কম্‌ছে কইর‍্যা—বাধা দিয়ে রবীন্ বলে—তা এত রাত্রে আসতে দেখেই বুঝেছি যে, নিশ্চয় বেড়াতে আসেন নি। জামা খুল্‌তে খুল্‌তে আর খোলা হয় না। বলে, যেতে হবে নাকি? চেয়ারটায় বসে পড়ে ক্লান্ত ভাবে।—বললাম এখন আস্‌বেন না, তা দুটো দিনও

সবুর সইল না ! ভারী ব্যস্ত বাগীশ আপনি, কার অসুখ বলুন ? কি অসুখ বলুন ?

গিরীন্‌বাবু আমতা আম্‌তা করে বলেন—আজ্ঞে কোলের পোলাটার আজ হঠাৎ পেট ছাড়ছে, প্রায় আট-দশবার দাস্ত করছে। তাই একবার দেখ্‌বার লগে—রবীন্‌ উঠে ব্যাগটা নিতে নিতে বলে, তা আগেই বোঝা উচিৎ ছিল, এত বিষাক্ত করে তুলেছে, অত রোগের গ্যাস্‌ এদেশের আবহাওয়া বদ্‌লাতেই এখন সময় নেবে, যতক্ষণ না বর্ষাটা ভালভাবে পড়ে। বিজনকে দেখিয়ে বলে—ইনি ও একজন ডাক্তার, আমার বন্ধু ইনি—একটু আগেই এসেছেন কল্‌কাতা থেকে। বলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। গিরীন্‌বাবু বিজনের দিকে ফিরে নমস্কার করেন, দেখা দেখি নীরেন বাবুকেও নমস্কার করতে দেখা যায়—আলাপ করার সময় হল না, কাল তখন—বাধা দিয়ে বিজন প্রতি নমস্কার করে বলে, এখন কি আলাপ করবার সময়, বাড়ীতে অসুখ—। লণ্ঠন হাতে নীরেন বাবু আগে আগে এবং পেছনে এঁরা বেরিয়ে যান। যাবার সময় রবীন্‌ বলে যায়, আস্‌ছি এখুনি, তুমি একটা কিছু পড় বসে বসে।

রাত্রে রবীনের আজও শোওয়া হয় না। ফিরে এসে দুটো ঝোল ভাত খেতে না খেতেই আসেন গিরীন্‌বাবু।—ডাক্তারবাবু ! বড় সুবিধে তো নয়, এক ঘণ্টার মধ্যে যে বার পাঁচেক—বিরক্ত হয়ে ওঠে রবীন্‌।—বলে এলাম তো, এখন বাড়বার মুখ এসময় কম্‌বে না, যে ওষুধের ইঞ্জেকসন্‌ দিয়েছি, এর পর ভয় না থাকাই সম্ভব—অত ব্যস্ত হলে কি চলে ? রাত্রি দুটো নাগাদ খবর দেবেন। বলে গিরীন্‌বাবুকে বিদায় দিয়ে বিজনকে বলে—দেখ এই দুর্ভোগ রোজ ভোগ করতে হচ্ছে আমায়।

এতবার নিষেধ করার পরও দুদিন পরে আনতে পারলে না, পোলা পানের লগে পরাণ ছাইড়া যাচ্ছিল—এখন ম্যাও ধর—নাও শুয়ে পড় বিজন, তুমি কেন কষ্ট পাও! অবশ্য এখানেও খুব সম্ভব আজ তোমার নাইট্ ডিউটিই হবে ভাবনা নেই—বলে মৃদু হাসির সঙ্গে ওর দিকে তাকায়। বিজনও অল্প একটু হেসেই উত্তর দেয়।

(৮)

বাবা! ছোট্ ঠাকুরঝির চিঠি এসেছে, ওর অসুখ হয়েছিল, এখন ভাল আছে। বলে বড়বৌ লতিকা একখানা পোষ্টকার্ড শ্বশুরের হাতে দিয়ে চলে যায়।—সন্ধ্যেবেলা পাঁচ পয়সার বাতাসা আনিয়ে দিও মনে করে, হরিরলুট দিয়ে দোব। বলে দীনেশবাবু চশমা চোখে লাগিয়ে চিঠি পড়েন, তারপর সেখানা কাছের ডেস্কে ফেলে রাখেন।

দাদামণি! আমরা সবাই আজ সাঁতার শিখে এলাম, জান! বলতে বলতে দশ-এগার বছরের একটি ছেলে এসে দাঁড়ায় ভিজে কাপড়ে উঠোনে—বেশ করেছ, এখন যাও কাপড় ছাড়, মাথা মোছগে, জল পড়ছে টপ্ টপ্ করে—যাই দাদামণি, মা আবার বকবে দেখলে, তাই—বলে বালক কাপড় নিংড়ে মাথা মুছে নেয় দাঁড়িয়ে।

—আজ ইস্কুল যাওনি কেন? জিজ্ঞাসা করেন দীনেশবাবু। বালক যেতে যেতে বলে—আজ যে হরতাল, ইস্কুল বন্ধ, তা' বুঝি জান না তুমি?

বৃদ্ধ হার স্বীকার করেন নাতির কাছে।—তাই নাকি? তা

ভাল—যাও তো দাদু, এককড়িকে খুঁজে বের করতো; বেটা কতক্ষণ যে তামাক দেয়নি—

—আমি দিচ্ছি দাদামনি,—তুমি টিকে দাও—বলে নিজেই দালানে কাঠের ছোট্ট বাক্সে যাতে টিকে থাকে, তার থেকে নিয়ে দৌড়ে যায় রান্নাঘরে—মা! ও মা! টিকে খানা শীগ্‌গীর ধরিয়ে দাও না, দাদামণি তামাক খাবে—রান্নাঘরের ভেতর থেকে দাব্‌ড়ি দেয় নমিতা।—দাঁড়াও আজ তোমার হচ্ছে! দুষ্টু ছেলে কোথাকার—মনে করেছ দাদামণির টিকে ধরাতে এলে কেউ বক্‌বে না, নয়! বল্‌তে বল্‌তে বাইরে আসে নমিতা। কাকীমার গলার আওয়াজ পেয়ে টুন্‌কু পগার পার ততক্ষণ। নমিতার বকুনী মাঠে মারা যায়, দেখে চৌকাঠের ওপর—পড়ে আছে টিকে। দুপুরে খেতে বসে দীনেশবাবু শুধোন্—এ শনিবার বিনোদ আস্‌বে তো মেজবৌমা?

নমিতা উত্তরে জানায়—আস্‌বার কথা আছে।—আজ কি বার?

—বেস্পতিবার বাবা। শ্বশুরের প্রশ্নের উত্তরে বধু বলে।

—তা হলে কি আর চিঠি পাবে? নইলে রমাকে দেখে আস্‌বার কথা লিখ্‌তাম। অসুখ হয়েছিল, শুনে মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল। একটু চুপ করে থাকেন, তারপর চিন্তিত মুখে বলেন—এদ্দিন বিয়ে হয়েছে—একবার ও পাঠালে না ওরা, মেয়েটাকে! কখনো আমায় ছেড়ে একটা দিন থাকেনি—কে জানে বাছার আমার কত মন কেমন করছে!—ভাত—তরকারী যেখানকার যা-সবই যে পড়ে রইল বাবা! দুধ খাচ্ছেন—

দুধের বাটি নামিয়ে রাখ্‌তে রাখ্‌তে রাখ্‌তে দীনেশ বাবু বলেন—কি জানি বৌমা, মুখে আজ আর কিছুই রুচ্‌ছে না যেন, এত চেষ্টা

করলাম—মা-মরা মেয়ে, কোথায় যে গিয়ে পড়েছে তার ঠিক নেই—কতদূরে—কপাল গুণে এমন ঘরে গেছে মা আমার, যে তারা একদণ্ড ওকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে না! বৃদ্ধ পিতার বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস পড়ে সজোরে।

শ্বশুরের হৃদয় বেদনায় ব্যথিত হয়ে নমিতা বলে, তাই বলে আর দুটি ভাত না খেলে চল্‌বে না বাবা, একবারে কিছুই খান্‌নি—এমন করে না খেয়ে উঠ্‌লে হবে না। আজ খুব ভাল মাছ ছিল, তাই তার ফ্রাই আর চপ্‌ করেছি, একটুও খান্‌নি বাবা—ও দুটোই পড়ে আছে পাতে! বলে নমিতা মৃদু অনুযোগ করে।

লতিকা এই সময় এসে বসে শ্বশুরের খাওয়ার কাছে। নমিতা বড় জাকে বলে—দেখুন না দিদি, বাবা কিচ্ছু না খেয়ে উঠে যাচ্ছেন!

বড়বৌ বলে—দুধের বাটী নামান, সত্যি একি—বলুন তো?

দীনেশবাবু বলেন—খাচ্ছি মা, খাচ্ছি। বলে মাছের ফ্রাই আর চপ্‌ একটু একটু ভেঙে মুখে দেন।

নমিতা বলে—ও কি হল বাবা! ওর নাম কি খাওয়া? নাঃ, এবার থেকে ছোট ছেলের মতন ধরে খাইয়ে না দিলে আর হবে না দেখ্‌ছি! রাত দিন যদি কারুর না কারুর জন্যে ভাবেন, আর রোজ এমনি করে যদি না খেয়ে ওঠেন—বাধা দিয়ে দীনেশ বাবু বলেন—এই যে মা খাচ্ছি—এই দেখ ও দুটোই তোমার প্রায় খেয়ে নিলুম, চপ্‌ আর কি বলে এটা? বলে হাতের ফ্রাইটুকু তুলে পুত্র বধুর দিকে তাকালেন। নমিতা বলে ফ্রাই ওটা।

ভয়ে ভয়ে এবার দুধের বাটী তুলে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করেন—এবার দুধ খেতে পারি?

নমিতা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। তারপর একটু মৃদু হাসে। বাবার বুঝি বকুনী দেখে ভয় করছে আমায়! পরক্ষণেই সহজ কণ্ঠে বলে—না বকে যে পারিনে, কি করি—এমন করলে শরীর টিকবে কি করে! কাল রাত্তিরেও অমনি করে খেলেন না। রোজ রোজ উপোস করলে আমরা—

মুখের কথা ওর শেষ হতে পায় না। দীনেশ বাবু দুধের বাটী মুখ থেকে নামিয়ে রেখে বলেন—চমৎকার হয়েছে মেজবৌমা, তোমার এই সব চপ্‌ টপ্‌, দেখ, সব খেয়েছি—বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন বেদনায়। ঠিক এই রকম ক'রে, করে দিও তো, ওরা যখন আসবে রমা আর রবীন্—

দীনেশবাবুর চোখের কোনে জল দেখা দেয়।

নমিতা সাগ্রহে বলে—নিশ্চয় করে দোব বাবা, ওরা আসুক—ঠাকুরঝিও অনেক রকম রাঁধতে শিখেছে লিখেছে। ওর ননদের কাছে পড়ছে, তারপর আরো অনেক কথা আমাদের লিখেছে।

বড়বৌ এতক্ষণ চুপ করেই বসেছিল, এবার কথা কয়। জায়ের কথায় সায় দিয়ে বলে—বোধহয় দেড় পাতা শুধু শ্বশুর শাশুড়ীর সুখ্যাত করে, তাদের ভালবাসা আর আদরের কথা লিখেছে, নয় নমিতা? সেখানে সে ভালই আছে বাবা—

নমিতা ছোট্ট একটা হামানদিস্তায় শ্বশুরের জন্যে পান ছেঁচতে ছেঁচতে বলে ওঠে—সে কত সুখে আছে বাবা, আপনি সেটা কেন একবারও ভাবেন না। রেডিও শুনছে, গ্রামোফোন বাজাচ্ছে। লিখেছে—আমি এখন ঘড়িতে দম্ দিতে, থার্মোমিটার দেখতে, রেকর্ড দিতে শিখেছি। ছেঁচা পানটুকু তুলে একখানা ছোট্ট ডিসে ডেলা করে রাখতে,

বলে—আমার মনে হয়, নানারকম শিক্ষা দেওয়ার জন্তেই ওরা হয়ত এখন পাঠাচ্ছে না বাবা—

খাওয়া অনেকক্ষণ শেষ হয়েছিল, পুত্রবধুর সঙ্গে প্রবাসিনী কন্যার সুখ-সম্ভোগের কথা শুনতে তিনি ব্যগ্র হয়ে সেই আলোচনায় যোগ দিয়ে মনোবেদনার কথঞ্চিত প্রশমনের চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু স্নেহময় পিতৃহৃদয় তাতে সায় দেয় না এবং নিশ্চিন্তও হয় না! খড়ম জোড়া পায়ে দিতে দিতে বলেন—সবই হয়ত সত্যি বৌমা, বেয়াই সেদিন যে চিঠিটা লিখেছেন, তাতে শুধু রমার সুখ্যাত ছাড়া গোটা চিঠিখানায় আর কিছু নেই। কিন্তু তবু কি আমার মন মান্‌ছে, সে সুখে আছে ভেবে।

শ্বশুরের হাতে জল ও খড়্‌কে দেয় নমিতা। তাঁর আচমন শেষ হলে ছেঁচা পানের পাত্রটি এনে ধরে তাঁর সামনে। বৃদ্ধ পানটুকু মুখে দিয়ে বাইরের বাড়ী যাবার জন্য ধীরে ধীরে সিঁড়ি কটা নামেন এবং কতকটা আপন মনেই বল্‌তে বল্‌তে যান—মা আমার চিরদিন শ্বশুর ঘরই করুক—কিন্তু তবু বিয়ের পর বাপের ও তো একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে করে—

দীনেশবাবু চোখের আড়ালে অদৃশ্য হলে দু'জনে ওরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। নমিতা আক্ষেপ করে বলে—সত্যি দিদি, এর ভেতর কি একটা রহস্য যে, তার কিছু বোঝাও যায় না। না পাঠাবার কারণ কি?

লতিকা পল্লীগ্রামের বুদ্ধি ও বিদ্যাহীনা মেয়ে, এবং কুটিল গতিশীল, বিচিত্রতার লীলাভুমি পৃথিবীর বিবিধতর বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয় হীনা। কাজেই জ্ঞান তার সসীম হওয়াই স্বাভাবিক। পরম ঔদাসিন্যের সঙ্গে

বলে, সে কি করে জান্‌ব বল? তোমরা বরং বুঝতে পার্‌বে, আমার ও সব মাথায় আসে না ভাই,—যা বলব।

নমিতা অল্প হেসে বলে—আমিই বা কি করে বুঝব দিদি? আলোচনা ঐখানেই চাপা পড়ে যায়।

(৯)

—আচ্ছা বৌদি, একি কাণ্ড বলত তোমার? নাঃ, তোমার সঙ্গে আর পার্‌লুম না—বলে তড়িতা প্রস্থানোদ্যতা রমলার হাত ধরে জোর করে পাশের চেয়ারে বসায়।

রমলার ওষ্ঠে মৃদু হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। সেটুকু পরক্ষণেই মিলিয়ে যায় এবং দুঃখে বলে—আমার যে একটুও ভালো লাগে না ঠাকুরঝি, এই কথা কবে তুমি বুঝবে? বলে বেদনাতুর চোখে চায় তড়িতার পানে।

তড়িতার চোখ ও সজল হয়ে আসে এই তরুণীর দুঃখে, সমবেদনায়। কিন্তু মুহূর্তে চোখ নামিয়ে নিয়ে মনের ভাব গোপন করে বলে—ভাল না লাগুক্, তবু তোমায় পড়্‌তে হবে বৌদি। এখন আমি তোমার মাষ্টারমশাই,—বলে জোর করে হাস্‌বার চেষ্টা করে বলে—এখন আমার সেই ভাবেই খাতির কর্‌তে হবে। যখন এই পড়ার ঘরটা বা টেবিলটা ছেড়ে উঠব, তখন তোমার সব কথা, আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ, অনুজ্ঞা সব কিছু শুন্‌তে বাধ্য থাক্‌ব, তখন তোমার ছোট ননদ, তুমি বৌদি, বুঝলে? এখন তুমি ছাত্রী, আমি মাষ্টার।

—না আমি ও সব কিছু বুঝি না—তোমার একজামিন্‌ আসছে,

তুমি পড় বরং কাজ হবে, আমায় ছেড়ে দাও—কেন মিছে সময় নষ্ট করছ, নিজের। যা হবে না তাই নিয়ে!

বাইরে থেকে ডাক পড়ে—বৌমা! রমলা যেন শ্বাশুড়ীর ডাকে বেঁচে যায়। তড়িতার দিকে চেয়েই অনুচ্চ কণ্ঠে উত্তর দেয়—যাই মা। এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালায়। তড়িতা উন্মনা হয়ে খানিকক্ষন কি ভাবে, তারপর পড়ায় মন দেয়।

মন কিন্তু বসে না পড়ায়। রবীনের পাকৃশী যাওয়ার দিনটার কথাই ওর মনে বার বার উদয় হয়। যাবার সময় ও বেচারীর সঙ্গে একবার দেখা করেনি—কি যে বিশ্রী ব্যাপার—অথচ ওদের দাম্পত্য গরমিল না হয়ে যদি অন্য কোন ব্যাপার হ'ত—আর কোন সম্বন্ধ সূত্রে ধরে—তবে সে-ই হয়ত মধ্যস্থ হয়ে দিত মীমাংসা করে! বৌদি তো অসুখের অছিলায় শুয়েই কাটিয়ে দিলে দু'দিন—না দিয়েই বা করত কি! মনে মনে রমলার বুদ্ধির আর একবার প্রশংসা করে ও। দাদা যখন গাড়ীতে উঠছে বৌদির সেই লুকিয়ে দেখা জানালার ফাঁক দিয়ে—বাড়ীর আর কারও চোখে না পড়লেও তার চোখ এড়ায় নি। দাদাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবার কিছুক্ষণ পরে দেখা যায়, বৌদিকে বিছানা ছেড়ে উঠতে।

রমলার পড়তে ভালো না লাগার কথায় অনেক কথা তড়িতার মনে উঁকি দিয়ে ফেরে। নাঃ, এমন জোর করে কোন দিন সে রমলাকে পড়তে বল্‌বে না। সত্যিই তো, স্ত্রী যদি লেখা-পড়া-না-ই-জানে, তার জন্তেই কি স্বামীর দিক থেকে ভালবাসা পাওয়া আট্‌কে যাবে? যদি তাই যায়, তবে যাক্। স্বল্পভাষিণী রমলার মুখ থেকে সেদিন যে যুক্তি সে শুনেছে, তারপরও এতটা জোর না করাই উচিত ছিল, হয়ত সে নিজে এমন একটা দৃঢ় সংকল্প-ই মনে মনে করে রেখেছে, যার

জোরে সে তার স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। রণেন দরজার কাছ থেকে ডাক্ দেয়—তড়িত! ঘরে যেতে পারি?

অন্যমনস্কা তড়িতা চম্‌কে ওঠে প্রথমে, তারপর বলে—নিশ্চয় পার আস্‌তে—তোমার আজ আবার এতটা ভব্যতা বোধ কোত্থেকে এল?

রণেন ততক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছে টেবিলের অন্য ধারে।—বৌদি প্রায় এসময় থাকেন কিনা, তাই একটু সংকোচ হয়, কেন না তাড়া-তাড়ি উঠে পালাবার জন্যে ব্যস্ত হন্ এমন ভাবে—

তড়িতা বাধা দেয়—আজ থেকে আর তিনি এ সময় থাকবেন না, সুতরাং তুমি অনায়াসে অসংকোচে আস্‌তে পার্‌বে রণেনদা।

রণেন একখানা চেয়ারে দেহভার রক্ষা করে বিস্মিত দৃষ্টি মেনে চায় তড়িতার দিকে। তার মানে? তোর কথাই যে বুঝলুম না রে? তড়িতা একটু ক্ষীণ হাসি হেসে বলে—তিনি আমার স্কুল থেকে আজ নাম কাটিয়ে দিয়েছেন, আর পড়্‌তে আস্‌বেন না!

সবিস্ময়ে রণেন প্রশ্ন করে- তার মানে?

তড়িতা খুব সহজভাবে উত্তর দেয়—মানে তার ভাল লাগে না পড়্‌তে। একটু পরে ওর স্বাভাবিক সুরে গম্ভীর ভাবেই বলে—ওর কথা-ই এতক্ষণ ভাব্‌ছিলুম রণেন দা! আজ আর আমারও পড়া ডকে উঠ্‌ল; কিছুতেই মন বস্‌ছে না—

কিন্তু তোমার তো ভাই পড়তেই হবে এত কাছে একজামিন্—বাধা দিয়ে রণেন বলে।

—আজ আর কেন কি জানি কোন মতেই হচ্চে না, বৌদির কথাই কেবল ভাবছি—সত্যি দাদার কি ভয়ানক অন্যায় রণেনদা, এ একেবারে ক্ষমার অযোগ্য। উঃ! সত্যি তুমিই বল, মেয়েদের জীবন কি সমস্যা

পূর্ণ! বিয়ে জিনিষটার ওপর আমার যেন কি একরকম বিতৃষ্ণা এসে গেছে এদের দেখে—

রণেন একটু হাসে। সবার-ই কি আর এই রকম হয় তড়িত, তা নয়, ও হ'ল লটারি—যার ভাগ্যে যা ওঠে।

তড়িতা অসহিষ্ণু হয়ে বলে—তুমি তো ছোট্ট একটি ভাষা প্রয়োগ করে সেরে দিলে রণেনদা, লটারি বলে। কিন্তু এই যদি তোমাদের লটারি হয়, তবে এযে সাংঘাতিক লটারি—যার মধ্যে রয়েছে একজন মানুষের জীবন মরণ ব্যাপার, সেটাকে এত তুচ্ছ করে দেখা কি কোন মানুষের এবং কোন সমাজের উচিৎ? বলে রণেনের মুখের ওপর সতেজ দৃষ্টি মেলে চায়।

রণেন ওর কথার ও চাহনির অর্থ বুঝে একটু হেসে বলে—তড়িত, তোর যুক্তির দাম আছে সত্যি এবং আমি তা' মানি ও। কিন্তু বোন, সারা বাংলাদেশ তো আমাদের দুজনের যুক্তিকে মেনে নিয়ে সুশীল বালকের মত আমাদের পথে বা মতে চল্‌বে না! বরং তাদেরই মতে চিরদিন তোর আমার মত মতাবলম্বীকেই তারা তাদের মুঠোয় পুরে রেখেছে এবং তাদের মতে পথে চালাচ্ছে। একটু চুপ করে থেকে পুনরায় বলে—তোর মত এমন অনেক মেয়েই এর আগেও এসেছিলেন, এখনও খুঁজলে বাংলার বহু ঘরে যেমন বৌদির মত অবস্থার মেয়েও অনেক মিল্‌বে, এর আগেও মিলেছে, হয়ত এর পরেও মিল্‌বে—যদি না বর্তমান সমাজ নীতি বদলানো হয়। আবার তোমার 'মতাবলম্বী মেয়েও এর আগেও বাংলায় অনেক দেখা গেছে আজও দেখা যাচ্ছে, হয়ত এর পরেও দেখা যাবে, কেন না অন্যায়ের স্রোত যতদিন যে দেশ ও সমাজে প্রবল ভাবে প্রবাহিত হয়, ততদিনই

ঠিক তার প্রতিকূল শক্তির ও উদ্ভব হয়ে থাকে, এ তুমিও জান তড়িত। সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের ও ইতিহাস, সাহিত্যের মধ্যে দিয়েও দেখা যায়, তাদের দেশের, জাতীয় জীবন যাত্রার ধারা, সমাজ এবং রাস্ট্রের চেহারা। আজ রাশিয়ার দিকে চেয়ে দেখ,—দেখবে এ সাম্যের যুগে খুব বেশী বিরুদ্ধ শক্তিশালী নর-নারী নেই, সবাই প্রায় একমত এবং বেশীর ভাগ লোকই শান্তিপ্রিয়, কিন্তু এমন একদিন গেছে বল্‌শেভিজমের দিন, যে দিন ও দেশে লেনিন, ষ্ট্যালিনের মত বিরুদ্ধ শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, হয়ত আবার একদিন ঐ রকম লোকের অভ্যুদয়ের প্রয়োজন হবে ঐ দেশেই। যখন আবার হবে অন্যায়ের স্তূপ. অসত্যের প্রচণ্ড প্রতাপ। এখন বহু ঝড়ের পর শান্ত অবস্থা চল্‌বে কিছুদিন।

—রণেনদা, এই কি পৃথিবীর চিরন্তন নিয়ম? সব দেশের সব কালেই চলে আস্‌ছে? বিস্ময়ের সুরে তড়িতা প্রশ্ন করে রণেনকে।

রণেন তার উত্তরে বলে—বোধ হয় তাই বোন্; তা না হলে প্রত্যেক যুগের সাহিত্য, ইতিহাস মানুষের সমাজ, রাষ্ট্রের জীবন ধারা এ ভাবে বহন করে আন্‌ত না তড়িত। সব দেশেরই সাক্ষ্য হয়ে আছে সকল কাল জয় করে ঐ গুলি তড়িতা। তাই তোমার মত তেজস্বিণীর ও উদ্ভব যেমন সম্ভব, অন্যায়ের প্রতিকূলে দাঁড়াবার জন্যে উদার মনোবৃত্তি নিয়ে, তেমনি বৌদির মত নীরবে সমস্ত দুঃখকে হজম করার মত সহিষ্ণুতা শক্তিশালিণী নারীর আবির্ভাব ও প্রত্যেক যুগেই স্বাভাবিক।

ভ্রুযুগল কুঁচকে যায় তড়িতার।—তোমার বক্তৃতার মতন কিন্তু অত সহজ নয় রণেনদা, দুঃখ সহ্য করে একটা গোটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া!

খুব সহজ কণ্ঠে রণেন বলে—কিন্তু এর বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতাও

তোর আমার হাতে নেই বোন্—যদি তা থাকৃত—তাহলে তুমিই একা পারৃতে তার প্রতিকার করৃতে, এ আমার ধ্রুব বিশ্বাস। কেন না আমি যদিও বাইরের জীব এবং বাড়ীতে খুব কম সময়ই থাকি, তা ছাড়া বৌদির ও তোমার সঙ্গে একত্রে চলা-ফেরা ও আমার তত নেই। কিন্তু তবু আমি জানি তড়িত, যার দুঃখ সত্যিকার এবং ব্যক্তিগত ও নিজস্ব বলৃতে পারা যায় তার চেয়ে আমার মনে হয় তুমি বেশী ভাব তাঁর দুঃখ প্রতিকার করার উপায়। একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে পুনশ্চ বলে—হয়ত তিনি তোমার মতন এতটা এবং এতখানিই বড় করে কোনদিন ভাবেন নি, বা ভবিষ্যতেও ভাবতে পারৃবেন না।

সুগভীর শ্রদ্ধায় উদ্ভাসিত মুখে প্রদীপ্ত চোখে চায় তড়িতা রণেনের মুখের দিকে।—সত্যি রণেনদা, তুমি আমায় এতটা বিশ্বাস কর? সত্যি তুমি এতটা তলিয়ে দেখ? কিন্তু আমি আজ সব প্রথম তোমার দৃষ্টি শক্তির এতটা প্রসারের খবর জানৃতে পারৃলাম। এর আগে জীবনে কোন দিন তোমায় এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলৃতে, এতটা সময় একাসনে বসৃতে, এমন গভীর ভাবে কোন বড় বা ছোট বিষয় নিয়ে আলোচনা করৃতেও কারুর সঙ্গে দেখিনি। তুমি যে এতখানি জ্ঞানের ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী তাও অজানা ছিল, আজ সত্যি তোমার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস যেন এই মুহূর্ত্তে অনেকখানিই বেড়ে উঠল রণেনদা! তড়িতা রণেনের মুখের ওপর বিস্ময়পূর্ণ সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

রণেন একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে—তুই আজ হাসালি তড়িত! আমি আর কতটুকু বুঝি বল্! বরং মনে হয়—তুই অনেক বেশী বুঝিস্ আমার চেয়েও। আজ তোর পড়ায় মন নেই যখন,

তখন আর বই খুলে বসে লাভ নেই, তার চেয়ে উঠে পড়—ঘড়ির দিকে চায় একবার, তারপর উঠে দাঁড়ায়। মামার আস্‌বার সময় হল বলে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। তড়িতাও সাম্‌নের বইগুলো বন্ধ করে যথাস্থানে থাক্ দিয়ে সাজিয়ে রেখে যায় বৌদির সন্ধানে।

(১০)

রাত্রে সেদিন রতনবাবু খেতে বসেছেন, রান্না করেছে রমলা আর তড়িতা। দু'জনে মিলে তাই বসেছে ওঁর খাওয়ার কাছে। রমলার হাতের কাছে কতকগুলো ছোট বড় পাত্রে খাবার, দরকার হলে দেবে বলে নিয়ে বসেছে।

আজ কাল প্রায়ই ওরা ছ'টার ট্রিপে সিনেমা দেখতে পাঠায়, ছুটি দিয়ে বামুনঠাকুরকে—নিজেরা রাঁধবে বলে।

রতনবাবু আলুর-দম আর মটরশুঁটির কচুরীর আস্বাদ গ্রহণ করেন দু'একবার, তারপর মুখ তুলে সাম্‌নের রন্ধনকারিণীদের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলেন—আজ কাল তোমরা এত ঘন ঘন রান্না কর্‌ছ তড়িত, এর পর যে আর বামুনের হাতের রান্না রুচবে না, তখন খুব মুস্কিল হবে—কোনটি কার রান্না শুনি? বলে এবার প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে পুত্রবধুর দিকে চাইলেন।

রমলা লজ্জায় মাথা নীচু করল।

তড়িতা দিল জবাব। আজ সবই প্রায় বৌদির রান্না বাবা! আমি মাত্র উপস্থিত ছিলুম। এই সময় তড়িতার মা এসে পড়েন। মুখে পান দোক্তা ঠাসা, হাতে একখানা পাখা। কর্ত্তার ডানদিকে একটু দূরে বসেন।

—জান, আজ সব রান্না তোমার মেয়ে আর বউয়ের হাতের—বলে পাখা চালনা করেন কর্ত্তার থালার কাছে।

রতনবাবু ঘাড় ফিরিয়ে গিন্নীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই পরক্ষণে তড়িতার দিকে চেয়ে উত্তর দেন।—জানি, কিন্তু তড়িত, তোমার এখন সাম্‌নে এক্‌জামিন্, এ সময় গেরস্থালীর কাজে সময় নষ্ট করনা। রমলার দিকে চেয়ে বলেন—আর, তোমাকে ও বল্‌ছি বউমা, আগুনতাত্ রোজই সইবে না মা—কথার মাঝখানেই রতনবাবু হঠাৎ থেমে যান্। দৃষ্টি আট্‌কে যায় রমলার পরনে পাড় ওঠা কাপড়ের দিকে চেয়ে। অনেকক্ষণ ধরে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে তারপর ফিরে আসে তড়িতার মুখের দিকে। একটু কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—বিশ্রী, পাড় ওঠা কাপড় ক'দিন ধরে বউমার পরণে কেন তড়িত? বলেই ঘাড় ফিরিয়ে গিন্নীর দিকে চান্। বউমার কি কাপড় নেই?

গিন্নী হঠাৎ কর্ত্তার প্রশ্নে থতমত খেয়ে যান্, তড়িতাও কি বল্‌বে বুঝে উঠ্‌তে পারে না, বিব্রত হয়ে ওঠে। নিরাভরণা মলিন বেশা রমলাও আজ শ্বশুরের দৃষ্টির সাম্‌নে বসে থাক্‌তে পারে না, লজ্জায় উঠে যায়। অপরাধিনীর মতই ধীর পায়ে রমলাকে চলে যেতে দেখা যায়।

দু'জনাকেই নিরুত্তর দেখে রতনবাবু মনে করেন, সত্যিই হয়ত কাপড় নেই। উচ্চকণ্ঠে রণেনকে দেন ডাক, সে এসে দাঁড়ায়।

রতনবাবু খুব রুক্ষকণ্ঠেই আদেশ দেন—সরকারকে বলে দাও রণেন, কাল সকালেই যেন পাঁচ জোড়া উৎকৃষ্ট শাড়ী বউমার জন্যে এনে দেয় আগে। রণেন আদেশ পালন করতে চলে যায়। গিন্নীকে এক প্রচণ্ড ধমক্ দিয়ে বলেন—তুমি একেবারে কিছুই জান না,

পরের মেয়েকে ঘরে এনে কি করে আপন করে নিতে হয়, তাও এখনো শেখনি! বলে তীব্র দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ান। তারপর সক্ষোভে বলেন—তোমার-ই বা কি দোষ দেব! আমাদের দেশের কোন শাশুড়ীই জানে না—তাই বাংলার ঘরে ঘরে আজ এত—বল্‌তে বল্‌তে চলে যান্।

বাড়ীতে একটা হৈচৈ সেদিন খুব হতে দেখা যায়। রতন বাবুর রাগ বড় একটা হয় না, কিন্তু হলে সে তেমনি ভয়ঙ্করই হয়। নিজের শয়ন কক্ষে গিয়েও গিন্নীকে পুনরায় ডেকে পাঠান—বেচারী ভয়ে ভয়ে গিয়ে দাঁড়ান।

—কি হয়েছে আজ তোমার বলত? বলে দরজার কাছ থেকে উঁকি দেন। ঘরের ভেতর প্রবেশ করবার সাহস হয় না আজ ও তাঁর, কর্ত্তার রাগ হলে তিনি চিরদিনই দূরে সরে থাকেন।

রতনবাবু হাত দু'খানায় নিজের বেশ একটু ঝাঁকানি দিয়ে বলেন—হবে আর কি! বৌমার জামা কাপড়ের খোঁজও কি এবার থেকে আমাকেই রাখতে হবে? তাই জিজ্ঞাসা করার জন্যেই তোমায় ডেকেছি। বলে গিন্নীর মুখের ওপর বিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। বেচারী গিন্নী আকাশ থেকে পড়েন, কিন্তু মুখে কথা আসে না। তাঁকে নিরুত্তর দেখে রতনবাবু বলেন—ও-গুলো মেয়েদের কাজ, না পুরুষের কাজ—তাই শুন্‌তে চাই? তিনি বউ-মানুষ তায় ছেলে মানুষ, নতুন-বিয়ে হয়েছে, তিনি নিজে এসে তাঁর দরকারী কোন কিছু জানানো এখন সম্ভব নয়, সে সময় তাঁর হয় নি, স্বামীর কাছে মেয়েরা জানায় এবং তার কাছে পায়। কিন্তু তোমার ছেলে তো বৌয়ের সঙ্গে সম্বন্ধই রাখে না—এ অবস্থায় আমাদেরই রাখ্‌তে হবে, এও তুমি যদি

না জানো, তবে আর আমি কি করতে পারি? রবীনের ব্যবহারের কথা মনে পড়ে গেল যেন নতুন করেই এই সামান্য ব্যাপারে। তাই রাগটা ক্ষোভে, গ্লানিতে রূপান্তরিত হ'ল। কণ্ঠস্বর ও অনেকখানিই মোলায়েম হয়ে এল। একটু অনুতপ্ত হয়েই বলেন—এসব খোঁজ কি তোমার রাখা উচিৎ নয়! দেখছ তো কি কাপড় পরে বেড়াচ্ছেন, লোকে কার বউ বলবে বল? তাছাড়া নিজেদের ও একটা কর্ত্তব্য আছে। যাও, যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু আর যেন—তড়িতা এসে প্রবেশ করে গিন্নী মেয়েকে দেখে পালিয়ে বাঁচেন।

তড়িতাও আজ তাড়া খায় ওঁর কাছে। ওকে দেখে আর এক দফা রেগে ওঠেন রতনবাবু। ও কিন্তু তাতে রাগ করে না বরং একটা মস্ত সুযোগ মনে করে নেয়, রবীনের যাবার দিনের ব্যবহারের কথাটা এই ফাঁকে জানাবে বলেই প্রস্তুত হয়ে এসেছে।

তাই রতন বাবুর বকুনীর উত্তর না দিয়ে তড়িতা দেয় ওর বাবার কাছে রমলার গয়নাগুলো এক একখানা করে সাজিয়ে। বিস্মিত পিতা চমকে ওঠেন। একি, হঠাৎ বউমার গয়না—বলে তড়িতার দিকে চান্। তাঁর মুখের চোখের চেহারায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিস্ময়। তড়িতা বুঝতে পারে এবং বিস্মিত পিতাকে আরও বিস্মিত করে বলে—বাবা! তোমার বৌমার গয়নাগুলো তুলে রাখ, তিনি আর পরবেন না।

রতনবাবু অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে ওঠেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তড়িতার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

তড়িতা পিতার অবস্থা বুঝে বলে—দাদার নিষ্ঠুর ব্যবহারেই আজ বৌদি গয়না কাপড় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। ও একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে পিতার সামনে বসে। তারপর বলতে থাকে—আজ দাদার

ব্যবহারের কথা বল্‌বার দিন এসেছে তোমাকে, আর এই রকম একটা সুযোগ মনে মনে প্রার্থনাও করেছি, না হলে তোমায় জানানোর উপায় হবে না বলে বাবা। রতনবাবুর বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় ক্রমশঃ। তড়িতা বলে চলে—ওর জন্যে আজ এই শান্তির সংসারে এত অশান্তি দেখা দিয়েছে, যে আর সহ্য করা যায় না। তাই আজ এর মীমাংসা দরকার। তুমি জান না, তাই বৌদির কাপড় নেই মনে করে চেঁচামেচি করলে, কিন্তু কাপড় তার না থাক্‌লে আমি নিজে অন্য সব কিছুর মত বল্‌তুম, এ তোমার জানা উচিত ছিল বাবা। কিন্তু সে ভাল কাপড় গয়না আর পরবে না, দাদার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে দাদারই কট্‌-কাটব্যের জন্যে, সুতরাং তার বিরুদ্ধে আমাদের যাবার ক্ষমতাও নেই উচিৎ নয় ও। বৌদির নিষেধ আছে বলেই আমি গয়না রেখেছিলুম নিজের কাছে। তুমিও বৌদিকে আর অনুরোধ করনা বাবা—

বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে রতনবাবু বলেন—ওঃ! তাই। তড়িতা ক্ষোভের সঙ্গে বলে—দাদার জন্যে আমাদের অবধি বৌদির কাছে লজ্জা পেতে হয়, অপরাধী হয়ে থাক্‌তে হয় বাবা, একি কম কষ্ট! একটুক্ষণ মৌন থেকে আবার বলে—কোন কারণ নেই কিছু না, শুধু শুধু মানুষ একটা মানুষের ওপর এমন করে অবিচার করবে,—লেখা-পড়া শিখেও যে মানুষকে দুঃখ দেওয়া, মানুষ হয়ে এ বুদ্ধি যে মানুষের আসে কোত্থেকে এইটাই আমি খালি ভাবি বাবা—

রতনবাবু সজোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন। তারপর উদ্‌ভ্রান্ত কণ্ঠে বলেন—ওরে মা, এ আমার মহাপাতকের ফল রে! রবীনের দোষ নয় তড়িৎ, সে আমার জন্মান্তরের শত্রুতার পরিশোধ দিতে—ছেলে হয়ে এসেছে মা, দোষ তার নয়, আমার কৃতকর্মের ফল—রতনবাবু

খাটের বিছানা ছেড়ে নেমে আসেন তড়িতার কাছে। মা, তোর বাবা মহাপাপী মহাপাপী রে! বল্‌তে বল্‌তে তিনি ঘরময় পায়চারি করেন।

তড়িতা পিতার মর্মবেদনা বোঝে। বলে, বাবা এর ফল একদিন দাদাকে ভুগতে হবে! তুমি অত উতলা হয়ো না বাবা, তোমার কষ্ট আমি দেখ্‌তে পারি নে, বলে উঠে যায় পিতার কাছে—তাঁর হাত ধরে এনে বসায় চেয়ারে। এই জন্যেই এদ্দিন বলিনি বাবা, কিন্তু—

বাধা দেন রতন বাবু। তড়িৎ! মা আমার—এই বুকে কি ভয়ানক আঘাত দিয়েছে রবীন্, তা, যদি দেখাবার হত, খুলে তোদের দেখতাম। বলে নিজের বুকে দুই হাত ন্যস্ত করেন। জানিস্, বৌমার জন্যে আমি কি অশান্তি ভোগ করি—

তড়িত পিতার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয়, সান্ত্বনার সুরে বলে।

—আমি তা, বুঝি বাবা। একদিকে তোমার কষ্ট, অন্যদিকে বৌদির কষ্ট এ দুটোই-আমার-অসহ্য হয়েছে অথচ এর নেই প্রতিকার! তড়িতার-বুক থেকে একটা-তপ্ত-নিঃশ্বাস পড়ে এত জোরে-যে, রতনবাবু মাথাটা-ঘুরিয়ে মেয়ের মুখের দিকে চান।

তারপর স্নেহার্দ্র স্বরে ডাকেন—তড়িৎ! মা, আমার সাম্‌নে আয়, বলে ওর একখানা হাত ধরে-ঈষৎ টানেন। তড়িতা ঘুরে-এসে পিতার পায়ের কাছে বসে। চোখের জল গোপন করার জন্যে মুখ নীচু করে। রতনবাবু আক্ষেপের সুরে বলেন—একটা ছেলে, কত সাধ করে বিয়ে দিলুম, বউও রূপে-গুণে সমান হল, কিন্তু মা সুখ নেই-তার ও অদৃষ্টে, সুখ নেই আমারও অদৃষ্টে! ভাগ্যের-কি নিষ্ঠুর পরিহাস —

—বাবা! একটা মানুষের জীবন মানুষ দান কর্‌তে-পারে না, আর সেই জীবন একটা মানুষের নষ্ট করে দিচ্ছে দাদা, আর আমাদের এতগুলো লোকের চোখের ওপর-তা' নষ্ট হচ্ছে এ আর দেখা যায় না —এ অপরাধের ক্ষমা হয় না বাবা। বৌদির দোষ কি, যে দাদা ওকে কুকুর-বেড়ালের মত এতই হেয় করে? আমি যে ছোট হয়েছি, না হলে দেখাতাম ওকে। বলে তড়িতা উঠে দাঁড়ায়। তোমরা ওকে কিছু না বলে আস্কারা দিচ্ছ বাবা! এতবড় অন্যায়, পশুর মত কর্‌ছে বিবাহিতা স্ত্রীর ওপর! তবু বৌদি নীরবে হাসি মুখেই সয়ে যাচ্ছে এত দিন ধরে —

বাধাদিয়ে রতনবাবু বলেন—তুই ছেলে মানুষ তড়িৎ, তাই বুঝছিস্ না, হিন্দুর মেয়ে তিনি, না সয়েই বা করবেন কি? উপায় যদি এর-প্রাকৃত-কিছু, তবে-তা আমিই বৌমার জন্যে কর্‌তুম মা, কিন্তু হিন্দু সমাজে মেয়েদের-দিক্ এত ছোট করে দেখা হয়েছে, যে তারা যুগে যুগে আমাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েই আস্‌ছে তড়িৎ। তাই আমি তার বিরোধী বলে তোর মায়ের অমতে তোদের তিনজনকেই জড়িয়ে যাচ্ছি।

তড়িতা চলে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে যায় পিতার-উদার এবং যুক্তি-পূর্ণ কথায় আনন্দ বোধ করে এবং সেই সঙ্গে বেশ একটু গর্ব্ব বোধ করে। সঙ্গে সঙ্গে পিতার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধায়, বিশ্বাসে, কৃতজ্ঞতায় অনাবিল তৃপ্তি পায় ও সেই সঙ্গে ওর দাদার কথাও মনে হয়ে যায়—এই পিতারই সন্তান সে,—অথচ এঁর সঙ্গে তার এতটুকু কোথাও মিল নেই—একবারে—গরমিল—পিতার মুখের ওপর সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর ধীরে-ধীরে বলে—কিন্তু

বাবা, বধূ-নির্ব্বাচনের সময় কেন ভুল করলে, সে কৈফিয়ৎ অবশ্য নেবার-অধিকার আমার নেই, কিন্তু তবু-তোমার ভুল যে হয়েছে, একথা বল্‌বার-অধিকার আমার আছে এই জন্যে, যে—বাধা দিয়ে রতনবাবু অসহিষ্ণু ভাবে বলে ওঠেন—ভুল আমার হয়নি তড়িৎ, ভুল হয়েছে সেই-বদ্‌মাস-টার। কেন, আগে—বল্‌লেই তো হত, এতই যদি ভালবাসা হয়েছিল কোন্ লেডী ডাক্তারের সঙ্গে—বিয়ের আগে-আমাদের জানালেই পার্‌ত তো! বাপ্-হয়েছি বলে তো অন্তর্য্যামী নই মা? ক্ষোভের-হাসি হাসেন তিনি। বউমার কাছে যে কতবড় অপরাধী আমি—নিবিড় স্নেহে ও দুঃখে বেদনায় প্রৌঢ় রতনবাবুর চোখ ছল্‌ছল্ করে। সে ভাব সাম্‌লে নিয়ে বলেন—বৌমাকে যে তোরও চেয়ে অনেক সময় বেশী স্নেহ করি তড়িৎ, কেন জানিস্ মা? রতনবাবু ব্যথাতুর দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে সপ্রতিভ ভাবে চেয়ে থাকেন ক্ষণকাল।

—না বাবা, জানি না, জান্‌বার জন্যে ব্যস্তও নই। শুধু এইটুকুই জানি—তার প্রাপ্য, আমার চেয়ে বেশীই—মায়ের কাছে, তোমার কাছে। তা' যদি তোমরা তাকে দিয়ে থাক বলে মনে কর, জান্‌ব-তোমরা কর্ত্তব্যের দিক দিয়ে ঠিক করেছ। দৃপ্ত ভাবে তড়িতা কথা কয়টি বলে।

রতনবাবু গভীর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলেন—তুই আমার মেয়ের-মতই কথা বল্‌লি তড়িৎ—সরে আয় মা, আমার অনুতপ্ত পিতৃ হৃদয়ের আকুল আশীর্ব্বাদ করি তোকে প্রাণ ভরে।

তড়িতা ফিরে এসে পূর্ব্বস্থানে বসে মাথা হেঁট করে পিতার পায়ের কাছে। রতনবাবু হাত দু'খানা ওর মাথার ওপর রেখে স্নেহকম্পিত কণ্ঠে

করেন আশীর্ব্বাদ। চোখ থেকে ঝরে পড়ে স্নেহ-ব্যাথার অশ্রু, তড়িতার মাথায় এবং ওঁর হাতের ওপর।

—মা, ভগবান-তোর মনের, ও জ্ঞানের পুরস্কার যেন আজীবন দেন মা, তুই যার ঘরেই যাস আমার আশীর্ব্বাদ রইল—সুখী হোস্, ভগবান তোর কল্যান্ করুন।

অনেকক্ষণ পরে মেয়ের মাথা থেকে হাত উঠিয়ে নেন। তড়িতা মাথা তুলে বলে—বাবা, মনে মনে বৌদিকেও আশীর্ব্বাদ কর, আমায় যা বলে করলে —

রতনবাবু উদ্বেলিত কণ্ঠে বলেন—তাকে ও রাত্রি-দিন—এমন কি সন্ধ্যা গায়ত্রী করে ওঠ্‌বার সময়ও প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করি মা। সে-ও তো তোমাদেরই একজন, আমার পর নয় সে। তাকে যে এত আদরযত্ন করি মা, সে শুধু তার কাছে যে মহা অপরাধ করেছি, তারই কিছুটা কমাবার জন্যে রে!

—একজনের জন্যে আমাদের সব্বাইকেই অপরাধী হতে হয়েছে বাবা, বৌদি কিন্তু শুন্‌লে রাগ করে। বলে দোষ কারুর নয়, আমার কর্ম্মফল আমাকেই ভোগ করতে হবে ঠাকুরঝি। যাই বাবা, তুমি শোও রাত্রি অনেক হয়ে গেল কথায় কথায়—বলে' অদূরে টেবিলস্থিত টাইম্‌পিসের দিকে চায়। সত্যি খুব রাত্তির হয়ে গেল বাবা, আমি যাই—গয়নাগুলো তুমি দেরাজে রেখে শোও বাবা। বলে তড়িতা চলে যায়।

গয়নাগুলো তুল্‌তে তুল্‌তে রতনবাবু আপন মনেই বলেন—ছেলের বিয়ে দিয়ে কোথা বৌয়ের সেবা-যত্ন পাব, না তাতেও দুঃখ!

(১১)

কয়েকমাস হ'ল রবীন্ চাক্‌রী করছে, এর মধ্যে একবার মাত্র বিজনের যাওয়ার পর বাড়ী গেছে। বাপ মায়ের ওপর রবীনের নিবিড় অভিমান এবং তারই জন্যে ওর চাক্‌রী নিয়ে বিদেশে যাওয়া।

ডাক্তার হলেও রবীন্ কবি-প্রাণ মানুষ, উচ্ছ্বাস এলে কবিতা সে লেখে, পদ্মার তীরে তার ভালই লাগ্‌ছে। এছাড়াও মানুষের সেবা-কাজে খুব আমোদ পায়, কুলীদেরও সত্যিই অনেকখানি ভালো-বেসেছে এবং তাদের কাছ থেকেও অনেকখানি ভালবাসা পেয়েছে। রবীন্‌কে তারা খুব শ্রদ্ধা করে, এবং ডাক্‌তে হাঁক্‌তে সব সময় এসে দাঁড়ায়। আর তারই মত যারা এসেছে চাক্‌রী নিয়ে ভদ্র-শ্রেণীরা, তাদের মহলেও অনেক খানি আধিপত্য ডাক্তার হিসেবে পেয়েছে ও। তাদের বাড়ীর ছেলে মেয়ে থেকে গিন্নীরা পর্য্যন্ত ডাক্তার বাবুর জন্যে দরকার হলে প্রাণ দিতে পারে। হাতে কাজ না থাক্‌লে রবীন্ প্রতিবেশীদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ডেকে পাঠায় এবং তাদের নিয়ে সময় কাটায়। নিঃসঙ্গ দিনগুলো ছোট ছেলেদের নিয়ে গল্প করে খেলা করে আনন্দেই কাটে ওর। ও এখন বড় কোয়ার্টার পেয়েছে—পদোন্নতি হয়েছে।

গিরীন্ বাবুদের বাসা থেকে খানিকটা দূরে এসেছে, কিন্তু হলে কি হয়, ঘনিষ্ঠতা তাতে কিছুমাত্র কম হয়নি। প্রায় রাত্রে গিরীন্ বাবুর স্ত্রী নেমন্তন্ন করে পাঠায়, বাঙাল দেশের খাবার-দাবার তৈরী করে ডাক্তারবাবুকে পাঠিয়ে দেয়। চায়ের নেমন্তন্নও হয় প্রায় সন্ধ্যের দিকে।

গিরীন্ বাবুরা সপরিবারে ডাক্তার বাবুর কাছে কৃতজ্ঞ, ওঁর ছোট্ট ছেলেটাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ও নাকি ফিরিয়ে এনেছে।

তাই রবীন্ আজ-কাল এক রকম ওদের ঘরের লোক হয়ে উঠেছে। দিনগুলো ওর খুব আনন্দেই কাটছে।

রবীনের বাবা-মা একদিনের জন্যে বাড়ী আস্‌বার কথা লিখে লিখে হাল্ ছেড়ে দিয়েছেন, তড়িতা মনে মনে অপ্রসন্না হলেও বাবা-মা এবং ওর বৌদির মন রাখার জন্যে দুঃখ করে অনেক চিঠি লিখেছে, বাড়ী আস্‌বার জন্যে সকাতর অনুরোধ জানিয়ে রণেনদা শেষ পর্য্যন্ত রমলাও লেখে, একবার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার জন্যে।

রবীন্ সংক্ষেপে সবার চিঠির উত্তর দেয়, দেয় না শুধু রমলার চিঠির উত্তর। তড়িতাকে লেখে, আজ বাবা-মা আমায় পেতে পারে না তড়িত, যাঁরা উপযুক্ত ছেলের মতামতের কথা উপেক্ষা করে, নিজেদের মতকে প্রধান করে, খুসী মত কাজ করে, তারা ছেলেকে পায় না, সুতরাং বাড়ী যাওয়ার জন্যে বার বার লিখে যদি তুই পর্য্যন্ত বিরক্ত করিস্, তাহলে আমায় আরও দূরে যেতে হয়।

তড়িতা ওর দাদার এই নিষ্ঠুর উক্তিপূর্ণ পত্র খানা দেয় পিতাকে। বাপ মাকে লেখে যা' তাতে এ ধরণের কোন কথা নেই—মাত্র এখানে এত কাজের চাপ যে কোন মতে ছুটি পাবার উপায় নেই। রণেনকেও ঐ রকম দু'চার কথা লেখে। ডাক্তারদের জীবনে ছুটি নেই, তারা এক বিরাট, গুরু দায়িত্ব নিয়ে কর্ম জগতে আসে, মানুষের জীবন মরণের দায়িত্ব থাকে এক মাত্র মানুষের হাতেই, সুতরাং তাদের জীবনের গতিপথ অন্য সবার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ কথা তুমি বিদ্বান্ মানুষ

বুঝবে এবং বাবা-মা-কেও বুঝিয়ে দেবে, আশা করি ভুল বুঝবে না। রণেনও তার পত্র খানা রতনবাবুর হাতে দেয়, পড়ে দেখতে।

রতনবাবু সবার পত্রগুলিই পড়েন এবং গিন্নীকে ডেকে শোনান। ক্রোধে, ক্ষোভে তাঁর পিতৃহৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। গিন্নীকে বলেন—আর কাউকে চিঠি লিখ্‌তে বল না তুমি, ইচ্ছে হয় নিজে লিখ কিন্তু, আমাদের আর বিরক্ত কর না, এই আমার আদেশ। যে ছেলে বাপ্‌ মায়ের জন্যে ভাবে না, তাদের দুঃখ-সুখ, ভাল-মন্দে মাথা গলায় না, বুড়ো-বুড়ির জন্যে এতটুকু কর্ত্তব্য করে না, তেমন স্বার্থান্ধ ছেলের জন্যে ভাবতে হয় নিজে ভাব তুমি। গিন্নী নীরবে স্বামীর এই বেদনা পূর্ণ কটূক্তিগুলো শুন্‌তে শুন্‌তে অদৃশ্য হন্‌। তড়িতা ও রণেনের ওপর আদেশ দেন, তোমরা আর কেউ পত্র লিখো না। সকলেই তাঁর রাগের কারণ বোঝে এবং নীরবেই মেনে নেয় তাঁর আদেশ।

তড়িতা দাদার ওপর মনে-মনে চটেই ছিল, এরকম কড়া চিঠি পেয়ে এবং বাপ মা'র সম্বন্ধে অভিযোগ, অকারণ দোষারোপে মন ওর রাগে অপমানে ভরে উঠেছিল একে, তার ওপর বৌদিকেও কম অপমান করেনি, সকলের চিঠির যা হোক একটা উত্তর দিয়েছে, দেয়নি রমলার-ই চিঠির জবাব। পিতার আদেশ পেয়ে তড়িতা যেন বেঁচে গেল।

রবীনের ওপর রাগ কয়েকদিন ধরে রতনবাবুর মন অধিকার করে রইল, তারপর আবার কালের প্রলেপে আস্তে আস্তে কমে এলো। রবীনের মা গোপনে সকলের আড়ালে কদিন কেঁদে কেঁদে কাটালেন। ছেলের অভিমান দীর্ঘকাল থাকলেও বাপ্‌ মা-র রাগ বা অভিমান সন্তানের ওপর ক্ষণিক থাকে। তাই যতখানি রাগ সেদিন রতনবাবুর

দেখা গেল, এবং রমলাকে করল সব চেয়ে বেশী বিব্রত, অপরাধীর মত সে রইল এড়িয়ে এড়িয়ে, ততখানি রাগ তাঁর অন্তরের হয়ত নয়, কিংবা ক্ষণস্থায়ী যে, এও কয়েকদিন পরেই বোঝা গেল। রবীনের মা ছেলের জন্যে ভেঙে পড়েন এবং রণেনকে চুপি চুপি ধরেন—একবার আমায় নিয়ে চল বাবা, সে যদি বাড়ী না-ই আসে, তবে মাঝে মাঝে আমি গিয়ে না হয় দেখে আসব, কিন্তু তাই বলে আমি তো তাকে ত্যাগ করিতে পারিনে, আমি তার মা যে!

রণেন পুরুষ হলেও মন তার খুব নরম, মামির দুঃখে গলে যায়। কিন্তু সাহসে যে কুলোয় না মামিমা, মামার কাছে রবীনের প্রসঙ্গ তুলতে!—বলে মাথা চুলকায়। ভাগ্যক্রমে ওঁদের নিরিবিলি পরামর্শ স্থানে এসে পড়ে তড়িতা। ওকে দেখে যেন অনেকখানি ভরসা পায় রণেন। তড়িতা কোন কিছু বলবার আগেই রণেন খপ্ করে ওর একখানা হাত আচমকা চেপে ধরে, অনুরোধ করে অনুনয়ের সুরে বলে—তডিতা, বোন্, আমার একটা অনুরোধ রাখ্তে হবে, তোকেই মনে মনে চাইছিলুম, এসেছিস্ ভাল হয়েছে—বলে শক্ত করে চেপে ধরে হাত এবং মুখের দিকে স্নেহপূর্ণ চোখে চায়।

তড়িতা ঘরের দরজার কাছেই হঠাৎ এরকম বাধা পেয়ে বেশ একটু বিমূঢ় হয়েছিল প্রথমে। কিন্তু পরক্ষণেই ওর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে অদূরে দণ্ডায়মানা মায়ের ওপর যেমন, অমনি বুঝে নেয় ব্যাপারটা কি। তাই রণেনের বিনয়পূর্ণ কথার উত্তরে তেমনি মমতা ভরা কণ্ঠেই বলে—বল তোমার অনুরোধ কি, যদি রাখবার মত হয় নিশ্চয় রাখ্ব।

রণেন তার বক্তব্য বলে। শুনে তড়িতা উত্তেজিত হয়ে বলে—ঐ অনুরোধ ছাড়া আর যা বলবে সব পারব, কিন্তু ওর সম্বন্ধে কোন কথা

আমি বাবার কাছে উত্থাপন করতে পারব না। বলে হাত ছাড়িয়ে চলে যেতে চায়, মায়ের দিকেও চায় একবার রোষপূর্ণ চোখে। রণেন ওর হাত ছেড়ে দিয়ে বলে--তবে আর কি করব মামিমা! আমার সাধ্য নেই তোমারও নেই, একমাত্র পারে তড়িতা—ওর কথা শেষ হতে দেয় না তড়িতা। বলে—আমারও সাধ্য নেই রণেন দা, সে তুমি কিংবা মা যতই বল, তার চেয়ে বরং উপায় আছে যাদের হাতে, সেই তাদের একটা কাউকে আনো, দিদিদের কি জামাইবাবুদের—মায়ের দিকে চেয়ে বলে—মা, তুমিই সহজে পারবে ওঁদের কাউকে দিয়ে বলিয়ে ওদেরই সঙ্গে নিয়ে যেতে, এছাড়া আর উপায় নেই। তড়িতা আর দাঁড়ায় না ক্ষিপ্রপায়ে চলে যায়।

তড়িতা চলে গেলে ওর মা রণেনকে বলেন—তাই না হয় কর বাবা। কুমুদকে একটা টেলিফোন কর, ওরা আসুক।

রণেন তাই করবে বলে চলে যায় এবং তখনি প্রণতাদের দুজনের বাড়ীই ফোন করে নিমন্ত্রণ করে, আসতে। তড়িতা নিজের পড়ার ঘরে ঢুকে সেই যে দরজা বন্ধ করে, একবারে সারাদিনের মত।

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালার পর যখন ললিতারা এসে দরজায় ধাক্কা দেয়, তখন পাঠরতা তড়িতার চমক ভাঙে। রমলা এসে চা দিয়ে যায় যথারীতি, তড়িতা কথা কয় না নীরবে চাটুকু গলাধঃকরণ করে। ওকে আজ আর টেনে বের করতে ওর জামাইবাবুরাও পারে না, একজামিন্ আছে বলে দেয়।

অনেকটা রাত্রিতে তড়িতা যখন ক্লান্ত অবসন্ন প্রায় দেহ মন নিয়ে পিতার শয়ন কক্ষে দেখা দেয়, তখন ওর দিদিরা চলে গেছে শোনে এবং খেতে গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করে—যাওয়ার ব্যবস্থা কিছু হ'ল?

মা মনে মনে এই মেয়েটিকে রীতিমত ভয় করেন, এক রোখা ও কাঠখোট্টা বলে যেমন, মেনে ও চলেন অন্য মেয়েদের চেয়ে বেশীই। তাই তড়িতার প্রশ্নের উত্তরে বলেন খুব সন্তর্পণের সঙ্গে ভয় বিজড়িত কণ্ঠে—হ্যাঁ, উনিও যাবেন, সবাই গিয়ে একবার তাকে বুঝিয়ে দেখে আসি, কেন বাড়ী আস্‌বে না। তারপর না হয়, তার ইচ্ছেমতন বিয়েই করুক আর একটা, সুখী হোক্ সে—তাই বলে ছেলের জীবন বয়ে যেতে দেওয়া তো যায় না—পরের মেয়ের জন্যে—তড়িতার হাতে ভাতের গ্রাস ধরাই থাকে, মায়ের মুখের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চায়। অনেকক্ষণ পরে বলে—এই যুক্তিই শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের ঠিক হল মা? ওর কথার উত্তরে—ওর মা বলেন—তা ছাড়া উপায় কি বল্? পাঁচটা নয় দশটা নয়, একটা ছেলে—একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক্, নেহাৎই যদি তার মন না ফেরে—তখন আবার না হয় বিয়েই করে তো করুক। অনেক দিন দেখা হ'ল, তার মন বৌমার ওপর ফির্‌বে আশা করে, কিন্তু তা' যখন হ'ল না, কি করা যাবে—বলে মা দিব্যি সহজ ভাবেই উঠে গেলেন।

তড়িতা নির্ব্বাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ খাবারের কাছে বসে থেকে উঠে যায়, মুখে রোচে না খাদ্য। মন ওর সায় দেয় না মায়ের যুক্তিতে। রমলার বিপক্ষে তার বিবেক-বুদ্ধি যায় না, উঠে পিতার কাছে যায়, তাঁর মতামত জান্‌তে।

ঘরে ঢুকে কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, প্রশ্ন করে পিতাকে—বাবা! বৌদিকে বনবাস দেওয়ার যে যুক্তির কথা এই মাত্র মায়ের মুখে শুন্‌লুম, এর মধ্যে তুমিও আছ নাকি?

রতনবাবু চোখে চশমা এঁটে কি একটা লিখ্‌তে ব্যস্ত ছিলেন।

হঠাৎ মেয়ের কণ্ঠস্বরে মুখ তুলে দেখতে পান্ টেবিলের অপর ধারে দাঁড়িয়ে তড়িতা।

বাপের মুখের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, উত্তরের জন্যে।

রতনবাবু—মেয়ের আকস্মিক প্রশ্নে বিপন্ন হয়ে ওঠেন। একটু পরে সে অবস্থা থেকে সাম্‌লে নিয়ে উত্তরে বলেন—মানুষ যা' ভাবে, ভগবান তার বিপরীত করেন তড়িৎ! মনে করেছিলাম, আজ-কাল অনেক ছেলেই—বিয়ের আগে বা পরে একটু জেদ করে এক পছন্দ অপছন্দ নিয়ে শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি স্ত্রীর মধ্যে চায় দেখ্‌তে, না হলে মন কষাকষিও অনেক সংসারে আজ কাল দেখা যায় নতুন নতুন, কিন্তু সেটা চিরস্থায়ী হতে দেখা যায় না বড় একটা, তাই ভেবেছিলাম আমিও মা, কিন্তু আমার অদৃষ্টে সবই উল্টো—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন তিনি। হতাশ-হৃদয় পিতা ধীরে ধীরে দৃষ্টি নত করেন।

তীব্র প্রতিবাদের সুরে তড়িতা বলে—দাদার তো আর একটা বিয়ে দেবে বাবা, কিন্তু বৌদির কি করবে শুনি? তার জন্যে ও তো তোমাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি জাগা উচিৎ। বক্রদৃষ্টিতে চায় পিতার পাণ্ডুর মুখের দিকে। তারপর একখানা চেয়ারে ঝুপ্ করে বসে পড়ে।

রতনবাবু অনেকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থাক্‌বার পর তড়িতার প্রশ্নের উত্তরে বলেন—তুমি এইখানেই আমায় ঘাল্ করলে মা! বৌমার ওপর আমাদের কর্ত্তব্য ষোল আনা আছে স্বীকার করি মা, কিন্তু সে কর্ত্তব্য মাত্র একটি পথ দিয়েই দেখান যেতে পারে,—বাধা দিয়ে সকৌতূহলে তড়িতা প্রশ্ন করে, সে পথটা কি বাবা? বাপের বাড়ী বিদেয় করে দেওয়া কি? না একদিকে দাদার বিয়ে দিয়ে বৌ আর একটা আন্‌বার আগে বৌদিকে নিজের হাতে সম্প্রদান করে, তাকে

তার শ্বশুর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়ার পর, দাদার বিয়ের ব্যবস্থা করা বাবা! জলন্ত চোখে পিতার মুখের ওপর কটাক্ষপাত করে তড়িতা।

রতনবাবু সে দৃষ্টির দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নেন। অনেকক্ষণ ঘর স্তব্ধ, ঘড়ি ঘোষণা করে বারটা। রতনবাবু বলেন—কাল এ আলোচনা হবে মা, আজ আমায় ছুটি দাও।

—না বাবা, ছুটি আজ কোন মতেই দেব না, আমার ধারণা ছিল, তুমি সাধারণ মতের বিরোধী, আজ যখন তা' বদ্‌লে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে মনটা আমার তোমার ওপর কঠিন হয়ে উঠেছে, এই মন নিয়ে বিছানায় শুয়েও ঘুম হবে না, তোমাকে আমি মায়ের চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি, কিন্তু আজ—এই মুহূর্ত্তে যে কটা কথা বললে তুমি, তাতে মনটার মধ্যে কি ঝড় যে তুল্‌লে তা বুঝ্‌বে না বাবা! এতদিনের বিশ্বাস, ধারণার যে ভিত্তি দৃঢ়তর হয়েছিল, আজ লোনা লাগ্‌ল প্রথম; এইবার একটু একটু করে ধ্বস্‌তে থাক্‌বে বাবা! শেষের কথা কটী বেদনায় গাঢ় কণ্ঠে তড়িতা বলে।

রতনবাবুর কণ্ঠও আর্দ্র হয়ে আসে।—তবে তুই বুদ্ধি বের কর্‌ তড়িৎ, যে বুদ্ধিতে বৌমার, রবীনের দুজনেরই শুভ হয় মা! আমার চেষ্টা, শক্তি সব পরাস্ত হয়েছে, তুই আমায় অপরাধী করিস্‌ না, বিচার করে দেখ—ছেলে একলা আমার নয় মা! আমার চেয়েও তোদের ওপর বেশী দাবী রাখেন, তোদের গর্ভধারিণী, স্তন্যদাত্রী, মা। আজ তুই ছেলেমানুষ তড়িৎ, তাই কাঁচা মন নিয়ে তোর বাবার সঙ্গে যে তর্ক করছিস ভ্রাতৃবধূর জন্যে তোর এ উদার মনের প্রত্যেকটি যুক্তি অকাট্য সত্যি এবং প্রশংসনীয়ও। কিন্তু মা, আজ সংসারের বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে যে ত্রুটি আমার ধরছ, একদিন যখন তুমি মা হবে, তখন নিজের

সন্তানের ভুল-ত্রুটি, অন্যায় শত শত তুমিই দেখতে পাবে না, কিংবা দেখে ও ক্ষমা করবে। স্নেহাতুর হয় বাপ মা চিরদিনই, মন তাদের ধৃতরাষ্ট্রের মত অন্ধ করে দেয় প্রকৃতি, যেদিন নর-নারী পিতা মাতা হয় মা! মধ্য পথে রতনবাবু থেমে যান্। স্নেহাতুর পিতৃহৃদয় বুঝি উদ্বেল হয়ে ওঠে পুত্রের কথায়। তবু আমি অনেকখানি কঠোর হয়েছি তড়িৎ। বৌমার বুড়ো বাপ কত করে যে লিখছেন পাঠাতে একবার, কিন্তু আমি অভদ্রতা জেনেও পাঠাইনি, বা কেন পাঠাচ্ছিনা, সে কারণ পর্য্যন্ত দর্শাতে পারছিনা সব, নানান মিথ্যে দিয়ে আসল সত্যকে গোপন করে তাঁকে হয়ত নিজেকে প্রতারণাই করে আস্‌ছি নিয়ত। পানের ডিপে খুলে একটা পান মুখে দিয়ে সেটা বার কতক চিবিয়ে বোধ হয় তার রস্‌টুকু গিলে নিয়ে আবার বলতে থাকেন—এযে কি ভয়ানক কষ্ট তড়িৎ, তা আজ তোকে ও রবীনকে কাউকেই তোদের বোঝাতে পারব না মা। বড় রকমের একটা নিঃশ্বাস ফেলেন। তড়িতা এবার কান্নার মত সুরে বলে—বাবা, বৌদিও ওর বাবাকে জানাতে চায় না, যত চিঠি ও লেখে আমায় দেখায় কিনা,—ও তাই এখানেই পড়ে থাকতে চায়—বাপেরবাড়ী যেতে মোটেই ও চায় না বাবা। বলে—সেখানে গেলে ধরা পড়ে যায় যদি, তাহলে বাবা আর বাঁচবে না। এখানে ওর দাদারা বেশী আসে, তা অবধি ওর ইচ্ছে নয়-বাবা। মনে নেই ওর দাদাদের জানাতে নিষেধ করে দিয়েছিল তোমাকে আমার দ্বারা, একমাত্র বিজনদা ওদের বাড়ীর মধ্যে জানে, তাও তাকে একদিন আমিই বলে দিয়েছিলুম ওদের ভালোর জন্যে-ই—দাদা তখন এখানে ছিল—তাই বৌদি আমার ওপর খুব রাগ করেছিল। আমি খালি এই কথাই ভাবি—বৌদির স্বভাবের মধ্যে দোষ বলে তো কিছু নেই। তবে কি দাদার কপালে সুখ নেই বলেই ওকে

চিন্‌তে পারলে না ! আর একটা কথাও সব সময়ে ভাবি,—তোমার মত বাপের ছেলে হয়ে, ও এমন নিষ্ঠুর, এতবড় বর্ব্বর হল কি করে ? কিন্তু আজও তার উত্তর পাই না বাবা—

রতনবাবু মেয়ের সরলতাপূর্ণ কথায় অনিমেষ চোখে কিছুকাল ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলেন, রত্ন কি সবাই চিনতে পারে তড়িৎ ? তাই যদি পারত তবে জহুরী শব্দ উৎপত্তির কারণ কি বল ? অভিধানকে একটা শব্দ দিয়ে বড় করবার জন্তে নিশ্চয় নয়। মেয়েলি প্রবাদ বলে দুটো লাইন ছড়া আছে, সেটা ও অর্থহীন প্রলাপেই পর্য্যবসিত হয়ে বাতিল হয়েই যেত মা—'অতি বড় রূপসী না পায় বর, অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর।' এই যে ছড়াটা, এ নিশ্চয় কোন ভূয়ো-দর্শীর লিখে যাওয়া—মেয়েরা ভুক্তভোগী এই দুটো ব্যাপারে এবং তাদের জন্তেই বিশেষ করে লেখা, তাই তারা এটা বেশী ব্যবহার করে কথায় কথায় নিজেদের মধ্যে, এই জন্তেই এটাকে মেয়ে পাঁচালি ইত্যাদি বলে এক শ্রেণীর পুরুষ চায় ঐ শ্রেণীর ছড়ার বিলোপ সাধন করতে। কিন্তু ঐ ছড়ার অন্তর্নিহিত যে অর্থ এবং তার ভেতর যে জ্ঞানীজনের জ্ঞাণের অঙ্কুর লুকিয়ে আছে এতে কোন দ্বিধা নেই মা, এবং মেয়েদের জীবনে ঘটে বলেই তাঁরা যে অন্যান্য বিষয় সম্পত্তির মত মুখে মুখে যুগে যুগে বাঁচিয়ে রেখেছে ছড়াটিকে এবং পুরুষানুক্রমে মেনে আসছে, এর জন্তে আমি পুরুষ হয়ে তোদের ধন্যবাদ দিই মা ! এ কথার সত্যতা বৌমার জীবনে খুব ভাল করেই বুঝছি।' দরিদ্র ব্যক্তিরা যেমন রত্নের আদর করতে জানে না, রবীনেরও ঠিক তাই ! বলে পুনরায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়েন। ঠিক বলেছ বাবা, অমন বৌ—বৌদির মেজাজ যেমন শান্ত, বুদ্ধিতে তার আমিই এক এক সময়ে চম্‌কে যাই—ওর জ্ঞান বুদ্ধি

. যা, আমার তো লেখা পড়া শিখেও নেই বাবা—বলে কি জান! বিয়ে যখন ফিরবে না, তখন ও নিয়ে আর সবাইকে জানিয়ে ফল কি! তুলসী মঞ্চে তিন বেলা দাদার মঙ্গল কামনা করে মাথা ঠোকে বাবা, তারপর গয়না কাপড় চুল-বাঁধা সব ছেড়ে দিয়েছে। তাই বলছি বাবা, তুমি দাদার যদি মঙ্গল সত্যি চাও, তাহলে ওকে বিদেয় করে দিয়ে আর বিয়ে দিতে যেওনা, ওরই পাতিব্রত্যের ওপর ছেড়ে দাও, দাদাকে ফিরিয়ে আনতে হয়ত একদিন বৌদিই পারবে। বাইরে কোথায় কোন ক্লক ঘড়ি রাত্রি দুটো বাজিয়ে দেয়। তড়িতা উঠে দাঁড়ায়—ওঃ, অনেক রাত হয়ে গেল, বৌদি বোধহয় বসে আছে আমার জন্যে—তুমিও শুয়ে পড় বাবা। বলে বাপের মশারির কাছে গিয়ে ও দাঁড়ায়, তারপর রতনবাবু শুয়ে পড়লে মশারি গুঁজে দিতে দিতে বলে—মা বোধহয় অন্য ঘরে শুয়েছে, এদিকে আসেনি আমার ওপর রেগে আছে বলে। আপন মনে কথাগুলো বলে আলো নিভিয়ে দ্রুত পায়ে নিজের শোবার ঘরে আসে। ঘরে আলো জ্বলছে রমলা বিছানার এক প্রান্তে শুয়ে কি একখানা বই পড়ছে। তড়িতা কাছে গিয়ে দেখে জেগেই আছে একটু অনুতপ্ত স্বরে বলে—ভাই তুমি কেন এতটা রাত পর্য্যন্ত জেগে বসে আছ কষ্ট করে! জান আমার একজামিন সামনে। বইখানা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কাছের টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, শোও এখন। তোমার ওপর খুব রাগ হয়েছে আমার। পড়ার বই ছুঁতে পারনা—এদিকে—রমলা মৃদু হেসে বলে তুমিই বা পড়ার বই পড়ছিলে কোথা এতক্ষণ, বাবার সঙ্গে আমার জন্যে তর্ক করছিলে তো—বলে পুনরায় ও হেসে চায় তড়িতার মুখের দিকে।

তড়িতা বোঝে রমলা তাদের পিতা পুত্রীর যা' আলোচনা হয়েছে

তার কিছুটা শুনেছে। নিজের ধারণা সত্য কিনা জানবার জন্যে রমলার দিকে ঈষৎ আড়চোখে চায়। তোমারও বুঝি আড়ি পেতে অপরের কথা শোনার অভ্যাস হচ্ছে বৌদি! বলে রমলার মুখের ওপর গম্ভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ব্যস্ত হয়ে রমলা উত্তর দেয়—না ভাই; তোমায় পড়ার ঘরে ডাকতে গিয়েছিলুম, সেখানে না পেয়ে বাবার ঘরের কাছে যেতেই গলার আওয়াজ পেয়ে সামান্য সময় দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার মধ্যে আমার নাম দু'তিনবার শুনেই পালিয়ে এসেছি।—বেশ করেছ এখন শোও। বলে তড়িতা শুয়ে পড়ে।

(১২)

রণেন আর ললিতার জিম্মায় তড়িতাদের রেখে, রবীনের কাছে সেদিন ওরা যাবার জন্যে রাত্রের ট্রেনে বেরুলেন। পাকশীতে রবীন কদিন নেই, ঈশ্বরদি, দামুকদিয়া, পোড়াদহে কদিন কাজ পড়েছে শুনলেন। ছোট-খাট জায়গা বলেই ষ্টেশন থেকে নেমে ডাক্তারবাবুর বাসা খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হয়নি। ষ্টেশনের কুলীর সাহায্যেই ওরা রবীনের বাসায় এসেছিলেন। তালা বন্ধ দেখে নকুলবাবু বলেন—এতদূর এসে ফিরে যাওয়া হবেনা, কাছাকাছি যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে জেনে আসি কবে ফিরবে সে। বলে চলে যায় এবং একটু পরে গিরীণবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ফেরে। লণ্ঠন ও চাবী হাতে তিনি আসেন ঘুম-চোখে এবং চাবী খুলে দেন।—ডাক্তারবাবুর কাল ফেরার কথা আছে বলেন। রবীনের জন্যে দু'দিন অপেক্ষা করতে হয় এবং গিরীণবাবু ও তাঁর বাসার মেয়েরা ঝি চাকর ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করেন। রতনবাবু চলে যেতে চাইলে গিরীণবাবু আপত্তি করেন—কষ্ট করে

এসেছেন যখন, দেখাটা করেই যাবেন, আজ না ফিরলে কাল ফিরতেই হবে বলে আটকে রাখেন।

কথায় কথায় অনেক কথা ওঠে এবং রবীনের আজও বিয়ে দেননি কেন গিরীণবাবু জিজ্ঞাসা করেন সাধারণ ভাবেই। ছেলেদের মন বসে না বিয়ে না হলে মশাই—আমরাও বাড়ী যাওয়ার লগে কত বলি, মেয়েছেলে আনতেও বলেছিলাম গিরীণবাবুর কথা শেষ হতে পায় না রতনবাবু দেন বাধা। বলেন—সে কি মশাই। বিয়ের জন্যেই চাকরী নিয়ে বাড়ী ছাড়া ওর! বছর ঘুরে গেল বিয়ে দিয়েছি মশাই—গিরীণ-বাবুর কণ্ঠ থেকে বিস্ময়ের সঙ্গে বেরিয়ে আসে কয়েকটা কথা। বলেন কি ডাক্তারবাবুর বিয়ে হয়েছে? আমরা তো ভাবি—তাঁর কণ্ঠ বিস্ময়ের আতিশয্যে রুদ্ধ হয়। অনেকক্ষণ পরে বলে—তাই বুঝি বাড়ীর কথা জিজ্ঞেস করলে সে কথার উত্তর দেন না, অন্য কথা তোলেন। আমাদের সঙ্গে এত আলাপ এক্‌বারে হরিহর আত্মা; কিন্তু বাড়ীর কোন কথা আজ ও বলেননি মশাই। নকুলবাবু, কুমুদবাবু শ্বশুরের ও গিরীণবাবুর মধ্যে আলোচনা শুনছিলেন চুপ করে, এখন একটু সাহস করেই নকুলবাবু বলেন—বলবে কি মশাই, উনি যে বাবা মায়ের সঙ্গে মন কষাকষি ক'রে আছেন, না হলে চাকরী করার ও দরকার ছিলনা ওর।

কুমুদবাবু বলেন—আমরা সদলবলে এসেছি ওঁকে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্যে দেখছেন না—গিরীণবাবু মাথা নেড়ে বলেন—হ' তা দেখছি কেন বৌ পছন্দ হয়নি, নাকি? বলে রতনবাবুর দিকে ফিরে তাকালেন।

ক্ষুব্ধ স্বরে রতনবাবু উত্তর দেন—তাই বটে—বৌ তো জগদ্ধাত্রীর মতন দেখতে, কিন্তু ছেলের পছন্দ নয়। ভেবেছিলাম মন ফিরবে দু'দিন

পরে কি দু'মাস পরে ও কিন্তু তা ফেরা তো দূরের কথা মশাই, ভাবিয়ে তুলেছে আমাদের সবাইকে, বাড়ী না গিয়ে, চিঠিপত্র না দিয়ে। এই বুড়ো বয়েসে দেখুন কি শাস্তি আমাদের। তাই ছুটে আসতে হ'ল ওর মায়ের কান্না-কাটির জন্যে। কথায় কথায় আরও অনেক কথা হয়, গিরীনবাবু ও সত্যি একটা আঘাত পান্।

রমলার ওপর আসে তাঁর সহানুভুতি। বলেন—এত বড় বড় বিদ্বান্ লোকেরা এমন লঘু চিত্ত হয় কেমন করে তাই ভেবে পাইনে। ডাক্তারবাবুকে দেখে তা বোঝবার যো নাই, কিন্তু মশাই আমায় যে ভাবিয়ে দিলেন, সেই ভদ্রলোকের মেয়েটার কি হবে। রতনবাবু সনিঃশ্বাসে বলেন—আমারও তো মশাই ঐ অবস্থা, একদিকে ছেলে, আর একদিকে পরের একটি ধরে আনা মেয়ে, তায় বাংলাদেশের মত জটিল সমস্যাবহুল দেশে—রতনবাবুব কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে আসে। অথচ ওর মায়ের জেদ চাপবার উপক্রম মশাই, ছেলে দেখে শুনে আর একটা বিয়ে করুক। গিরীনবাবু বলেন—যদি বলেন, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি, তারপর যদি না পারি, বিয়ের না হয় ব্যবস্থা করবেন। এ তো মশাই আর কিছু নয় বিয়ে বলে কথা, হলে তো আর ঘুরন যাবে না। দুটো মাস আমায় সময় দিন. আর ডাক্তারবাবু যেন না জানতে পারেন আমি শুনেছি।

হতাশ হয়ে রতনবাবু বলেন—দেখুন, কিন্তু সেকি আর হবে মশাই?

রবীন বাসায় ফিরে বিস্ময়ে, দুর্জ্জয় অভিমানে কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে যায়। সদল-বলে বাপ-মাকে দেখে ব্যাপার কি কতকটা বিস্ময়ে এবং কিছুটা কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করে কুমুদবাবু কে কুমুদবাবুর হয়ে উত্তর দেন রবীনের মা। ছেলের হাত ধরে কাঁদেন এবং পুনরায় বিয়ের জন্যে

অনুরোধ করেন। রবি, তুই তোর খুসী মতন মেয়ে দেখে বিয়ে করে সুখী হবি, তাই কর—বলে দুর্ব্বল মাতৃস্নেহে বিগলিত হয়ে অনুমতি দিয়ে ফেলেন। তার সঙ্গে সায় দেন নকুলবাবুরা দু'জনেও। কিন্তু রবীন অটল গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে জানিয়ে দেয় দুচারটে কথায়—আর একটা বিয়েও করবে না এবং বাড়ীর সঙ্গে খুব বেশী সম্বন্ধ রাখা চলবে না তার পক্ষে। রতনবাবুও অভিমানী স্বভাবের লোক, তিনি নিজের মনে দগ্ধ হলেও বাইরে তা প্রকাশ হতে দিতে চান না কোন দিন কোন বিষয়ে যেমন, আজও নীরবে পত্নীর ও পুত্রের সব ব্যবহার, কথা-বার্ত্তা শুনলেন কতক এবং কতক লক্ষ্য করলেন। তারপর শেষ জবাব চাইলেন, ক্রোধে, ক্ষোভে, উত্তেজনায় তাঁর সহ্যের সীমা তখনি গেল ছাড়িয়ে, যখন দেখলেন স্ত্রী তাঁর প্রত্যাখ্যাতা হয়ে পাশের ঘরে শুয়ে কাঁদছেন, আর জামাইরা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে একদিকে এবং রবীনকে বোঝাবার চেষ্টা করছে অন্যদিকে। তখনি চাপা গণ্ডগোলের একটা অস্ফুট আওয়াজ পেয়ে উঠে গেলেন এবং নীরবে দণ্ডায়মান পুত্রকে ভর্ৎসনার সুরে বলেন—মায়ের প্রাণের এ আঘাত একদিন তোমার বুকে বাজবে রবীন, মনে করে রেখো, তোমরা উচ্চ শিক্ষায় এত উঁচে উঠেছ যে, মা বাপকে ঘটি বাটির সঙ্গেই বোধহয় তুলনা করে সেই চক্ষে দেখে থাক! কিন্তু তা তারা নয়, এ বোঝবার সময় একদিন আসবে—রবীন্ ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। রতনবাবু জলদ গম্ভীর সুরে ডাকেন—শুনে যাও, দাঁড়াও রবীন্। রবীন্ ফিরে দাঁড়ায় নত মস্তকে। রতনবাবু জিজ্ঞাসা করেন—তুমি কি চাও বাপু! আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ করতে হলে কি করতে হবে, দয়া করে বলে দাও, যদি সাধ্য হয় করতে চেষ্টা করব।

রবীন্ পিতার দিকে মুহূর্ত্তের জন্যে চেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে বলে—এই মাত্র এলুম, আমায় একটু বিশ্রাম করতে দিন্, তারপর বলব। বলে পিতার দৃষ্টির বাইরে তাড়াতাড়ি চলে যায়। রতনবাবু গিন্নীকে একটা প্রবল ধমক দেন। ওঠ, আজই যেতে হবে, আমাদের সেখানে গিয়ে পড়ে পড়ে কেঁদো খুব করে ; এখন ওঠ। তিনি বোঝেন ছেলের মত সহজে ফিরবে না। জিনিষ পত্র গুছিয়ে নেওয়ার জন্যে ভৃত্যকে আদেশ দিয়ে জামাইদের গোপনে বলে যান্, রবীনের মুখের সাফ জবাবটা জেনে নিতে। বলে রতনবাবু গিরীনবাবুর কাছে বিদায় নিতে গেলেন। পুত্রকে ফেরাবার জন্যে একরকম কাকুতি জানিয়ে বলেন—আমি আপনার কথার ভরসায় থাকব ততদিন কঠিন হয়ে, যদ্দিন না আপনার জবাব পাই। রতনবাবুর চোখ ছল্ ছল্ করে এল, গিরীনবাবু বোঝাবার কোন ভাষা না পেয়ে ব্যথিত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রতনবাবু বিদায় নিয়ে চলে এলেন, কিয়ৎদূর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এসে আশ্বাস দিয়ে ক্ষোভ ও একরাশ বেদনা নিয়ে ফিরে গেলেন বাসায়! ভগ্নমনোরথ হয়ে কলকাতায় ফিরলেন ওরা। পথে কুমুদবাবুর কাছে শুনলেন—রবীন্ কোন কারণে মত পরিবর্ত্তন করবে না, আপনাকে বলতে বলেছে এবং এ কথাও বলেছে, জীবন যখন নষ্ট হতে বসেছে, তখন হোক। উত্তর তার এক। তবে রমলা যদি কোনদিন বাপের বাড়ী যায়, জানালে সে বাড়ী যাবে। মাকেও তাই বলেছে, তোমরাই আমার বাড়ীর পথ বন্ধ করবার জন্য রমলাকে বাড়ীতে রেখে দিয়েছ যখন, তখন তাকে নিয়ে সুখে থাক। রবীনের মতামত শেষ করে, কুমুদবাবুও নকুলবাবু উভয়ে এবার নিজেদের মত প্রকাশ করেন।

রমলাকে না হয় ও রবাপের কাছেই পাঠিয়ে দিন, কিছু টাকার

একটা ব্যবস্থা করে—এ ছাড়া আর কোন পথ তো দেখা যায় না। বলে সাহস করে শ্বশুরের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থাকেন। গিন্নী তো মনে মনে প্রমাদ গণেন, কর্ত্তার আর ছোট মেয়ের স্বভাব তাঁর নখদর্পণে। তবু ক্ষীণ একটু আশার আলো বিদ্যুতের মত দেখা দেয়, নিঃশব্দে সকলেই অপেক্ষা করেন রতনবাবুর মুখের উত্তরের আশায়। কিন্তু তিনি ছোট্ট একটি হু'—ছাড়া আর কিছু বলেন না, ব্যগ্র তিনখানি হৃদয় শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে নিরস্ত হয়। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মন নিয়ে রতনবাবু বাড়ী এসেই বিছানা নেন্। ঘর থেকে বের হন্ না, কারুর সঙ্গেই বড় একটা কথাও বলেন না, দোকানেও যান্ না—রণেনের ওপর ভার দিয়ে দেন। মেয়েদের সঙ্গেও সে রকম ভাবে গল্প করেন না, তাঁর এ পরিবর্ত্তনের কারণ বাড়ীর সবারই কম বেশী জানা আছে, তাই তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে না, একমাত্র তড়িতাই যা ভরসা করে যায় ঘরে এবং তার সঙ্গে-ই কথা বার্ত্তা হয়। বিপদে পড়ে কেবল রমলা। শ্বশুরের হঠাৎ এমন পরিবর্ত্তনের কারণ সঠিক তার জানা নেই বলে' কখনো ভাবে অসুখ করেছে, আবার সেবা করতে গেলেও ফিরিয়ে দেন তাকে—দরকার নেই বলে। দ্বিধায়, সন্দেহে দোদুল্যমানা রমলা বুঝে উঠতে পারে না, তড়িতাকেও প্রশ্ন করে সদুত্তর পায় না, চুপ করেই থাকতে হয়।

(১৩)

পাকশী থেকে যারা ফিরল, সকলের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন অত্যন্ত আশ্চর্য্যের সঙ্গে-ই রমলা লক্ষ্য করলে। ভেতর ভেতর অনেকখানি মুষড়েও পড়ল। শ্বশুরের কাছে গেলে তিনি আর আদর অভ্যর্থনা করেন না, কথাও বলেন না আগের মত, শাশুড়ী মুখ ভারী

করে থাকেন, রমলা অপরাধীর মত সরে আসে, সাম্‌নে বেশীক্ষণ থাকতে কি যেতেও ভয় পায়। স্বামীর জন্যে ও একটা অজ্ঞাত ভয়ে, ভাবনায় আড়ষ্ট হয়, কিন্তু তাঁর কুশল সমাচার কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবে? কয়েক দিন এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটে ওর, এতদিনে এই বাড়ীটায় আর যেন কোন মতেই ওর মন চায়না থাকতে, গোপনে বাপের জন্যে চোখের জল ফেলে রমলা।

তড়িতা ওর জামাইবাবুদের মুখে রবীনের মন্তব্য শুনে চটে আগুন হয় দাদার ওপর এবং সেই সঙ্গে মায়ের মনোভাব শুনে শিউরে উঠে মনে মনে। বৌদির সাম্‌নে বল্‌তে, গল্প করতে, এমন কি ওকে মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ করে তড়িতা। মায়া হয় রমলার সকরুণ চাউনি দেখলে, ভেবে উঠতে পারেনা, ওর চলে যাওয়ার কথা। পিতাকেই এবং তাঁরই ঘরকে একমাত্র আশ্রয় করা ছাড়া তড়িতার আর উপায় থাকে না। বলে—বাবা, তোমার অবস্থার গুরুত্ব আমি বুঝ্‌ছি, কিন্তু তাই বলে এমন করে রাতদিন যদি ভাব, দুশ্চিন্তায় যে শরীর ভেঙে পড়্‌বে। মেয়ের কথায় রতনবাবু ম্লান হেসে বলেন—যেতে পারলেই বাঁচি মা, কিন্তু ছুটি মঞ্জুর তো আজও হবার গতিক নেই দেখ্‌ছি! চোখে জল আসে তাঁর।

তড়িতা নিজের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয়। বাবা! ওসব-কথা বল না, আমি শুন্‌তে পারি না! তোমার কষ্ট আমার মোটে সহ্য হয়না বাবা! না মা তোকে আর বলব না, নিজের মনে রাতদিন বল্‌ছি, আর তো তোর বিয়ে ছাড়া কোন কর্ত্তব্য আমার নেই—এসেছিলাম শুধু দুঃখ দৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, আর কর্ত্তব্যের দুর্ব্বহ বোঝা বইতে, তা একরকম হল, এখন মনে হচ্ছে চাই ছুটি, বড় ক্লান্ত মা! একটু জিরিয়ে নিয়ে

পুনশ্চ বলেন—মনে হচ্ছে কি জানিস্ তড়িতা? বৌমার বিপক্ষে অস্ত্র ধরবার আগে, বৌমাকে অপমান করার আগে, তাঁর ওপর কোন রকম অবিচার আমার দ্বারা হবার আগে পৃথিবী থেকে চলে যাই—কিন্তু তখনি এসে দাঁড়াচ্ছে সাম্‌নে মস্ত বাধা মাথা তুলে,—দেখিয়ে দিচ্ছে কে যেন চোখে আঙুল দিয়ে, তোর বিয়ে এখনো বাকী—শুনতে পাচ্ছি কাণে—এখনো থাকতে হবে কিছুদিন ওঃ। রতনবাবু আত্মহারা হয়ে ওঠেন।

তড়িতা সান্ত্বনার সুরে বলে—বাবা! তোমার এ অবস্থা আর সহ্য হয় না যে —

উন্মত্তের মত হেসে উঠে রতনবাবু বলেন—ঠিক বলেছিস্ মা, অসহ্যই বটে! রমলাকে কি করে চিরদিনের মত পরিত্যাগ করব, একদিকে এই প্রশ্ন নিরন্তর করছি, এ অপরাধ কার? নিজেকে এর পরে কি বলে জবাব দিহি করব? আবার—বৌমা থাকলে ছেলে বাড়ী আসবে না—আমার চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট পাচ্ছেন তোমাদের মা, তিনি আমার মুখের ওপর বলতে না পারলে ও মনে মনে বুঝছি, তিনি মা হয়ে বিপদেই পড়েছেন তড়িৎ! কি ভয়ানক সমস্যা মা—

তড়িতার বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না, নীরবে বসে থাকে। মায়ের মনের ভাব জানতে গিয়েও অনেকখানি আঘাত নিয়েই ফিরেছে কিছুক্ষণ আগে, এবং মা ও কৃতসংকল্প হয়েছেন, বৌদিকে সরানোর জন্যে যে, তা ও বুঝেছে ভাল করেই আজ। তাই এখন পিতার কথার উত্তরে বলে—বুঝেছি বাবা, তোমাদের দুজনেরই সাম্‌নে এক সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মানুষ যতই স্নেহান্ধ হোক্, স্নেহকে বজায় রাখতে গিয়ে কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে ছোট করা উচিৎ কিনা সেটা বিবেচ্য।

একটুক্ষণ পিতার তরফ থেকে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করে পুনরায় বলে—মা-তো এক রকম কৃতসংকল্প হয়েছে দেখলুম, বৌদিকে পাঠিয়ে দিয়ে দাদার আর একটা বিয়ে হওয়াই মায়ের ইচ্ছা, এইবার তোমার মন একটু ফিরলেই বৌদির বিদায় কাজ শেষ হবে। বলে ও উঠে যায় বিরক্তির ভরে। তনবাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মেয়ের যুক্তির সারবত্তার কথা চিন্তা করেন।

(১৪)

—কেমন পরীক্ষা দিলে ঠাকুরঝি ? রমলা প্রশ্ন করে তড়িতাকে। তড়িতা আই-এ পরীক্ষা দিয়ে সবে মাত্র ঘরে এসে কাপড় জামা ছাড়ছে, খবর পেয়ে রমলা আসে এবং প্রতিদিনের মত আজও প্রশ্ন করে।

তড়িতার একটা খাতা তেমন ভাল হয়নি, মন তার বিমর্ষ ছিল, রমলার প্রশ্নের উত্তরে বিরক্ত হয়ে বলে—তোমাদের জন্যে কি ছাই ভাল করে পড়্তে পেয়েছি যে, একজামিন্ ভাল হবে? বলে বিরক্তিপূর্ণ চোখে ও চায় রমলার দিকে। দেখে' রমলা অপরাধীর মত চোখ নত করে, চোখাচোখি হতেই। কাপড় জামা বদলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ও রমলার কাছে যায় এবং ওর গলা জড়িয়ে ধরে বাঁ হাতে, ডা'ন হা'তে ওর মুখ তুলে ধরে' বলে—রাগ হল বৌদি? আদরের সুরে ওর অনেক খানি ভালবাসা ও ঝরে পড়ে। রমলার চোখে আসে জল। সে ভাব গোপন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় তড়িতার কাছে। আহত হয়ে তড়িতা বলে—ক্ষমা কর বৌদি, আমি রহস্য করেই বলেছি,—সত্যি ভেবে নিও না ভাই! তাহলে আমার মনে অনেক খানিই ব্যথা দেওয়া হবে!

রমলা বলে—না ঠাকুরঝি, সত্যি আমি ভাবিনি, তুমি আছ বলে আজও আমি এখানে এমন ভাবে থাক্‌তে পার্‌ছি ভাই! এত দুঃখেও তুমি আমায়—রমলার মুখ থেকে কথা বেরয় না আর। উদ্‌গত অশ্রু এবার চোখের বাইরে আসে। তড়িতা নিজের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে বলে—বৌদি, ভাই! কেঁদনা, তুমি কাঁদ্‌লে আমাদের বাড়ীর যে ভাই অকল্যান্ হবে—বলে ওর হাত ধরে টানে। চল আমাকে খাওয়াবে চল, সারাদিন অনাহারে আজ দেখেছ তো? বলে অন্যমনস্ক করার জন্যে নিয়ে যায় টেনে। ও জানে বৌদির অন্তরের ব্যথা কোন্ খানে এবং কতখানি। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিন থেকে ঐ তরুণীর জীবনের ওপর দিয়ে, ওর তরুণ হৃদয়ের ওপর দিয়ে কি ভয়ানক ঝড় যাচ্ছে বয়ে। স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা রমলাকে তাই সহানুভূতির চোখেই দেখে তড়িতা এবং ওর মনের ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিয়েই—রাখ্‌বার জন্যে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা যত্ন করে আসে। আজ অসতর্কতায় মুখ থেকে ওর বেরিয়ে গেছে যে কথাটি, তার জন্যে অনেক খানিই অনুতপ্ত হয় তড়িতা। খাওয়ার কাছে ও মাকে দেখতে পায় বসে থাক্‌তে। রমলা ওর হাত ছাড়িয়ে দ্রুত পায়ে চলে যায় শ্বাশুড়ীর উপস্থিতি দেখে, তড়িতা ডাক্‌তে গিয়েও থেমে যায় ব্যাপারটা বুঝে।

—বৌমা যে বড় চলে গেল? তড়িতা ঘরে ঢুক্‌তে ওর মা জিজ্ঞাসা করেন। অন্য সময় হলে তড়িতা বৌদির হয়ে যা হোক্ একটা কিছু বলে কাটিয়ে দিত। কিন্তু আজ আর তা দিল না, স্পষ্ট করেই বলে দিলে আসনে বস্‌তে বস্‌তে—তুমি যাকে চাও না, সেও তোমাকে চাইবে না মা, এই হ'ল জগতের নিয়ম। বলে মায়ের মুখের ওপর কটাক্ষ নিক্ষেপ করে খেতে সুরু করে।

মা বলেন—তা বলে নিজের ছেলের চেয়ে পরের মেয়ে, বউকে বড় করে দেখ্‌তে পার্‌ব না, তোমাদের বাপ্‌ বেটীর তমন! ফুলের জন্যেই বোঁটার সোহাগ! কিন্তু বোঁটা গলায় পরে আছ মা,—ফুল ফেলে দিয়ে। তোমার বাপের মতন বৌয়ের ওপর কর্ত্তব্য করতে গিয়ে আমি রবীন্‌কে চিরদিনের জন্যে পর করতে পার্‌বনা, সে তোমরা যতই দোষ দাও তড়িৎ, আমার মায়ের প্রাণ—চোখে ও'র জল আসে।

তড়িতা ক্ষুব্ধ হয়। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটে, তারপর তড়িতা-ই কথা কয়।—আমরা ফুল ফেলে দিয়েছি বলুছ মা, এ তোমার অন্যায় কথা—বাবার ওপর আমার ওপর তোমার এ ধারণা ভুল! তোমার কথা দিয়েই বলি, ফুল না হলে যেমন বোঁটার আদর থাকে না বল্‌লে, তেমনি এ ও তো সত্যি যে, বোঁটা না হলেও ফুলের মালা গাঁথা যায় না! বৌদিকে একদিন এনেছিলে তো তোমার ছেলের জন্যেই! দাদার গৃহলক্ষ্মী করে বরণ করে এনেছিলে, সেই পদে প্রতিষ্ঠা করতে। আজ সেই গৃহলক্ষ্মীকে বিনা দোষে বিদেয় করে দেবে কোন্‌ মুখে শুনি? বলে মায়ের মুখের উত্তরের আশায় তড়িতা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলে আজ যদি তোমার কোন জামাই তোমার কোন এক মেয়েকে ত্যাগ করে—মা তাড়াতাড়ি বাধা দেন, প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে। ষাট্‌ ষাট্‌ ও কথা বল্‌তে আছে! লেখা-পড়া শিখে তোমার এর নাম বুদ্ধি!

তড়িতা বলে—বল্‌তে নেই কেন, খুব আছে! দেখ্‌বে হয়ত আমারই তাই হবে,—একজন পরকে দুঃখ দিলে তার ফল স্বরূপ—মা বকে ওঠেন ওকি কথা! তড়িতা একটু ম্লান হেসে বলে—ঠিক কথা মা, নিজ পরিবারের কাউকে ভোগ করুতে হবে। যে মতলব

তোমরা করেছ মা, ওর ভেতর সবার সায় পাবে, পাবে না আমার আর বাবার। ছেলে যদি তোমার চাঁদ চাওয়ার মত অন্যায় আব্‌দেরে হয়, তুমি তার জন্যে চাঁদ ধর্‌তে আকাশে উঠ্‌তে পার, কিন্তু বাইশ তাতে সায় দেবে না, বাহবা ও দেবে না!

—তা কি করব তড়িৎ, আমি যে তার মা, সে আমার ছেলে, তার সব দোষই আমায় ক্ষমা করতে হবে। তুই যখন মা হ'বি,—দেখ্‌বি কত ছোট বড় দোষ রাত্রি দিন ছেলে মেয়েরা কর্‌বে, আর তুই হাসিমুখে ন্যায় অন্যায় বিচার না করেই ক্ষমা কর্‌বি,' তখন দেখ্‌বি ক্ষমা আপন মন থেকেই আস্‌বে—কেউ শিখিয়ে দেবে না, বলে দেবে না মা! ও জিনিষ ভগবানেরই দেওয়া, যেমন গর্ভে ছেলে আস্‌তেই স্তন্য—বাধা দিয়ে তড়িতা বলে—দাদার এই অন্যায় যদি তোমরা আব্‌দার বলে ধরে নিয়ে বজায় রাখ মা, তা হলে আমি কিন্তু বিয়ে করব না বলে দিচ্ছি, আর এ-ও জেনে রাখ, মা যদি হই কখনো, তোমাদের মত মাও হব না, ছেলেও চাঁদ-চাওয়া হবে না। বলে ও উঠে যায়। মা অবাক্‌ হয়ে মেয়ের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকেন।

তড়িতা আসে ওর বাবার ঘরে, এক্‌জামিনের খবর বল্‌তে।—বাবা! রতনবাবু চোখ মেলে চান্‌।—আজ পরীক্ষা কেমন হ'ল মা? মেয়েকে দেখে প্রশ্ন করেন্‌। তড়িতা পিতার বিছানায় গিয়ে বসেছে ততক্ষণ। ভাল একটুও হ'ল না বাবা। মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল, হয়ত এ সাব্‌জেক্টএ ফেল করিয়েই দেবে, নম্বর পাব না! বলে মুখ ভার করে বসে।

রতনবাবু বলেন—ও তোমার বাজে ভয় মা, সংস্কৃত তোমার এত প্রিয়, আর অন্য সব কিছুর চেয়ে তাড়াতাড়ি আয়ত্তও কর, রণেন বলে

তড়িৎ যা চমৎকার পড়ে। ওর উচ্চারণের মধ্যে এমন বিশেষত্ব দেখি যে আমাদেরও তা নেই। ওকে তাই পড়িয়ে আনন্দ পাই—বাধা দিয়ে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলে—ও রণেনদার বাজে কথা বাবা, আমায় স্নেহ করে বলে বাড়িয়ে বলেছে।

—না, পাশ ঠিক করবি, ভয় নেই মা ভয় নেই। বলে রতনবাবু মেয়ের হাতের ওপর নিজের ডান হাতখানা রাখেন স্নেহভরে।

তড়িতা বলে—বাড়ীর মধ্যে এত অশান্তি হলে কি আর পড়া হয় বাবা? বৌদির জন্যে আমার যে কি অশান্তি তা বল্‌বার নয়। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে—বাড়ী এসেই মায়ের সঙ্গে ঐ নিয়ে খানিক তর্কবিতর্ক হয়ে গেল। বৌদিকে যদি বিদেয় করেই দেওয়া হয় বাবা, তাহলে আমি বিয়ে করব না; তোমাদের পাপের শাস্তি হয়ত আমাকে পেতে হবে বলে দিয়েছি মাকে। তডিতার চোখে জল দেখা দেয়।

রতনবাবু ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন মা, সংসার ভয়ানক কঠোর পরীক্ষার স্থল। তুমি নেহাৎ ছেলে মানুষ, তাই বুঝবে না আজ—বাবা! একি পরীক্ষা? না ছেলেমানুষী, না বদ্‌মায়েসী বাবা? তুমিও আজ বৌদির জীবনের কথা ভুলে যাচ্ছ! দাদার আর একটা বিয়ে হবে, সমাজ সমর্থন করবে, আইনেও সাব্যস্ত হবে, কিন্তু বৌদি যে আমার চেয়েও ছোট, তাঁর কি হবে সেটা ভাবতে ভুলে যাচ্ছ কেন বাবা? তার আর একটা বিয়ে তো সমাজ, রাষ্ট্র কেউ সমর্থন করবে না, স্নেহের চোখে দেখবে না, জাতিচ্যুত করবে, নিন্দে রটাবে, তার সন্তানরা সমাজে ঠাই পাবে না—অথচ দাদার দ্বিতীয়বার বিয়ের বৌ, ছেলে-মেয়ে দিব্যি সচল থাকবে সমাজে কেউ আপত্তি করবে না তাদের সঙ্গে চল্‌তে।

—তড়িৎ, তোর যুক্তি অকাট্য, কিন্তু তোর বাবা তো সমাজের অচল প্রথাকে সচল করতে পারে না মা, সে ক্ষমতা দিয়ে তোর বাবাকে যদি ভগবান পাঠাত, তাহলে দোষ দিতে পারতিস্ রে! বাংলায়, হিন্দু সমাজের এ যে চিরন্তন দোষ মা, আমি কি করব তাই বল্? বড় রকমের একটা নিঃশ্বাস ফেলে একটু জিরিয়ে নিয়ে পুনরায় বলেন—এইটুকু শুধু জেনে রাখ মা, মানুষকে অনেক কাজই বাধ্য হয়ে করতে হয়। পড়েছ রামায়ণ, দেখেছ তো মা, রামচন্দ্র রাজা হয়ে ও তাঁর নিরপরাধা, প্রিয়তমা পত্নীকে বনে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন—ইচ্ছে করে নয় মা, বাধ্য হয়েই—বাবা! অকস্মাৎ রমলার কণ্ঠস্বরে পিতা পুত্রী দুজনেই চমকে ওঠেন। বিস্ময় বিমূঢ় দুজনেই এক সঙ্গে ওর দিকে চায়।

রমলা শ্বশুরের বিছানার কাছে এগিয়ে যায় একটু, তারপর সহজ ভাবে বলে—বাবা, আপনি ওখান থেকে ফিরে কেন যে আমার সঙ্গে আগের মত কথা কইছেন না, দোকানে যাচ্ছেন না, বিছানায় রাত দিন শুয়ে আছেন—সেদিন মাথা টিপতে এলাম অসুখ মনে করে—বাষ্পে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যায়। ক্ষণকাল মধ্যে সেভাব যথাসাধ্য সামলে নিয়ে বলে—বললেন তোমার কষ্ট হবে মা—বলে সরিয়ে দিলেন—কিন্তু আগে তো কোনদিন বলেন নি? সেইদিন থেকে আর এ ঘরেই আসিনি, মনে কষ্ট হয়েছে বলে, কিন্তু আজ কদিনের মধ্যে ডাকেন্ নি তো বাবা? কেন যে এমন করছেন, আজ ভাল করে বুঝেছি। তাছাড়া—মায়েরও মুখভারী আমার সঙ্গে কথা কইছেন না—ওর চোখের জল গাল বয়ে পড়ে। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে কষ্ট হয় ওর। দম্ নিয়ে এবার মিনতির সুরেই বলে—আমায় বাবার কাছে পাঠিয়ে দিন,

আমায় লুকিয়ে তো লাভ নেই বাবা! আপনি, মা, ঠাকুরঝি সবাই দেখছি শুধু আমার কাছে লুকিয়ে রাখছেন, আর নিজেরা কতখানি কষ্ট পাচ্ছেন বলুত তো? আমি আপনার এই কষ্ট আর দেখতে পারছি না বাবা—ওদিকে আমার বাবাও কষ্ট পাচ্ছেন—আমায় তার চেয়ে পাঠিয়ে দিন্, আমার এখানে থাক্‌তে আর একটু ও ভাল লাগছে না। এই দেখুন বাবার চিঠি আজও এসেছে। বলে চিঠিখানা শ্বশুরের কাছে দেয়। তারপর আবার তুলে নিয়ে বলে—আস্‌ছে শনিবার দাদাদের যে কেউ বাড়ী যাবে আমায় পাঠাবার ব্যবস্থা করুন বাবা। বলে মন্থর গতিতে রমলা চলে যায়। নির্ব্বাক পিতাপুত্রী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকেন, মুখে কথা যোগায় না।

অনেকক্ষণ পরে তড়িতার বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়। বলে—তাই পাঠিয়েই দিও বাবা, ও যখন নিজে যেতে চাইছে—তা ছাড়া বৌদির মুখের চেহারায় বেশ বুঝছি, ও যাবেই, আর যাওয়াই বোধ হয় ওর পক্ষে ভাল। তবু সেটা ওর বাপের বাড়ী, ওর আপনজনদের পাবে সেখানে—আর তোমারও দায়িত্ব অনেকটা লঘু হবে, আমাদের শান্তিই বৌদির কাম্য।

আবিষ্টের মত রতনবাবু কথাগুলো শোনেন। অনেকক্ষণ ঘর স্তব্ধ থাকে; তারপর ধীরে ধীরে বলেন—হাঁ-মা, তাই হবে, আমি যে কদিন ধরে মীমাংসার সূত্র পাচ্ছিলাম না, বৌমাকে কেমন করে হঠাৎ পাঠিয়ে দেব, কোন সুযোগের আশ্রয় নেব, তার বাড়ী থেকে তার আসন থেকে কোন্ উপায়ের সাহায্যে তাকে টলাবো, এই সমস্যার জটিল যুক্তি তর্ক জালে মন আমার সর্ব্বদা আলোড়িত হয়ে আছে, আজ বৌমা সত্যি বুদ্ধিমতীর কাজ করে গেল মা আমায়

এক মুহূর্ত্তে অব্যাহতি দিয়ে। দু'হাতে মুখ ঢেকে রতনবাবু বালকের মত কেঁদে উঠ্‌লেন।

পিতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া তড়িতাও কেঁদে ফেলে। চোখ মুখ ওর রাঙা হয়ে উঠে কেঁদে। চা ও খাবারের রেকাবী নিয়ে আজ ক'দিন পরে রমলা অসংকোচে ঘরে ঢুকে রতনবাবুর সাম্‌নে ধরে দিয়ে ডাকে—বাবা!—তড়িতার দিকে চোখ্‌ পড়্‌তে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—কি হ'ল, কাঁদ্‌ছ কেন ঠাকুরঝি? দাঁড়িয়ে যায় রমলা। জলভারাবনত দৃষ্টি তুলে তড়িতা ওর বৌদির পানে চেয়ে বলে, বৌদি! তুমি নিজের বাড়ী ছেড়ে গিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে? তড়িতার সুন্দর রঙের ওপর এক পোঁচ লাল রঙকে যেন ঢেলে দিয়েছে মাখিয়ে সমস্ত মুখের ওপর। রমলা উত্তর দিতে পারে না. নীরবে নত মুখে ধীর পায়ে ঘর থেকে চলে যায়।

(১৫)

রমলার বড়্‌দা বিপিনকে ডেকে পাঠিয়ে রমলার যাওয়ার জন্যে একটা শুভদিন পাঁজি দেখে সেদিন ঠিক করেন রতনবাবু। তারপর সংক্ষেপে সব ব্যাপারটা চোখের জলের সঙ্গেই বলেন। রবীনের এক জেদী স্বভাবের যৎপরনাস্তি নিন্দে করে এবং রমলার রূপ গুণের মুখর প্রশংসা করেই শেষ পর্য্যন্ত রতনবাবু নিরস্ত হন্‌। বিস্মিত স্তম্ভিত বিপিন রমলাকে নিয়ে যাবে বলে বিদায় নেয়, রমলার সঙ্গে দেখাও করতে পারে না, এমন মনের অবস্থা হয় ওর। তড়িতাকে বলে যায়—রমলাকে প্রস্তুত হতে বলে রাখে যেন।

তড়িতার মুখে খবর পেয়ে রমলা খানিকক্ষণ গুম্‌ হয়ে পাথরের

প্রতিমার মতন বসে থাকে। তড়িতা আর্দ্রস্বরে বলে—বৌদি, এদ্দিনের মায়া কাটিয়ে তুমি থাক্‌তে পার্‌বে সেখানে? আমি তো ভেবে পাচ্ছিনা তুমি থাক্‌বে কি করে বৌদি!

সজল হয়ে আসে রমলার চোখ।—সবই পার্‌তে হবে ঠাকুরঝি! উপায় নেই ভাই—একজনের জন্যে বাড়ীর সবাই অশান্তি পায়, একি ভা'ল?

—কিন্তু বৌদি, তোমার নিজের ঘর—আজ স্বেচ্ছায় ছেড়ে যাচ্ছ—এর পর আর কোনদিন কেউ তোমায় এর অধিকার দেবে কি?

রমলায় চোখ থেকে এবার বর্ষণ হয় অশ্রুর বান।—অধিকার এখনো তো নেই ঠাকুরঝি, তাহলে চলেই বা স্বেচ্ছায় যাব কেন? এমন অশান্তির মধ্যে আমারও ভাল লাগ্‌ছে না, তোমাদেরও নয়। এর চেয়ে সে বরং অনেক শান্তি। তবু জান্‌ব, তোমরা শান্তিতেই আছ, তোমার দাদা ও বাড়ী আস্‌ছেন—আমার জীবন শুধু দুঃখেই যাচ্ছে। কিন্তু এযে আমার জন্য সবাই দুঃখ পাচ্ছ ঠাকুরঝি! কিন্তু ভাই, চলে গেলেও তুমি যেন আমায় ভুলে যেও না ভাই। মনে করে চিঠি দিও, তবু জান্‌ব আমার বিয়ে হয়েছিল, আমার শ্বশুর বাড়ীর কেউ আছে এমন —রমলা আর বল্‌তে পারে না উচ্ছ্বসিত আবেগ অশ্রু রূপে দেখা দেয়।

তড়িতার চোখও সজল হয়ে আসে! বলে আর বল না বৌদি, শুন্‌তে পাচ্ছি না। দু'জনেই অনেকক্ষণ কাঁদে।

রমলা বলে—ঠাকুরঝি, তোমার ভালবাসার ধার ভাই জীবনে শুধ্‌তে পার্‌ব না। তোমার বিয়ের সময় থাক্‌তে পাব না এই দুঃখ, কিন্তু মনে করে চিঠি দিও। আশীর্ব্বাদ তো দূর থেকেও করা হয় ভাই, তোমাদের দু'জনকে সেখান থেকেই কর্‌ব।

. · —বৌদি! দৃঢ়স্বরে তড়িতা ডাকে। সে কণ্ঠস্বরে রমলা চমকে ওঠে। তড়িতা বলে—তুমি জেনে রাখ, তুমি যদি ফিরে না এস, আর বিয়ে আমি করব না—তুমি ফিরবে, যদি আমার কপালে বিয়ে লেখা থাকে—নিশ্চয় আবার আসবে। ম্লান মুখে রমলা বলে ছিঃ, ঠাকুরঝি, অতবড় দিব্যি কি করতে আছে? আমার জন্যে নিজের বিয়ে বন্ধ করে লাভ কি দুঃখ পেয়ে!

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তড়িতা বলে—লাভ-লোকসান হবে কিনা জানি না বৌদি, সে হিসেব খতিয়ে ও দেখিনি এখনো, হয়ত দেখব নাও কোন দিন, শুধু এইটুকুই বুঝেছি দাদার বিয়ের কল্যাণে, তোমায় দিয়ে, তোমার বিবাহিত জীবনের শোচনীয় অবস্থা দেখে—তোমার মত একটা মেয়ের জীবন যদি বিয়ে হয়ে নষ্ট হয়, তবে না হয় আমার মতন একটা মেয়ের জীবন বিয়ে না হয়েই নষ্ট হবে। মনে হয়, তোমার চেয়ে এ পথে নষ্ট হওয়া ভাল। বলতে পারিনে ঠাকুরঝি ভাল কি মন্দ। তুমি লেখা-পড়া জান, তুমি যদি ভাল বল তবে তা নিশ্চয় ভাল এইটুকুই বুঝি।

(১৬)

রমলার যাবার দিন যত এগিয়ে আসে, ততই ধূম লাগে ওর গোছান গাছানোর! বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘর নিজ হাতে ঝাড়া এবং সাজানোর বাতিক যেন চেপে বসে ওর ঘাড়ে, ভূত চাপার মত। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর ব্যবহার্য্য ঘরগুলো শেষ করে স্বামীর শোবার ও পড়বার ঘরও ঝাড়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে সকাল থেকে উঠে। ঝাড়ে সাজায় আর সকলের অলক্ষ্যে চোখের জল ফেলে। ঝিয়েরা সাহায্য করতে যায় তড়িতার

ইঙ্গিতে, কিন্তু আজ তারা তাড়া খায় প্রথম। রমলা তাদের তাড়িয়ে দেয়, ও একা-ই সব করবে।

তড়িতা ওর এত অমানুষিক পরিশ্রমে ব্যথা পায়। বলে—চলে তো যাবেই বৌদি, তাই বলে বাড়ীতে যে দুটো দিন আছ, থাকতেই মায়া কাটাচ্ছ ?

অন্যমনস্ক হয়েই উত্তর দেয় রমলা—কৈ—নাঃ। না মানে? অভিমানের সুরে তড়িতা বলে—ভূত—খাটুনী এত খাটবার তোমার দরকারটা কি ? যেখান থেকে তোমায় ধরে বেঁধে জোর করে বিদেয় করে দিচ্ছে, সেখানে তোমার এ পণ্ডশ্রম শুধু—গাড়ীতে এক-পা, বাড়ীতে এক-পা দিয়ে এতটা করায় লাভ কি,—কে তোমার গুণের আদর করছে আর কে তোমায় দেখছে ?

দেরাজটা ঝাড়ড়ে ঝাড়তে মুখ ফিরিয়ে রমলা বলে—ঠাকুরঝি, আদরের জন্মেই কি মানুষ সব করে ? চল ভাই—ওঘর খানা শেষ করি। তড়িতা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রমলার অনুসরণ করে। রবীনের পড়ার টেবিল প্রত্যেক দিন সকালে উঠে যেমন ঝাড়ে গোছায়, আজও তেমনি মনের মতন করে সাজিয়ে রাখে, দূর হতে তাড়িতা দেখে দাড়িয়ে। রমলার কাজ শেষ হলে ও ঘরের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ায় তারপর সারা ঘরখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিজের ভুল ক্রটি খোঁজে। বোধহয় পায় না, ফিরে যায় সেইখানে যেখানে দেয়ালে রবীনের ফটো টাঙানো আছে। প্রণাম করে ফটোর নীচে দেয়ালে —মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে। প্রণাম শেষ করে বলে—ঠাকুরঝি। ওঁর ফটো একখানা দেবে ? ভয়ে ভয়ে চায় তড়িতার পানে।

তড়িতার মন রমলার প্রত্যেকটি কার্য্য-কলাপ আজ নিরপেক্ষ

বিচারকের দৃষ্টি দিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করছিল এতক্ষণ, খুব মনোযোগের সঙ্গে। হঠাৎ রমলার ব্যাকুল মিনতি পূর্ণ কণ্ঠস্বরে চম্‌কে উঠে। একটু কড়া সুরেই বলে—তোমার স্বামীর ফটো আমি তোমায় দেওয়ার কর্ত্তা, এ কথা তোমায় কে বলেছে বৌদি? তোমার অধিকারের জিনিষ, তুমি ভাল মনে কর, খুলে নিয়ে যাও—কিন্তু যে জিনিষে তোমার সম্পূর্ণ দাবী আছে, সে জিনিষ তোমায় কেউ হাতে তুলে দেবে, আর তুমি তাই হাত পেতে নেবে তাতেই কি সত্যি তুমি খুব খুসী হবে?

—না তার জন্যে নয় ঠাকুরঝি, বাড়ী এসে যদি উনি রাগ করেন—ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে তড়িতা বলে—তবে তেমন লোকের ছবি না-ই নিলে। যেখানে ছবির সেই মালিকেরই রাগের ভয় কর, কিংবা কারুর হাতে তুলে দেওয়ারই অপেক্ষা থাকে—তেমন জিনিষ নিয়ে আনন্দও নেই বৌদি, আমার কথায় রাগ করলে? রমলা খুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে—না, রাগ করিনি। ও হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ধীর পায়ে চলে যায়।—ব্যথিতা তড়িতাও বিরস মুখে ওর পেছনে যায়।—বৌদি, যদি আঘাত দিয়ে থাকি ক্ষমা কর ভাই—তোমার প্রাণ চায় তোমারই জিনিষ, তুমি খুলে নিয়ে যাবে—আমি আপত্তি করবার কে? চলে যেতে যেতে তড়িতা বলে। উত্তরে রমলা বলে—থাক্ নেব না। এবার ও নিজের জামা কাপড়ের আলমারি খুলে গোছাতে বসে গিয়ে। তড়িতা কাছেই একখানা টুলে বসে। রমলা সুষ্ঠু করে সব গুছিয়ে পাট করে তুলে চাবী বন্ধ করে। ওর বাপের বাড়ীর দেওয়া দু'চারখানা কাপড় জামা যা, তাই শুধু নেয় একটা ছোট ট্রাঙ্কে। তড়িতা বলতে যায়, গিয়েও বলে না, বৌদির যে প্রতিজ্ঞা, তা ভঙ্গ করায় কাজ কি।

রমলা এবার শ্বাশুড়ীর আহ্নিকের ঘর ও ভাঁড়ার ঘর নিয়ে পড়ে। চোখের জল গোপন করে গিন্নী বলেন—কেন বাপু আজ এত কষ্ট করা, কাল চলে যাবে—রমলার চোখের কানায় কানায় হৃদয়ের বেদনার রাশি সঞ্চিত হয়ে আসে অশ্রুরূপে। বলে—দিয়ে যাই মা, তবু মনে থাক্‌বে দু'দিন—গিন্নী আঁচলে চোখ মুছে চলে যান্ সেখান থেকে।

সারা বাড়ীখানায় যেন রমলার চির বিদায়ের বাণী সূচিত হয়। বাড়ীর প্রত্যেকটি অধিবাসীর মন বিক্ষিপ্ত, রতনবাবু ও তড়িতা মুহ্যমান।

যাবার সময় রমলা যায় শ্বশুরের ঘরে, প্রণাম কর্‌তে। রতনবাবু মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিলেন, রমলা ডাকে—বাবা! চলে যাচ্ছি, মাথা তুলুন! বিছানার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায় রমলা।

রণেন এসে তাড়া দেয়, দেরী হয়ে যাচ্ছে বৌদি, বিপিনদা নীচে অপেক্ষা করছেন। রতন বাবু উঠে বসেন রমলা রণেনকে দেখে ঘোম্‌টা একটু বাড়িয়ে দেয়। তারপর গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করে। রতনবাবু ওকে আশীর্ব্বাদ করতে হাত তোলেন—কম্পিত হাতখানা এসে রমলার প্রণামরত মাথার ওপর অনেকক্ষণ থাকে, তারপর তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ওঠেন,—বউমা! মা আমার! রমলাও তেমনিভাবে কেঁদে ফেলে।—বাবা! ও শ্বশুরের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে' পা-দুটো প্রাণ-পণে চেপে ধরে কাঁদে। রণেন ও তড়িতা অশ্রুপূর্ণ চোখে অদূরে দাঁড়িয়ে সেই নির্ম্মম বিদায় দৃশ্য নির্ব্বাক হয়ে দেখে। রতনবাবু পুত্রবধুর মাথার ওপর নিজের মাথা রাখেন।

একটু পরে মাথা তুলে রতনবাবু রণেনকে বলেন বিপিনকে ডাক তো। বিপিন এসে দাঁড়ায় এবং রমলাকে কাঁদ্‌তে দেখে ওর চোখেও জল আসে। কিন্তু সে ভাব গোপন করে ডাকে—রমা, কেঁদে লাভ

নেই বোন্, যেতেই যখন হবে আর মায়া বাড়িয়ে কি হবে বল! মনে করে নাও দুদিন বেড়াতে এসেছিলে পরের বাড়ী—এস গাড়ী পাব না এর পর—ক্ষোভে দুঃখে বিপিন আত্মবিস্মৃত হয়ে কথাগুলো বলে, চলে যাবার উপক্রম করতেই, রতনবাবু ডাকেন নিতান্ত অনিচ্ছাতেই বিপিনকে যেতে হয় কাছে ওঁর। উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে ওর হাত ধরে রতনবাবু বলেন বিপিন! রবীনের স্নেহান্ধ বাপ্‌কে ক্ষমা করতে যদি পার তোমরা, ক্ষমা কর বাবা। আমার নিষ্ঠুর নিয়তি বুড়ো বয়সে আমায় অধর্ম করতে বাধ্য করছে, তাই আজ সোনার সীতা বিসর্জন দিচ্ছি—সাধ করে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম—রতনবাবুর ঠোঁট কাঁপতে থাকে গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। সে ভাব অতি কষ্টে দমন করে বলেন—এই পাপের জন্যে আজও বেঁচে আছি বাবা, আমি এনেছিলাম, তাই আমাকেই তোমাদের হাতে প্রত্যর্পণ করতে হচ্ছে আজ। কিন্তু যদি এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত বলে কিছু করতে দাও তোমরা—বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর কিয়ৎক্ষণ পর পরিষ্কার করে বলেন—তোমার বাবার অবস্থাও বুঝছি বিপিন, কি ভয়ানক আঘাত পাবেন—কিন্তু আমি নিতান্ত নিরুপায়! হয়ত তিনি এ আঘাত আমার মত সহ্য করতেও পারবেন না—তবু আমায় আজ স্বার্থপর সাজতে হ'ল বাবা! পুত্রের কামনা করে লোকে, যারা করে বিপিন, তারা আজ আমায় দেখে এই শিক্ষা করুক—কি কঠোর হতে হয় পুত্রের পিতাকে—কত বড় অন্যায় করতে হয় বিবেকের বিরুদ্ধে—ওঃ! রমলার দিকে চেয়ে বলেন—মা আমায় ক্ষমা কর, তোমার বুড়ো শ্বশুরকে, হয়ত আর দেখা হবে না মা—তোমার বাবাকে বল, যদি তাঁর মনে ক্ষমা আসে যেন করেন—রতনবাবু বিছানায় ধপাস্ করে শুয়ে পড়েন সশব্দে।

বিপিন মুক্তি পেয়ে বলে—আর একটুও সময় নেই রমা—হাতের ঘড়ির দিকে চেয়েই দুপদাপ শব্দে নেমে যায়। রমলা আর একবার প্রণাম করে. বলে—আসি বাবা! মুখ না তুলেই রতনবাবু বলেন, মাসে মাসে আমি তোমার নামে টাকা পাঠাব মা, নিতে যেন আপত্তি করে, কি ফিরিয়ে দিয়ে, যেন বুড়োর অপমান করনা মা!

রমলা কাতর কণ্ঠে বলে—বাবা, আপনার স্নেহ হারিয়ে টাকা নিয়ে কি করব বাবা? আপনি যদি পাঠান. নিতে আমায় হবেই—কিন্তু আপনার দেওয়া টাকা তো আপনার মত ভালবাসতে আমায় পারবে না বাবা! বাবার কাছে শুনেছি, মানুষেই নাকি টাকা ভালবাসে, টাকা নাকি ভাল বাসতে পারে না মানুষকে—বুঝেছি বউমা, টাকা তুমি নেবে না—রণেন তড়িতাকে বলে বৌদিকে গাড়ীতে তুলে দিবি চল্, সত্যি আর একটুও সময় নেই—রমলা পা ফেলে ঘরের বাইরে, ওর জন্যে পূজার নির্মাল্য হাতে দাঁড়িয়ে ওর শ্বাশুড়ীকে দেখে এবং প্রণাম করে। তিনি রমলাকে আশীর্বাদ করে আঁচলের খুঁটে সে গুলো বেধে দিয়ে বলেন—এস, পূজোর ঘরে গিয়ে পূর্ণ ঘট দেখে ঠাকুর প্রণাম করে—কথা বেধে যায়। রমলা শ্বাশুড়ীর আদেশ পালন করতে যায় তাঁর সঙ্গে। ঝিয়েরা পায়ের ধুলো নিয়ে বলে—বৌদিদি শীগ্‌গীর আসবেন যেন। রমলার পা ওঠে না চলৎশক্তি হীন হয়ে পড়ে, রণেন ওর আগে আগে যায় তাগাদা দিতে দিতে।

শ্বাশুড়ীও সঙ্গে আসেন।—গয়নাগুলো নিয়ে গেলে হত বৌমা, শুধু শাঁখা হাতে—না মা শাঁখা বজায় থাক্, গয়না আর কি হবে? যা ফেলে যাচ্ছি এখানে, তার কাছে কি গয়না বড়? নীচে থেকে ওর বড়দা বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলে—আমি চল্লাম, একে আজ

শনিবার ট্রেনে ভিড় হবে—তারপর মোটে সাঁয়ত্রিশ মিনিট সময় আছে—

তড়িতা পাথরের মত নিস্পন্দ হয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, রমলা তাড়াতাড়ি চল্‌তে গিয়ে হোঁচট লেগে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে যেতেই, তড়িতা ছুটে এসে হাত ধরে ওঠায়।—বেশী লাগ্‌ল নাকি বৌদি? লাগেনি। তারপর বলে—বাধা পড়ল, ওঁর ঘরে যাই নি বলেই বোধ হয়। আপন মনেই কতকটা বলে ও।—এস ঠাকুরঝি, প্রণাম করে যাই।—তুমি যাও তোমার গুরুদেবকে প্রণাম করে এস, আমি গিয়ে কি করব! গম্ভীর হয়ে তড়িতা বলে।

—আজ যাবার দিনেও তুমি এমনি করে বলবে? অশ্রুসিক্ত চোখে রমলা একাই হন্ হন্ করে যায় রবীনের ঘরে। রবীনের পড়ার টেবিলে রাখা ছোট ফটোখানার সামনে প্রণাম করে উঠে বলে—আমি চললাম তুমি সুখী হও যেন। বাইরে আসতেই দেখে—তড়িতা কাঁদছে।—ঠাকুরঝি! চললাম ভাই—বলে ওর মাথাটা বুকে টেনে নেয় রমলা। যাবার সময় আর মায়া বাড়িয়ো না এস। বলে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে নীচে নামে। সিঁড়িতে নাম্‌তে নাম্‌তে শোনে—রমলা যেন ভাড়া গাড়ীতে যায় না রণেন। ঘরের গাড়ী করে ঘরের লক্ষ্মীকে তুলে দিয়ে এস তোমরা গিয়ে।

রণেন তখন নীচে চলে গেছে। রমলা চোখের জলে অন্ধপ্রায় হয়ে শেষ দেখা একবার দেখে নেয় বাড়ীখানা। তারপর গাড়ী ছেড়ে দিলে ও খুব এক চোট কেঁদে ওঠে।—বড়দা! বিপিন ও রণেন সাময়িক সান্ত্বনা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

রমলাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এসে তড়িতা নিজের ঘরের দরজা

বন্ধ করে, ওর পরিত্যক্ত বালিশটার ওপর ওপুড় হয়ে পড়ে কাঁদে। দাদা যদি আজ সামনে থাকত? খাওয়ার জন্যে বার বার ডাক্ পড়ে ওঠেনা ও, শেষে বিরক্ত হয়ে বলে—যাবনা মাকে বলগে যাও। ঝি চলে যায়। ওর প্রচণ্ড রাগ পড়ে গিয়ে মায়ের ওপর—কেন এতই একবারে ছেলের আবদার কি—নাই বা এল বাড়ীতে?

ঢং ঢং করে চারটে বাজে ঘড়িতে—তড়িতা দরজা খুলে যায় ওর বাপের ঘরে। তোমায় আজ ওষুধ দিতে ভুলে গেছি বাবা। ওর গলার আওয়াজ পেয়ে রতনবাবু বলেন—তা তো ভুলেছ মা, কিন্তু খাওনি কেন? সে কথার উত্তর না দিয়ে বেদানা ছাড়িয়ে প্লেটে করে আনে এক হাতে, অপর হাতে ওষুধ নিয়ে বিছানার কাছের ছোট টিপয়ের ওপর রেখে দাঁড়ায়। বাবা! ওঠ, ওষুধ এনেছি।

রতনবাবু নেহাৎ অনিচ্ছাতেই উঠে বসেন এবং সুশীল বালকের মতন ওষুধ খান। তড়িতা ওষুধ খাইয়ে পিতার মাথার কাছে গিয়ে বসে। অনেকক্ষণ পরে পিতার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—বাবা! বৌদি গিয়ে যে টীকতে পারছিনে—রতনবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন শুধু। বাড়ীখানা সত্যিই যেন অনেকখানি নিঝুম্, থম্ থমে, শোকের ও বেদনার ভারে কয়েকদিন বেশ ভারী হয়েই থাকে।

(১৭)

মেয়ে যেদিন শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে আসতে বাধ্য হল, সেদিন দীনেশ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হওয়ার মতই সারা বাড়ীটা স্তব্ধ অনড় হয়ে পড়ল—মুহূর্ত্তে। সবার মুখেই এই নিদারুন আঘাতের চিহ্ন পরিস্ফুট হতে দেখা গেল।

কন্যাদায় মুক্ত চক্রবর্ত্তী মশাই আজ আবার নতুন করে দায় অনুভব করলেন।

গিন্নী পরলোকগতা, এবং নিজেও ওপারের টিকিট্ কেটে বসে আছেন, মাত্র ঘণ্টা পড়বার অপেক্ষা। শেষ, বৃদ্ধ বয়সের মেয়ে রমলা, তাই তার বিয়ে দিতে অনেক ধার কর্জ করে বসতবাড়ী ধানের জমি প্রভৃতি বাঁধা দিয়ে মাতৃহীনা রমলাকে সুপাত্রের হাতেই দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে পাত্র বাছাই করেছিলেন কন্যাদানের জন্যে, সে বাছাই করার মধ্যে ভুল কোথাও ছিল না, এক মাত্র মেয়ের শিক্ষা ও কৃষ্টির দিকটাই কেবল মেলানোর কথা ভাবেন নি। তাই আজ বৃদ্ধ অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন।

ছেলের পক্ষ থেকেও শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে সে সময় কোন কথা ওঠেনি। কারণ রতনবাবু প্রচুর ধনের অধিকারী এমন কি সহরের বুকে বাড়ী, গাড়ী, ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি ও তাঁর যেমন, সেই সঙ্গে উদারতারও তিনি অধিকারী অনেকখানি। তাই উদার পন্থী রতনবাবু একমাত্র ছেলে রবীনের বিয়ে দিয়ে টাকা উপার্জন করবার চেষ্টাও করেন নি, টাকার চেয়ে বৌকেই বড় করে দেখেছিলেন এবং রবীনের সহপাঠি ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিজনের ছোট বোন্ রমলাকে দেখেই পছন্দ হয়েছিল বলে, তাকেই পুত্রবধূপদে বরণ করে এনেছিলেন।

লোকে কথায় বলে—সুখের ঘরেই রূপ বাস করে। কিন্তু তা সব সময় নয়, অনেক গরীবের ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরেও এমন অনেক সুন্দর মেয়ে দেখা যায়, যাকে রাজা-মহারাজার ঘরেই মানায়। রমলারও অসাধারণ রূপ—গৃহস্থ দীনেশ চক্রবর্ত্তীর ঘরের উপযুক্ত তো নয়ই, এমন কোন সাধারণ ঘরেও তাকে যে মানাবে না বৃদ্ধ পিতা তা বুঝেছিলেন।

তাই তিনি মেয়ের বিয়ের জন্যে রীতিমত ভেবেছিলেন, এবং বিজনের প্রস্তাবে খুব আনন্দ প্রকাশ করেই বিদ্বান্, সুরুচি-সম্পন্ন আধুনিক তরুণ যুবক রবীনের হাতে মেয়েকে সম্প্রদান করতে সাধ্যাতীত খরচ করে বর পক্ষের সম্মান রক্ষা করেছিলেন।

আজ দীর্ঘ দেড বছর পরে রমলাকে চিরদিনের জন্যে ফিরে আসতে দেখে বৃদ্ধার স্নেহময় পিতৃ হৃদয় অব্যক্ত বেদনায় টন্ টন্ করে ওঠে। দীনেশ চক্রবর্তী বড ছেলে বিপিনের মুখে এই খবর পেয়ে ভেঙে পড়েন। সমস্ত বাডীখানা এক মুহূর্ত্তে হয়ে উঠ্ল বেদনায় আচ্ছন্ন—সব চেয়ে কষ্টকর ব্যাপার হয় যত প্রতিবেশীদের উৎপাতে। পাড়ার অনাহুত প্রতিবেশীদের নানা রকম জটলা আর কূট প্রশ্নে, জেরায় ও বিজ্ঞের মতন নিজের নিজের মন গড়া মন্তব্যে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। দুঃখ বা দৈন্যের প্রবল ধাক্কায় মানুষ যখন প্রচণ্ডভাবে আহত হয়, টাল সামলে ওঠা কঠিন হয়ে পডে—সে সময় বাংলার সমাজের কাছে মানুষ কি পায়, না মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। সহানুভূতির নাম গন্ধ ও থাকে না,—অথচ মানুষ মাত্রেরই সুখ দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ করা নৈমিত্তিক। কিন্তু তবু পরশ্রীকাতর বাংলার প্রত্যেক মানুষ-ই অন্যের দুঃখ দৈন্যে বুক পেতে দিতে পারে না, সত্যিকার অন্তরঙ্গতা তাদের আসে না—আসে মজা দেখার হীন প্রবৃত্তি। বিশেষ করে পল্লীগ্রামে ও ছোট-খাট জায়গায়, সহরতলীতে, যেখানে মানুষের কাজ নেহাৎ কম, বা নেই—পুরুষরা দাবা-পাশা খেলে আর পরের পুকুরে মাছ ধরে বেড়ায় কিংবা কোন মুদীখানার দোকানের ঘরের দাওয়ায় নয়ত কোন গয়লার উঠোনে চ্যাটা বিছিয়ে আড্ডা দিয়ে বাডী ফিরে, খেয়ে ঘুম দেয়, আর সকালে উঠেই, হয় দাতন করতে করতে, নয় হুঁকো হাতে গোটা পাড়াখানা

প্রদক্ষিণ করে বেড়ায়, কোথায় কার বাড়ী কি হচ্ছে না হচ্ছে খোঁজ খবর নিয়ে, সে সব দেশের কর্মবিমুখ পুরুষরাও সাধারণ মেয়েদের চেয়ে কিছু কম নয়। পরচর্চা—পর নিন্দা নিয়েই তারা জীবন কাটায়। রমলার অকস্মাৎ ভাগ্য বিপর্য্যয়ের খবর পেয়ে পরের দিন দলে দলে হিতৈষীরা আসে। যে সব লোকের যাতায়াত বেশী এ বাড়ীতে, তাদের মারফৎ খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। জিয়াগঞ্জ ছোট জায়গা এবং আধ্ পাড়া-গাঁ আধ-সহর হলেও দুটো দিকই ওখানকার অধিবাসীরা বজায় রাখতে অভ্যস্ত।

রমলা সেদিন রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে-ই পিতৃগৃহে আসে এবং সব শোন্‌বার পর দীনেশ চক্রবর্ত্তী মেয়েদের মতই আর্ত্তনাদ করে ওঠেন—মেয়েটার আমার কি হল বিপিন! ওর জীবন এমন করেই নষ্ট করে দিলে হতভাগাটা! বিপিনের নির্ব্বাক ও নিঃস্পন্দ দেহখানা কাঠের মতই অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পিতাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কথাও মনে আসে না। পেছনে অপরাধীর মত নত মুখে দাঁড়িয়ে রমলা, সেও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

ঘটনাটি এতই আকস্মিক যে, বিস্ময়ের শেষ মাত্রাটি কেউ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না। বিপিনের মুখে রবীনের অপছন্দের কারণটার লঘুত্বের সংবাদে দীনেশ চক্রবর্ত্তী একবারে রাগে ক্ষেপে ওঠেন।—যত সব বদমাইশ, যেন নিজে কত একেবারে লাটসাহেব, তাই অল্প শিক্ষিত মেয়ে নিয়ে তিনি ঘর কর্‌তে পারবেন না! শ্বশুরের চেঁচানির আওয়াজ পেয়ে লতিকা ও নমিতা দরজার পাশ থেকে উঁকি ঝুঁকি দেয় কিন্তু ব্যাপারটা এতই অতর্কিত যে বুঝে উঠ্‌তে সহজে কেউ পারেনা। বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে যায় ওরা বিপিনের সঙ্গে রমলাকে দেখে।

অনেকক্ষণ পরে বিপিনকে রমলার হাত ধরে বাড়ীর ভেতর আসতে

দেখে ওরা সরে আসে দুজনে। বিপিন চলৎ শক্তিহীনা রমলার হাত ধরে এদিকে এসে ডাকে, বড় বৌ! লতিকা সামনে যায়, বিপিন রমলার হাতখানা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে বলে—বড় বৌ, আজ থেকে রমলার সব ভার তোমার ওপর দিচ্ছি—বড় বৌ নামের যেন অপমান করনা তুমি নিজে, আর আমায় ভাংচি দিয়েও করিওনা কোনদিন। রমলার সব ভার এখন থেকে আমাদেরই। মেজ বৌমা, তোমাকেও বলছি—রমা আজ কত বড় বাড়ী থেকে, কত সুখ ঐশ্বর্য্যের কোল থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হল—বিপিনের চোখে টল্ টল্ কর্‌তে দেখা যায় জল, কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে, সেটুকু যথা সম্ভব সামলে নিয়ে বলে—নারী জীবনের সব সুখ শান্তিকে তাদের বাড়ীর চৌকাঠের ওদিকে রেখে নিয়ে এল অনন্ত দৈন্য—আইবুড় বেলার চির পরিচিত ঘরে—তোমরা তার ওপর যেন কোনদিন অতিষ্ঠ করনা বড় বৌ, তোমরা ওকে আগের মত স্নেহ কর্‌বে,—মনে করো বিয়ে ওর হয়নি, চির কুমারীই আছে, এই অনুরোধ রইল তোমাদের ওপর—ওর কণ্ঠস্বর ভারী, চোখ ছল ছলে। ঘোম্‌টার্ ভেতর থেকে নমিতা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়, লতিকা নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গলা ঝেড়ে কণ্ঠের আড়ষ্টতা দূর করে নিয়ে রমলাকে বলে—তুইও ভুলে যা বোন্, তোর বিয়ের কথা! যে কটা দিন তাদের বাড়ী কাটিয়ে এলি—মনে কর সে তোর জীবনের একটা মস্ত—দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন—রমলা না পারে কারুর দিকে সহজভাবে চাইতে না পারে সরে যেতে। অপরাধীর মত মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, লজ্জায় ঘৃণায় সমস্ত শরীর ওর কাঁপে, বিপিন চলে যেতেই রমলা ওর বৌদির হাত ছাড়িয়ে কোন রকমে ছুটে পালায় ওর মায়ের ঘরে; যে ঘরে ওর মা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। আজ মায়ের জন্যে রমলার মন সবচেয়ে

ব্যাকুল হয়। এত বড় দুঃখের কে নেবে অংশ? সেই ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রমলা অনেকক্ষণ কাঁদে। বাইরের ঘরে ওর বাবাও চৌকীর ওপর তাকিয়া বুকে লয়ে আর্ত্তনাদ করেন—সন্ধ্যার পর দাবার আসরের খেলোয়াড়রা এসে ডেকে ফিরে যায়, সাড়া শব্দহীন নীরব বাড়ীখানা প্রেতের মত দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। বিপিন সেই যে গিয়ে ঘরে শুয়েছে আর ওঠে না খেতে পর্য্যন্ত। নমিতা সব ছেলে মেয়েগুলোকে খাওয়ানো ঘুম পাড়ানো নিয়ে ব্যস্ত। গাই দুয়ে এনে গোয়ালা ডেকে ডেকে চলে যায়, লতিকা একবার শ্বশুরকে একবার স্বামীকে ডেকে খাওয়ার ও শোবার জন্যে এঘর ওঘর করছে। সে রাত্রির ঝড় যেন চক্রবর্ত্তীর বাড়ীখানার প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার প্রচণ্ড দাপট ছড়িয়ে মাতামাতি করছে, তাই বাড়ীর সবাই তার বিক্রমে স্তব্ধ।

পরের দিন সকাল হতেই অনেকে আসে একটি অহেতুক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে। সহানুভূতি ও মৌখিক সান্ত্বনা বাক্য বর্ষণ করে এবং রমলাকে দেখ্‌বার ধূম পড়ে আজ আবার নতুন করে। সে যেন সত্যিই আজ নতুন হয়ে এসেছে কিংবা মস্ত দ্রষ্টব্য সে। কিন্তু মেয়ে মহলকে হতাশ হয়েই ফিরতে হয়, রমলার দেখা মেলে না, রমলা ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়ে আত্ম গোপন করে থাকে, লোকের সামনে বেরুতে কি মুখ দেখাতে পারে না, চায় না—স্বামীর অবহেলার লজ্জা নিয়ে কারুর সামনে পড়তে। কিন্তু পাড়ার লোকের হল মজা দেখা স্বভাব—তারা চায় হুজুগ, তাই দিনে দশবার আসে ঘুরে ফিরে, আসল কারণটা রমলার কাছেই শুনতে, তাই মুখে অনেকখানিই দরদ নিয়ে দেখতে চায় রমলাকে। কিন্তু তা আর হয়না, রমলা বন্ধ ঘরে পড়ে আজ সব প্রথম ভাল করে দুঃখটা বোঝে।

(১৮)

—রমলা !—কেন বাবা ?—আমার অবর্ত্তমানে তোর কি হবে মা ? কেন বাবা, দাদারা, বৌদিরা আর ভগবান দেখবে।

—তুই ঠিক জানিস্ ওরা দেখ্‌বে ? উচ্ছ্বসিত হয়ে দীনেশ চক্রবর্ত্তী কেঁদে ফেলেন।

রমলা প্রাণপণে অশ্রুদমন করে বলে—তুমি অত উতলা হয়ো না বাবা, যিনি এতবড় পৃথিবীকে দেখ্‌ছেন, তিনিই তোমার মেয়েকেও দেখ্‌বেন। কেন তুমিই তো চিরদিন বলে আস্‌ছ বাবা, তবে আজ বিশ্বাস হারাচ্ছ কেন ? ভাব্‌ছই বা কেন ?

—তোর বাবা যে মানুষ রমা, এ কথা ভুলে কেন যাচ্ছিস্ মা ? মানুষ না ভেবে পারে না, ভাব্‌তে তাকে হয় যে—মানুষকে শুধু ভাব্‌বার অধিকার টুকুই দিয়েছেন তিনি, প্রতিকারের ক্ষমতা দেন্‌নি মা ! সে কল্‌কাঠিটি নিজের হাতেই রেখেছেন। না হলে তোর বাবা কি আজ এই অবস্থা তোর হতে দেয় ?

উত্তরে রমলা বলে—তোমার হাতে যখন সে ক্ষমতা নেই—তখন মিছিমিছি এই রোগা শরীরে ভেবে কি হবে বল ? যাঁর হাতে পৃথিবী চালাবার ক্ষমতা রয়েছে, তারই হাতে আমার ভার দিয়ে দাও বাবা !

মেয়ের কথায় দীনেশ চক্রবর্ত্তী সকরুণ হাসি হেসে ওঠেন।—তাই যদি দেওয়া যেত, তা হলে তো ভালই হত মা—তোর বাবার মন অনেক খানি হাল্‌কা হত, কিন্তু মানুষরা বোধ হয় কেউ তা পারে না—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন সজোরে।

রমলার মন অনেক খানি ব্যথা পায় বলে—বাবা, তোমরা কি তাদের কথা ভুলে যেতে দেবে না আমায়? যারা আমায় চায় না, আমরাই বা কেন তাদের কথায় সময় নষ্ট করব। তার চেয়ে রামায়ণ পড়ি শোন—বলে বই খানা কুলুঙ্গি থেকে নিয়ে এসে চিহ্নিত পাতাটা খুল্‌তে খুল্‌তে বলে—আজ যে কি হয়েছে—বাধা দিয়ে দীনেশ চক্রবর্ত্তী বলেন—রমা, তোর বাবার বুকে সমুদ্র উথ্‌লে আছে রাত্‌ দিন—

রমলা একটু অভিমানের সুরে বলে—তাহলে আমি উঠে যাব বাবা—খালি খালি যদি পরের কথা বল—পড়্‌ তুই আর বল্‌ব না, বলে মেয়ের মন তুষ্ট করবার জন্যে রামায়ণ শুন্‌তে আগ্রহ করেন পিতা।

রমলা পড়্‌তে সুরু করে। এমন সময় তিন চারটি ছোট ছেলে মেয়ে হুড়োমুড়ি কর্‌তে কর্‌তে দৌড়ে আসে ঘরে।—পিসিমা! আজ খুব ভাল দেখে একটা গল্প বল্‌তে হবে—না বল্‌লে আর কিছুতেই ঘুমুব না—রোজ রোজ তোমার কাল বল্‌ব আর হচ্চে না—বলে মহা কলরব কর্‌তে কর্‌তে গিয়ে পড়ে রমলার গায়ের ওপর।

শশব্যস্তে বই খানা মুড়ে কোন রকমে ওদের হাত থেকে সাম্‌লে রেখে বলে—বল্‌ছি রে বাপু ছেড়ে দে—বাদুড় ঝোলা করে সবাই ওর গায়ে ও পিঠে ঝুল্‌তে থাকে। চৌকী খানা দুলে ওঠে, কেউ কেউ লাফিয়ে উঠে পড়ে পিসিমার গায়ে এবং কোলের ওপর। রমলা ব্যস্ত হয়ে বলে—বল্‌ছি বল্‌ব, তবু জ্বালাতন করছিস্‌ কেন—বলে কাছে ওদের টেনে নিয়ে সস্নেহে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে—ভারি দুষ্টু হচ্ছিস্‌ তোরা,—একজন বলে ওঠে—তা হইগে যাই—গল্প বলে খাইয়ে দেবে চল। আর সবাই সেই ধুয়োই ধরে।—চল, ওঠ বল্‌ছি শীগ্‌গীর—রমলা না হেসে পারে না, হাস্‌তে হাস্‌তে বলে—

লক্ষ্মী-সোনা-ধন-আমার, আজ ও গল্প বল্‌তে পারব না, মায়ের কি কাকীমার কাছে খেয়ে শোও গে যাও—দেখ্‌ছ তো—তোমার দাদামনির অসুখ সারেনি, এখানে গোলমাল করে চৌকী নড়িয়ে কষ্ট দিচ্ছ দাদাকে, তা হলে গল্প একদিনও বল্‌ব না—বায়না ধরে ওরা।—তোমার পায়ে পড়ি পিসিমা, তবে শুধু খাইয়েই দাও আজ—কদ্দিন খাইয়ে দাও নি বাবাঃ! বলে রমলার মেজদার মেয়ে অলকা দাদুকে সাক্ষী মানে।—দেখ্‌ছ দাদামণি, তুমি—অভিমানে ঠোঁট ওর ফুলে ওঠে। দীনেশ চক্রবর্ত্তী ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকেন—এস দিদিমণি, আমি গল্প বলি। সবাই যায় আগ্রহ করে, যায় না শুধু অলকা। সে রমলার আঁচল ধরে বায়না করে—চলনা পিসিমা, গল্প বলে খাইয়ে দেবে? রমলা স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলে—তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয়, সে বসুক তোর দাদামণির কাছে, আমি যাচ্ছি।

অলকা বলে রেগে উঠে,—পার্‌ব না, যাও—আড়ি। ওরা ওদিকে দাদামণির কাছে গল্প শুন্‌তে খুব জাঁকিয়ে বসেছে, গল্পের মাঝখানে ডাকেন—আয় রে অলকাদিদি, আমি কত ভাল ভাল গল্প জানি শুন্‌বি আয় এদিকে। তোর পিসিমা আর কি জানে! বলে নাত্‌নীকে ডাকেন দীনেশবাবু।

অলকা বব্ করা চুল শুদ্ধু ঝাঁক্‌ড়া মাথাটা সজোরে নেড়ে বলে—ধ্যেৎ—তুমি যা ভাল গল্প জান সে আমি জানি—

হেসে ফেলেন নাত্‌নীর কথায় বৃদ্ধ। কি জানিস্ বল্? টুন্‌কু, অশোকা ওরাও খুব হাসে দাদামণির সঙ্গে যোগ দিয়ে। অলকা আরো রেগে যায়। বলে—তোমার সেই ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্প আর কাঠের ঘোড়া—কাঠের ঘুড়ি জল পি-পি-র গল্প, ও আমি আর

শুনব না। পিতা-পুত্রী দুজনেই হেসে ওঠেন। টুনকু বলে দাদামণি, তুমি আমাদের বল—ও না শুনুগ্-গে—

অগত্যা রমলাকে গল্প বলার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। বলে—বায়নাদার মেয়ে কোথাকার। শোন্ বল্‌ছি গল্প। ব'লে আরম্ভ করে, ওদিকের দল্‌টি ভেঙে এদিকে আসে, পিসিমার কাছে গল্প শুন্‌তে।

ওদের নিয়েই রমলার দিন রাতের বেশীর ভাগ সময় কাটে। পিসিমা অন্ত-প্রাণ, বুন্টু-টুনকু-অলকা, অশোকা এই কটি ছেলে মেয়ের। গল্পের মাঝে প'ড়ে বাধা।—তোদের কি খাবার সময় হয়নি? বলে বড় বৌ ঘরের দরজার কাছ থেকে উঁকি দেন।

—যাচ্ছি মা, এইটুকু শুনেই যাচ্ছি—ব'লে রমলাকে বলে—তাড়াতাড়ি বলে নাওনা পিসিমা. মা-যে আবার বকবে। বলে অলকা তাড়া দেয় পিসিমাকে?

বড়বৌ তখন চৌকির অন্যধারে শ্বশুরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।—বাবা, আপনার খই-দুধ এনে দিই?

উত্তরে দীনেশবাবু বলেন—এর মধ্যেই দেবে বৌমা, এত সকাল খেলে যে রাত কাটে না মা।

—আচ্ছা বাবা, আর একটু পরেই দেব। আয় তোরা, নইলে নমিতা এখুনি বক্‌বে, মেরে ধরে নিয়ে যাবে, তুমিই না হয় খাইয়ে দাও গে, আমি বস্‌ছি বাবার কাছে ততক্ষণ, না হলে তো দেখ্‌ছি আজ আর খাওয়া হবে না—ঘুমিয়ে পড়্‌বে।

লতিকার কথায় বালক বালিকারা আনন্দে নেচে ওঠে, বিপুল কোলাহল ক'রে কেউ রমলার হাত, কেউ কাপড় ধরে টানাটানি করে।—চল পিসিমা চল, কদ্দিন যে তুমি খাইয়ে দাওনি—দুপদাপ্

করে চৌকি থেকে নেমে পড়ে সবাই মিলে, রমলা হাসে আর বলে—ওরে আস্তে নাম্, দাদামনির যে অসুখ—তোরা শব্দ করে লাফালাফি করে চৌকি নড়িয়ে দিচ্ছিস্! ব'লে রমলা স্নেহের মৃদু শাসন করে। কিন্তু কে শোনে তার কথা! ওরা তখন পুলক আতিশয্যে দিশেহারা।

বৌদি, এদের ভাত দাও—বল্‌তে বল্‌তে রান্নাঘরের দাওয়ায় শিশু পরিবৃতা রমলা এসে দাঁড়ায়। ওরা বাদুড় ঝোলা করে রমলার গায়ে পিঠে চারিদিকে বেষ্টন করে ঝোলে। রান্নাঘর থেকে ভাতের থালা হাতে বেরিয়ে আসে নমিতা, বক্‌তে বক্‌তে। লেখা পড়ার নাম নেই—

রমলা মৃদু ধমক দেয়, ভারী সব দুষ্টু হয়েছে বৌদি, নে খেয়ে নে শীগ্‌গীর, ঐ দেখ্—নমিতা তর্জন করে বলে—দেখ না ঠাকুরঝি, সাধে কি রাগ হয়, সন্ধ্যে হতেই সব গল্প গিলবে—পাছে পড়্‌তে হয়, তাই আমার কাছে যাবে না—গল্প শোনা আর হয়না, চুপচাপ খেতে হয়। নমিতাও এসে বসে সাম্‌নে।—তুমিই ওদের মাথায় তুলেছ ঠাকুরঝি, আদর দিয়ে দিয়ে একবারে নাড়ুয়া গোপাল তৈরী হয়েছে! ধাড়ীদের আবার খাইয়ে দেওয়া কি, নিজের হাতে খেতে শিখ্‌বে না কিছুনা—

এমন অভিযোগ প্রায়ই রমলার ওপর হয়, এবং সেও বিনা প্রতিবাদে নিজের দোষ স্বীকার করে নেয়। মেজবৌ রাশভারি মেয়ে মানুষ, চেহারাও যেমন জাঁদ্‌রেল্, মনও তেমনি কঠিন, বাড়ীর সবাই ওকে রীতিমত ভয় ক'রে মেনেই চলে। সে কল্‌কাতা সহরের মেয়ে, তায় ভাল রকম লেখা-পড়া জানা, চোখলো-মুখলো সে।

বড়জা ডাকে—নমিতা! বাবার খই দুধ দাও, ব্যস্ত হয়ে রমলা বলে—আমি নিয়ে যাচ্ছি, মেজবৌদি, দুধটা ততক্ষণ গরম কর।

কথায় কথায় প্রায়ই আজকাল গিরীনবাবু চেষ্টা করেন রবীনের স্ত্রীর কথা তুল্‌তে এবং তারই সুযোগ খুঁজতে থাকেন, কি উপায়ে ডাক্তার বাবুর ধারণা পরিবর্ত্তন করবেন। রবীন কোন সময় বেয়াড়া রকম গম্ভীর হয়ে ওঠে, কোন সময় নীরব থাকে, যেন শুন্‌তেই পায়নি এম্‌নি ভাবখানা ফুটে ওঠে ওর মুখে। নেহাৎ না-ছোড় বান্দা দেখলে বলে—বাবা কি আপনাকে দিয়েই আমায় চাক্‌রী থেকে বঞ্চিত করতে চান্ না কি বলুন তো! নাঃ, বদ্‌লি আমায় হতেই হবে দেখছি—আপনি আমায় টিক্‌তে দেবেন না বুঝছি! ডাক্তারবাবু বিরক্ত হয়েছেন বুঝে তখনকার মত চুপ করেন গিরীনবাবু, কিন্তু তাই বলে তিনি ছাড়্‌বার পাত্র নন্ সময়মত ঠিক পেয়ে বসেন।

অনেক সময় ইচ্ছে করে সামান্য সূত্রে ধরে নিজের স্ত্রীর প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন। সেদিনের আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের পর হঠাৎ গিরীন্‌বাবু গা-ঢাকা দিয়েছেন কতকটা ইচ্ছে করেই। রবীনের বাসায়ও যান্ না এবং রবীন্ ওঁর বাসায় গিয়েও যাতে না পায় তারই ব্যবস্থা করে রেখেছেন, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের শিখিয়ে দিয়েছেন, ডাক্তারবাবু আমায় খুঁজলে বল্‌বি বাবা বাড়ী নেই।

গিরীন্‌বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়ে উপর উপর কদিনই রবীন্ ফিরে আসে, বাড়ী নেই শুনে মনে করে সেদিনের কথায় বোধহয় রাগ করেছেন, তাই আর আসেন না। ওঁর সঙ্গে মতের যেমন গর্‌মিল হয় রবীনের, তেমনি দেখা না হলেও থাক্‌তে পারে না, নিজে যায় দেখা কর্‌তে, একদিন না এলে। সেদিন আর একবার গিরীন্ বাবুর খোঁজে সন্ধ্যের সময় ও যায়। ছেলেরা সব পড়া শোনা কর্‌ছে দেখে, জিজ্ঞাসা

করে, গিরীন্ বাবু কোথা ? উত্তর সেই একই শোনে। ও যায় বাড়ীর ভেতর ঢুকে।—বৌদি, ও বৌদি! করেন কি ? বলে ডাক্তে-ডাক্তে যায় রান্নাঘরে। গিরীনবাবুর স্ত্রী রবীনের সাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে ব্যস্ত হয়েই। কি বল্ছেন, ঠাকুরপো ? হাতে খুন্তী ধরা রয়েছে—আসুন ভেতরে আসুন, কড়ায় মাছ আছে পুড়ে যাবে—বল্তে বল্তে তিনি চলে যান্; রবীন্ জুতো খুল্তে খুল্তে বলে চমৎকার গন্ধ বেরিয়েছে আপনার মাছ ভাজার! কিন্তু গিরীন্‌বাবুর আজ ক'দিন ধরে দেখা নেই কেন বলুন তো ? বলে মস্ত এক পিঁড়ি নিয়ে বসে যায়।—তা তো জানিনে, বোধহয় কোথাও কাজ থাকে বলে মাছ ভাজার দিকে মনযোগ দেয়।

রবীন্ বলে—যাক্ গে ওসব কথা, এখন গরম মাছ ভাজা খাওয়া যাক্, বড় ভাল লাগে মাছ ভাজার গন্ধ। বলে ঘ্রাণ নেয়, আঃ,—কই দেখি দু'খানা, উনুনের কাছে এগিয়ে গিয়ে বসে!

শান্তি, শান্তি! একখানা ডিস্ দিয়ে যা রে, বলে সুমিত্রা মেয়েকে ডাকে, একটু পরেই একটি বছর বার-তের বয়সের মেয়ে আসে ডিস্ নিয়ে, পিঠের বিননি দুলিয়ে, আনন্দে আটখানা হয়ে।—কাকা বাবু আমাদের ভুলে গেছেন দেখ্ছি—বলে বসে পড়ে রবীনের কাছে।

রবীন্ ওর পিঠ চাপ্ড়ে বলে—তাই বটে, কিন্তু তুইও তো আর যাস্ না কাকাবাবুর খবর নিতে, আমিও বল্তে পারি, তোরাও আমাকে ভুলেছিস্! বল্ পারিনে ?

শান্তি বলে মাকে জিজ্ঞেস্ করুন না, আমার সময় কখন্, মায়ের রাতদিন কত কাজ করে দিই, কিন্তু আপনি তো আসতে পারেন—বলে মায়ের দিকে চায়, কি বল মা!

রবীন্ হেসে ওঠে। মাকে সালিশী মান্‌ছে! মাছ ভাজার ডিস্ এসে যায় সাম্‌নে, রবীন্ ছেলে মানুষের মত লাফিয়ে ওঠে আনন্দে। বলে এখন আর একটি কথাও নয়, আগে খাওয়া না হলে একদম্ জুড়িয়ে যাবে শান্তি। মাছগুলো বেশ চুড়্‌চুড়্ করছে, বাঃ,—দেখ্‌রে শান্তি দেখ্, ব'লে ডিস্‌খানা এগিয়ে ধরে ওর মুখের কাছে। মুখখানা সরিয়ে নিয়ে শান্তি ব'লে ওঠে—ভারী লোভী আপনি কাকাবাবু। বলে হেসে ওঠে খিল্‌খিল্ করে, দেখ্‌ছ মা কাকাবাবুর কাণ্ড—

রবীন্ একখানা মাছ মুখের কাছে নিয়ে যেতে যেতে বলে—এমন গরম মাছ ভাজা পেলে নির্লোভী ও লোভী হয় রে—কি সুন্দর সত্যি, তোর মায়ের রান্না, উড়ে ঠাকুরের হাতের রান্না খেয়ে অরুচি হয়ে গেল, এক এক সময় মনে হয়, বৌদির বাড়ীতেই থেকে যাই—ভাল রান্নাটা তো খাওয়া যাবে। বলে ডিসের দিকে চেয়ে বলে—ও বৌদি, মাছ যে ফুরিয়ে এল, আর দু'একখানা না হলে ওঠা যায় না তো!

সুমিত্রা আরও খান কতক মাছ রবীনের ডিসের ওপর আলুগোছে দিয়ে বলে—বৌদির রান্নার তারিফ করে তো কোন লাভ হবে না, এ তো দু'দিনের, দু'দিন পরে কোথায় বা আমরা, আর কোথায় বা আপনি, কে কোথায় চলে যাব তার ঠিক নেই। যে চিরদিনের, তাকে আন্‌তে এত ক'রে বললাম, তা আন্‌লেন না কিছুতে—একটুক্ষণ চুপ করে যায়, বোধহয় উত্তর পাওয়ার আশায়, কিন্তু তা পায় না, রবীন্ নিরুত্তর! সুমিত্রা পুনরায় বলে—তাকে শিখিয়ে দিয়ে যেতাম আমার মতন রান্না কর্‌তে। বলে রবীনের মুখের দিকে চায়, কিন্তু মুখের বা মনের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখ্‌তে না পেয়ে চুপ করে যায়।

রবীন্ ডাকে শান্তিকে, সে এসে দাঁড়ায়—কি বলুন, জল নাকি?

বলে মৃদু হাসে। রবীনও হেসে ফেলে—এবার তোমার পালা শান্তি বুঝতেই পারছ, মাছ ভাজার পর ঠাণ্ডা জল খেতে নেই—চা খেতে হয়—কথার মধ্যেই শান্তি দুষ্টুমী করে বলে ওঠে—খুব আছে, আমি এখন চা করতে পারব না তা' বলে—মাথাটা খুব জোরে নাড়ে, মুখ টিপে হাসতে হাসতে।

রবীনও ছেলেমি করে বলে, পারবি খুব পারবি, আচ্ছা তোর মাকে জিজ্ঞাসা কর—গরম জিনিষ খেয়ে ঠাণ্ডা জিনিষ খেতে আছে কি না—বাঙাল যারা—বলে শান্তির মুখের ওপর একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, ওকে রাগিয়ে দেবার জন্যে।

শান্তি চটে ওঠে - না খায় না বৈকি—বলে চা তৈরী করতে বসে।

রবীন ওর ভারী মুখ খানার দিকে চেয়ে হো-হো করে হেসে ওঠে। তারপর সুমিত্রাকে মধ্যস্থ মানে।—আচ্ছা বৌদি, বলুন তো আপনিই, আপনি তো আর বাঙাল নন, চব্বিশ পরগণার মেয়ে—বলুন, বাঙাল ছাড়া আর কেউ খায়?

সুমিত্রা হেসে বলে—আমি জানিনে। শান্তি কাপে চা ছাঁকতে ছাঁকতে রেগে বলে আহা! বাঙাল বাঙাল যে বলছেন খালি, বাঙাল বুঝি মানুষ নয়? বলে রেগে গর্‌গর্‌ করতে করতে চা দিয়ে যায় রবীনকে।

রবীন এবার ওকে ঠাণ্ডা করার জন্যে বলে, চমৎকার তোর তৈরী চা, তাই তোকে একটু না রাগিয়ে দিলে পাব না বলেই—বাধা দিয়ে শান্তি বলে—হয়েছে, যখন তখনই তো বলেন।

অনেক দিন পর সেদিন রবীনের দরজার বাইরে হঠাৎ গিরীন বাবুর পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।—ডাক্তারবাবু আছেন? রবীন দু'একটা

কবিতা লিখে উঠে চান করে চুল আর চিরুণীর সঙ্গে সংঘর্ষ স্থুরু করে দিয়েছিল, লোসনের সাহায্য না নিলে নাকি ওর চুল মোটে বাগ মানে না, ভয়ানক কর্কশ চুল—তাই লোসন ঘষেছে খুব খানিক, তারই গন্ধে ঘর ভরপুর। দরজাটা খুলে বেরিয়ে আসে, দেখে গিরীন্‌বাবু দাঁড়িয়ে এবং পেছনে দু'জন কুলীর কাঁধে মস্ত বড় একটা গাছের গুঁড়ি, রোদে মুখ চোখ লাল সকলের। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে, এত রোদে এই ভরা দুপুরে কোথায় গিয়েছিলেন বলুন তো ? আসুন ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন।

গিরীন্‌বাবু রোয়াকে উঠ্‌তে উঠ্‌তে কুলীদের বলেন ওটা আমার বাসায় দিয়ে আয়, আর বলে দিস্‌ যাচ্ছি এখুনি। বলে রবীনের দিকে চেয়ে বলেন—ভাল তো ?

দুজনে ঘরে এসে বসেন। রবীন্‌ প্রশ্ন করে—আপনার কি হয়েছে বলুন তো ? দেখা নেই কেন ? বাড়ী গিয়েও শুনি নেই—কোথায় যান্‌ বলুন তো !

উদাস কণ্ঠে গিরীনবাবু উত্তর দেন—যাই, কাজ থাকে বলে—রবীন্‌ প্রশ্ন করে—কিন্তু ওটা কি নিয়ে গেল ওরা ? অবজ্ঞার সঙ্গে গিরীন্‌বাবু বলেন—ও, একটা গাছের গুঁড়ি। যাই—ভয়ানক বেলা হয়ে গেছে, বলে উঠ্‌তে যান্‌। রবীন্‌ কৌতুহলের সঙ্গে প্রশ্ন করে—কি হবে ওটা, তাতো কই বল্‌লেন না ?

গভীর ঔদাসীন্যের সঙ্গে গিরীন্‌বাবু বলেন—কাল দুপুরে আমার বাড়ীতে গেলেই দেখ্‌তে পাবেন। বলে চলে যান্‌—রবীন্‌ বিস্ময় বোধ করে গিরীন্‌বাবুর হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তনে।

(২০)

—ছোটকাকা, আমায় একদিন নিয়ে যাবে, পিসিমার বাড়ী দেখে আস্‌ব? অলকার কথায় বিজন চম্‌কে ওঠে।—সেখানে কার কাছে যাবি! পিসিমা তো আমাদের বাড়ী! বলে সজোরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

অলকা বলে ঐ যে তড়িতা পিসিমার গল্প করে পিসিমা—আমার খুব দেখ্‌তে ইচ্ছে করে তড়িতা পিসিমাকে, খুব নাকি ভাল লোক, আর খুব লেখা পড়া করে! তারপর আরও কত কি করে—সব মনে নেই—

—আচ্ছা ছোটকাকা! তড়িতা পিসিমা এখনো পড়ে?

বিজন অন্যমনস্ক ছিল, অলকার বারংবার সাগ্রহ প্রশ্নে চকিত হয়ে উত্তর দেয়—পড়ে।

অলকা সকৌতুহলে পুনরায় প্রশ্ন করে, কি পড়ে? বিজন সংক্ষেপে উত্তর দেয়—বি, এ।

—ও, বাব্বা! তবে তো আমি তার সঙ্গে কথা কইতেই পারব না?

অলকার মুখের বিস্ময় ভাব সুস্পষ্ট দেখে বিজন হেসে ফেলে।—কেন রে?

অলকা ভীতি ব্যাকুল মুখে বলে—আমার বড্ড ভয় করে।

বিজন বলে—বি. এ পাশ তো আমিও করেছি রে, কই আমাকে ভয় করিস্ না? তবে তোর যত ভয় কি তড়িতা পিসিমাকেই—

অলকা মাথা নেড়ে বলে, তুমি ভারী বোকা; তোমাকে ভয় করব কেন, তুমি যে আমার ছোট কাকা, আর তাকে যে দেখিনি কখনো

তাই—ও, তাই বল্, আচ্ছা আজই আমি তোর তড়িতা পিসিমাকে বলে দেব তোর এই সব কথা। বলে বিজন যেন তখনিই বলতে যাবে, এই ভাবখানা দেখায়।

অলকা অনুনয়ের সুরে বলে—ব'ল না ছোটকাকা, তোমার পায়ে পড়ি!

গম্ভীর হয়ে বিজন বলে—ঠিক বলব দেখিস্! বলে দুষ্টামির হাসি হাসে। একটু পরে অলকার অভিমানে নীরব মুখের দিকে চেয়ে বলে—না রে না, তোর ভয়ের কিছু নেই, আমি কি ওদের বাড়ী যাই, যে বলব!

বিজনের স্বাভাবিক কণ্ঠের অভয় বাণীতে অলকা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। বলে—বাঁচা গেল, যা ভয় আমার হয়েছিল এতক্ষণ, বাব্বা!

বিজন বলে—এখন ভয় গেল তো, এবার আমি যাই? অরুণ এখনো বেড়িয়ে ফিরল না, ওর সঙ্গে তো দেখা হ'ল না—বলে বিজন উঠে পড়ে চেয়ার ছেড়ে। নেপথ্য থেকে কোন নারী কণ্ঠের আহ্বান আসে,—অলকা, মাষ্টার মশাই এসেছেন।

বিজন বলে—চললাম রে, আবার একদিন এরই ভেতর আসব, আজ কিন্তু এখুনি গিয়ে বলে দিচ্ছি বলে চলে যায়।

বাসায় ফিরে দেখে, ব্রহ্ম বড়দাদাবাবুর জামা-কাপড় গুছিয়ে রাখছে, জিজ্ঞাসা করে—বড়দা বুঝি এখুনি এলো? ভৃত্য উত্তর দেয় আজ্ঞে হ্যাঁ। বিজন বিমনা হয়ে চলে যায় নিজের ঘরে। অনেক দিন পর অলকার কথায় আজ বেশী করে ওকে পেয়ে বসে অতীত। বড় বেশী আলোড়িত হয় মন। রমলা চলে গিয়ে থেকেও আর

যায় না রবীন্দের বাড়ী, কি করতেই বা যাবে? অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে বোনের বিয়ে দিয়ে সকলের চেয়ে বেশীই অনুতপ্ত ও। অনেক দিন পরে আজ তড়িতাদের খবর নিতে ওর ইচ্ছে হয়, চিঠি লিখতে বসে। লেখে অলকার সব কথা গুলো, আর ওদের বাড়ীর খবর জানতে চায়। সেই সঙ্গে তড়িতার বিয়ে হয়েছে কিনা এবং রবীন্ পুনরায় বিয়ে করলে কিনা এসব ও জানবার আগ্রহ প্রকাশ করে।

উপসংহারে লেখে তড়িৎ, দুঃখ করবার কিছু নেই, মানুষ যা ভাবে, ভগবান তা ভেঙে দেন। তাই মানুষ প্রতি পলেই যা গড়তে যায় এবং যখনি গড়তে যায় কিছু, তখনি সে মস্ত ভুল করে বসে, কিন্তু তা তখন বোঝেনা, অসময়ে বোঝে। রমলা চলে যাওয়ায় পর রতনবাবু সাংঘাতিক আঘাত সত্যি পেয়েছেন। সেখান থেকে রমলা যে চিঠিখানা দুঃখ করে লিখেছে, রতনবাবু সেখানা অতি সযত্নে নিজের বিছানার কাছে লুকিয়ে রেখেছেন এবং ঘরে কেউ না থাকলে পড়েন তুলে নিয়ে। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে অসম্ভব ভাবে, তাই ঘরেই শুয়ে আছেন, দোকানে যেতে পারেন না, যা কিছু ব্যবসা সবই রণেন দেখে।

—ছোড়্‌দিদিমনি, আপনার একখানা চিঠি আছে। বলে দিয়ে যায় তড়িতার প'ড়ার টেব্‌লে সরকার মশাই একখানা খামের চিঠি। তড়িতা সেখানা সাগ্রহে খুলে এক নিঃশ্বাসে পড়ে। তারপর যায় পাশের ঘরে ওর বাবার কাছে, মাঝখানে খোলা দরজা দিয়ে। বিজনদা দেখছি অনেকদিন পরে হঠাৎ চিঠি লিখেছে বাবা! বলে চায় পিতার মুখের দিকে।

রতনবাবু প্রশ্ন করেন—কেন, কি দরকারে?—তাঁর কণ্ঠ ভয় বিহ্বল।

তড়িতা বুঝতে পারে পিতার স্নেহ প্রবণ মনের দুর্ব্বলতার কথা। বলে—ভয়ের কোন কারণ নেই, বৌদির এক ভাইঝি এখানে মামার বাড়ী থেকে পড়ে, সে চায় আমাকে আর তার পিসিমার বাড়ী দেখ্‌তে আস্‌তে, তাই বিজনদা দুঃখ করে লিখেছেন।

বৌমার কোন খবর নেই তো? বলে রতনবাবু ম্লান চোখে চাহেন।

তড়িতা বলে—না। কিন্তু ওকে একদিন আন্‌ব বাবা, ছেলেমানুষ, ব্যস্ত হয়েছে—কি বল বাবা?—তা আনো, আমায় জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি; তুমি কর্ত্তব্য বুঝ্‌লে আনবে? বলে চুপ করে যান্‌।

তড়িতা বলে—তা হয় না বাবা, তোমাকে না জিজ্ঞেস্‌ করে তো আমি কিছু করিনা—খুব দুঃখ করেই চিঠিখানা লিখেছেন বিজনদা। কি লিখেছে একবার পড়ে দেখ! বলে দিতে যায় পিতার হাতে পত্র।

রতনবাবু বলেন—তুমিই শোনাও মা।—লিখেছে, রমলার দুর্ভাগ্যের জন্যে দেশে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করতে হয়েছে—উঃ! দাদা যে কি ভয়ানক কাণ্ডটাই করলে বউ নিয়ে! বলে তড়িতা সজোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চলে যাওয়ার উপক্রম করলে। আজ আর পড়ায় মন বস্‌বে না, তবু কলেজ তো যেতেই হবে—বল্‌তে বল্‌তে কিছুদূর অগ্রসর হয়।

রতনবাবু বেদনাতুর কণ্ঠে বলেন—আমার অবস্থা ভেবে দেখ, তড়িৎ, কি কষ্টে দিন কাটাচ্ছি—তড়িতার যাওয়া হয় না ফিরে দাঁড়ায়। চিরকাল দুঃখ কষ্টে বাধা বিপত্তির মধ্যে মানুষ হয়েছি, এদিকে এদ্দিন কাজ নিয়ে পড়ে থাক্‌তাম, ভেবেছিলাম দুঃখ কষ্টকে জয় করব, কিন্তু আজ তাও বন্ধ করে দিলে ঈশ্বরের নির্মম ইচ্ছা। কি কুক্ষণেই রবীনের ওখানে গিয়েছিলাম, এই কথাটাই রাতদিনের মধ্যে মনে করি দশবার

বোধহয়, চোখের কোণে জল দেখা দেয়। তড়িতা তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে পিতাকে সান্ত্বনা দেয়।—ওর কথা তুমি মোটে ভেব না বাবা, ও আমার কেউ নয়, এই ভাব। দেখ্‌ছ তো কত বাড়ী আস্‌ছে, অনর্থক সে বেচারাকে তাড়ানোর ছল বৈ কিছু নয়। তারপর নতুন করে বিয়ে—তাও তো মা এত বললে, কিন্তু কবুল না তো, তবে? আমি বেশ বুঝ্‌ছি বাবা ও মস্ত বড় শয়তান, লেখা-পড়া শিখ্‌লে হবে কি দেবতা? তোমাদের কষ্ট দেওয়াই ওর আসল উদ্দেশ্য, একথা সে দিন মাকেও বলেছি, যতই কেন লুকোও না মা, ছেলে তোমার কুলাঙ্গার।

—কিন্তু তড়িৎ, বাপ মায়ের স্নেহ তো কুলাঙ্গার নয়, সে যে নির্জলা সত্য এবং শাশ্বত। গদ্‌ গদ্‌ স্বরে রতনবাবু মেয়ের হাতখানা সজোরে চেপে ধরে বলেন। কিছুকাল পিতা পুত্রী উভয়েই নীরব থাকেন। তারপর পিতাই কথা বলেন—পুনরায় বিয়ে না করায় আমার দুঃখ নেই তড়িৎ, তোর মা অবশ্য ক্ষুন্ন হচ্ছেন, মা বলেই এবং মেয়ে মানুষের নরম মন বলে-ই। কিন্তু আমি পুরুষ, তাই আমার দায়িত্বশীল মন নিয়ে আমি চুল চিরে বিচার করে দেখছি হয়ত ভবিষ্যৎ শুভ, এ তারই লক্ষণ। তাই ভগবানের কাছে জানাচ্চি, তুইও জানা, আমি যে লক্ষ্মীকে চোখের জলে সেদিন বিদেয় দিয়েছি, সেই লক্ষ্মী একদিন তার নিজের স্থানে এসে বসুক মা—ঘরের দেওয়ালের পূর্ব্বদিকে অদৃশ্য কোন্‌ টিক্‌-টিকি টিক্‌-টিক্‌ শব্দে ঘরের দুজনকেই দেয় চমকে। রতনবাবু বলেন—আস্‌বে—আমার ঘরের বউ-ই ঘরে ফিরে আস্‌বে একদিন হাস্‌তে হাস্‌তে, টিক টিকি ও বললে তড়িৎ।

সক্ষোভে তড়িতা বলে—তাই যেন আসে, কিন্তু আজও তার কিছু-

মাত্র লক্ষণ তো দেখ্‌ছিনা বাবা ! বিজনকে দু কলম চিঠি ক্ষিপ্র হস্তে লিখে অলকার মামার বাড়ীর ঠিকানাটা চেয়ে পাঠায়, ওকে নিজে আনতে যাবে বলে। তার সঙ্গে খানিকটা অভিমান ও ক্ষোভও প্রকাশ করে।

—লেখে, আপনাকে ছোটবেলা থেকে দেখ্‌ছি বলে, দাদার মতই শ্রদ্ধা করি, দাদার বন্ধু আপনি যখন, তখন বৌদি হয়ে আসেনি আপনার বোন। আজ কোথায় আরও হৃদ্যতা বাড়্‌বে, কিন্তু বিধাতার কি নির্মম আঘাত, বিপরীত হয়ে গেল সব তাই, কিন্তু তাই বলে আপনি আমাদের চক্ষে নেমে যাননি, কোন অপরাধও করেন নি ; আগের মতই আছেন। তবু সে জোর, সে দাবী আমার আজ নেই ছোড়্‌দা, যে আসতে বলব, বা কোন অনুযোগ করব ছোট বোনের স্নেহ নিয়ে। না হলে বলতুম, অলকাকে নিয়ে আপনি একদিন আসতে পারেন তো, কিন্তু সে জোর হারিয়েছি। বৌদির ওপর দাদা যে গুরুতর অপরাধ করেছে অবিচার করে, তার জন্যে আমরাও আজ অপরাধী হয়েছি। বাবা তো বৌদির চলে যাওয়ার পর থেকে বিছানা নিয়েছেন, মা কাতর, এ-কয় মাস বাড়ীতে বোধ হয় কেউ হাসেনি, আমি তবু পড়া আর কলেজ এবং বাকী সময়টুকু বাবার ওষুধ পথ্য নিয়ে আছি একরকম।

আপনি তো দেখেছেন, আমাদের বাড়ী কি রকম সর্ব্বদা উৎসবময়, আনন্দ মুখর থাকৃত, আজ একজনের জন্যে সেই বাড়ী হয়েছে বিষাদময়। আজ অলকার শিশুমনের সত্যিকার ভালবাসার স্পর্শ হৃদয়ে অনুভব করে, বেদনার মধ্যেও অনেকটা আনন্দ পেলাম। তাই তাকে চাই আমি বরণ্‌ করে আন্‌তে তার পিসিমার পরিত্যক্ত বাড়ীতে। মনে হচ্ছে

বৌদির আপন জনকে দেখলে ও একটু শান্তি পাব, হয়ত অলকার মধ্যে বৌদির স্নেহের স্পর্শ পাব একটু। তার আত্মীয়, প্রিয়জনের মধ্যে হয়ত বৌদিকে খুঁজে পাব, সে হয়ত অলকার মধ্যেই বেঁচে ওঠবে। কিন্তু আপনি পুরুষ, দাদার-ই স্বজাতি, তাই আপনাদের কাছে নিষ্ঠুরতা ছাড়া ড় কিছু আশা করতেও ভয় পাই। আপনার এক বোন্ চলে গেছে, কন্তু তাই বলে আর এক বোন্‌কেও কি দেখতে আসতে নেই! বাবাকে । কি দেখতে আসা উচিৎ নয়? স্পষ্টবাদী আমি জানেন তো, আশা করি কিছু মনে করবেন না। চিঠিখানা শেষ করে ডাকে পাঠিয়ে ও ায় কলেজে।

(২৯)

কয়েকদিন পরে সেদিন কলেজ থেকে ফিরেই যেমন নিয়মিত যায় পিতার খবর নিতে, সেদিনও তেমনি ঘরে ঢুকতেই দেখে, বিজন ওর পিতার কাছে বসে। তড়িতা প্রণাম করে বসে সামনের চেয়ারে, দেখে ওর পিতার চোখে জল, বিজন নীরবে বসে। বিজনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই—চোখ নামিয়ে নেয় তড়িতা। কেমন যেন একটা সংকোচ দেখা দেয় আজ। অতি পরিচিত লোকটির সামনে বসে থাকতেও আজ আর ওর মন চায় না। ঘরের আবহাওয়া ভয়ানক ভারী বোধহয় ওর কাছে, নিদারুণ অস্বস্তিতে তড়িতা উঠে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়। কিছুদিন আগেও, রমলার যাবার দিনেও যার সঙ্গে সহজ ভাবে কথা হয়েছে, আজ সামান্য দিনের ব্যবধানেই এ আড়ষ্টতা আসছে, না এ-শুধু রমলার অভাবের জন্যে অন্তরের এ দুরত্ব বোধ! তড়িতা নিশ্চল পাথরের মত বসে বসে কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবে। না পারে উঠে যেতে—না

পারে আগের মত স্বচ্ছন্দে কথা কইতে, ঘর স্তব্ধ, সকলেই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়বৎ বসে, এ বিসদৃশ পরিবেশ অসহ্য হয়ে ওঠে তড়িতার কাছে। চিঠি লেখবার সময় ও তো এ কথা ভাবেনি, এতবড় পরিবর্ত্তন—পিতার দিকে একবার আর বিজনের দিকে একবার চায়, দেখে, ওদের ও মনের অবস্থাটা ওর চেয়ে কিছু কম নয়। পরক্ষণেই রাগটা গিয়ে পড়ে দাদার ওপর, যে এর জন্তে দায়ী।

ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে এই অভদ্র আড়ষ্টতাকে, এবং আজকের এই বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্তে নিজেকে অনেকখানিই দায়ী করে। কি দরকার ছিল এই দুজনকে এমন করে মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ দেওয়ার। বেদনার অনুভূতিকে এমন করে বাড়িয়ে তুলে কোন্ চরিতার্থতা সে নিজে লাভ করল? না, জীবনে আর ভুলেও কখনো এমন নিষ্ঠুরের কাজ সে করবে না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল।

এদের সামনে নিজেকে মহা অপরাধী বলে অনুতপ্ত হয়ে উঠল। হয়ত এই দু'জন পুরুষ-ই তাকে ভুল বুঝবে। হয়ত ভাবছে এরা, তড়িতা বসে এদের এই সংকট অবস্থা উপভোগ করছে। ছিঃ ছিঃ। নিজের বুদ্ধিকে শতবার নিন্দে করে উঠে গিয়ে এই ভাবটা বদলে আনবার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা করে কোনমতে চলে গেল ঘর থেকে, ঠিক করে আনবার জন্তে নিজের মন।

বিজনদাকে আমন্ত্রণ করে বাড়ীতে এনে অশিষ্টতার জন্তে তড়িতা নিজেকে আজ ক্ষমা করতে পারেনা কোনমতে।

বারান্দায় দেখা হয় রামেশ্বরের সঙ্গে। তিন ডিস ফল আনতে আদেশ দিয়ে যায় মায়ের সন্ধানে, তারপর ফিরে আসে মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে যে কথাটা আগে বলবে, সেই কথাটা।

ঘরে ঢুকেই এবার প্রশ্ন করে—অলকাকে না নিয়ে যে বড় একাই এলেন ! ওকে বুঝি সঙ্গে আনতে পারলেন না !

বিজন চমকে ওঠে।—ওকে আনতে যাবার সময় হয়নি তড়িৎ, তোমার চিঠির খোঁচা খেয়েই চলে এসেছি, দেখছনা ধড়া চূড়া পরা অবস্থায় ! তারপর গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলে—আমায় আবার আজ-ই রাত্রির ট্রেনে যেতে হবে বাড়ী, তাই এবেলা না এলে আর হয়ে উঠবে না—তড়িতা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে—কেন ? কারুর অসুখ বিসুখ নাকি ? ওর মনের ভয় স্পষ্ট হয়েই প্রকাশ পায় মুখের কথায়।

বিজন বলে—হ্যাঁ, বাবার অসুখ এবং বোধ হয় বাঁচ্‌বেন না ; রমা চিঠি লিখেছে—বড়দা গেছেন। উৎকণ্ঠিত হয়ে রতনবাবু বলেন—তাই বোধহয় বৌমা চিঠি লিখ্‌তে পারেন নি তড়িৎ। বলে মেয়ের মুখের দিকে কিয়ৎকাল চেয়ে থাকেন, তারপর বিজনকে বলেন, তোমার বাবার খবরটা দিতে ভুল না বাবাজি। বলে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে থাকেন।

রামেশ্বর আসে চা ও মিষ্টি নিয়ে এই সময়। তড়িতা তার হাত থেকে নিয়ে বিজনের সাম্‌নে দেয়। বিজম সময় নেই বলে উঠে পড়ে, কিন্তু তড়িতা ছাড়ে না, তার অনুরোধে সামান্য একটু খেতে হয়, তারপর তাড়াতাড়ি চলে যায় আবার আস্‌বে বলে।

অনেকক্ষণ পরে রতনবাবুর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়। তড়িতা আছে কিনা এ দিকে চেয়ে দেখেন, তারপর বলেন,—বৌমার বাবা এ ধাক্কা সাম্‌লাতে পার্‌বে না তড়িৎ। তড়িতা ম্লান চোখে চায়।

অনেকক্ষণ দুজনেই নিস্তব্ধ। বাইরে হঠাৎ কার জুতোর শব্দে চকিত হয়ে চায় তড়িতা।—ওমা, তুমি কোথা থেকে এসময় ? দরজার

বাইরে দাঁড়িয়ে রবীন্ জুতো খুল্তে খুল্তে উত্তর দেয়, কোথা থেকে আবার পাক্‌শি থেকে!

রতনবাবু মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেন, কে এলো রবীন্?—হ্যাঁ বাবা। বলে চলে যায় তড়িতা—মাকে খবরটা দিতে। এই মাত্র বিজনের আগমনে যে ঝড় একটা নতুন করে বয়ে গেল, তারই বেগটা তখনো তড়িতা সামলে উঠ্‌তে পারেনি, অলকাকে নিয়ে আসার, তার এবাড়ীতে আস্‌বার ইচ্ছার কথাটা তখনো রমলার স্মৃতিকে জাগরুক রেখেছে। তড়িতার মনে ঘুরপাক্ খেয়ে ফিরছে শুধু ওরা তিনজন। মাকে ডেকে দিয়ে তড়িতা চলে যায় একবারে বাড়ীর শেষপ্রান্তে কোণের ঘরে পড়্‌তে। রবীনের অপ্রত্যাশিত আগমন ও আজ যেন ওকে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার-ই মত।

রাত্রে খাওয়ার সময় দেখা হলে রবীন্ প্রশ্ন করে—কোথায় ছিলিরে তড়িৎ, দেখা-ই তো পাওয়া যায় না তোর?

গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয় তড়িতা খুব সংক্ষেপে—পড়ার ঘরে। রবীন তেমনি গাম্ভীর্য্যের সঙ্গেই বলে—তোর স্বভাবের খুব পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি যে, এত নিস্পৃহতা এর-আগে ছিল না তো?

তড়িতা উত্তর দেয়—থাকে না কিছুই, সময় বিশেষে মানুষের হয় অনেক কিছু। তড়িতার সঙ্গে রবীনের খুব মেলে না কোন দিনই—আজ ও চুপ করে যায়ও।

রবীনের শোবার ঘর আর পড়ার ঘর রোজ সকালে উঠে তড়িতা নিজ হাতে যতটা সম্ভব ঝাড় পোঁচ করে, বাকীটা দাঁড়িয়ে থেকে করায়। ওর ভয় পাছে চাকররা বৌদির হাতের গোছানটা দেয় নষ্ট করে। রমলার সাধের গোছানটা বজায় যতদিন পারে রাখ্‌বে এই

ইচ্ছা! তবু এই তুচ্ছ জিনিষকে আশ্রয় করেই ছোট্ট একটু স্মৃতি প্রতিদিন তড়িতার মনকে একবার করে নাড়া দিয়ে যায়।

রাত্রে মা বলেন—তড়িৎ, বিছানাটা একটু ঠিক করে পেতে দিতে বল্‌গে।—আচ্ছা বলে চলে যায়ও। রবীনের ঘরে ঢুকেই মনটা ওর খারাপ হয়ে যায় বেশী করে আজ। চাকরকে বিছানা করার উপদেশ দিয়ে ও এসে দাড়ায় সেইখানে, যেখানে রমলার ফটোখানা ও দুষ্টুমী করেই এনে টাঙ্গিয়েছে। রমলার নববধূ বেশের ফটো একমনেও প্রায়ই ঘর পরিষ্কার করাতে এসে দেখে, এখনো একমনে ছবিখানাই ও দেখ্‌ছিল। তড়িতাই জেদ ধরে তুলিয়েছিল, পাশেই রেখেছে রবীনের ওই সাইজের একখানা হাফ্‌বাষ্ট ছবি। তড়িতা শুধু এই কথাটাই বেশী করে ভাবে, হয়ত ভগবান ওকে দিয়েছিলেন অলক্ষ্যে ইঙ্গিত, আজকের এই রূঢ় বর্ত্তমানের বেদনাময় পটভূমিকার জন্যে।

আপন মনেই তড়িতা হাসে, কখনো গম্ভীর হয়ে যায়, মুহুর্মুহুঃ মুখের ভাবও পরিবর্ত্তিত হয় মনের সঙ্গে। হ্যাঁ, ওর-ই আজ সবচেয়ে বেশী দরকার হয়েছে এই ফটোখানার! রমলার অদৃষ্টের পরিহাসে, তাই স্মৃতির তীব্র দাবদাহ আজ ননদ তড়িতাকেই ভোগ করতে হয় এবাড়ীতে। আর তারই জন্যে তড়িতা হয়েছিল যেন স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেই উদ্যোগী। রবীনের গৃহ প্রবেশের পদশব্দে এসে ঘুরে দাড়িয়ে চাকরের উদ্দেশে ধমক্ দেয়।—হলনা এখনো! বলে খাটের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখে, চাকর তার কাজ সেরে কখন্ চলে গেছে। রবীন্ ঘরে ঢুকতেই তড়িতার তর্জ্জন শোনে, ভেতরে গিয়ে এক তড়িতা ছাড়া কাউকেই কিন্তু ঘরের চারদিকে ভাল করে দেখেও খুঁজে পায় না, আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করে—কার ওপর তম্বি করছিস্।

তড়িতা রবীনের বিছানার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে উত্তর দেয়, "তম্বি আবার কোথায় করলুম ? ছোট টেবিলটাও দেয়নি খাটের কাছে, তারপর খাবার জল ও রাখেনি, তাই বক্‌ছি রামকে, দেখ না আধখাপ চা কাজ, সাধে কি বক্‌তে হয় ?

রবীন্ শ্লীপার খুলে গেঞ্জিটা গা থেকে খুল্‌তে খুলতে আল্‌নার কাছাকাছি হয়ে বলে—কিন্তু তুই যাকে বক্‌ছিস্, সে তো এ দিকের চতুঃসীমার মধ্যে আছে বলেও মনে হচ্ছেনা, বকুনীটা মাঠে মারা যাচ্ছে নেহাৎ—বলে হাসে ও ! তড়িতা ততক্ষণ নিজেই ছোট্ট টেবিলটা ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে বয়ে এনো। ঘড়ি তোয়ালে প্রভৃতি দাদার অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ গুলো যথাস্থানে রাখ্‌ছিল। দাদার কথার উত্তর দেয় না। রবীন্ বলে—আমি তো ঘরে এসে ভাব্‌লুম—আমার ওপরের রাগটা বুঝি দেয়ালের ওপরই শেষ পর্য্যন্ত ঝাড়্‌ছিস্। বলে তড়িতাকে রাগিয়ে দিতে চায়। তড়িতা তখন মস্তবড় একটা ফুলের তোড়া এক হাতে এবং অপর হাতে চিনে মাটীর ফুলদানী একটা এনে বসাচ্ছে ছোট্ট টেবিলটায়। দাদা ফুল ভালবাসে বলে রোজ একটি করে তোড়া আনিয়ে দাদার পড়ার ঘরের টেবিলে রাখে ও সকালে। খুঁটি নাটি কাজগুলো সেরে চলে যেতে যেতে বলে—তোমার ওপর আমার কিসের রাগ থাক্‌বে শুনি ? সে যদি কারুর থাকে তো বরং বৌদির থাকতে পারে। তুমি তার জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করেছ বলে—ও চলে যায়। রবীন্ ডাকে শুনে যা তড়িৎ ! দরজার কাছ থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে তড়িতা বলে—কি বল।

—তুই সত্যি আমার ওপর রেগে নেই বল্ দিকিনি ? রবীন্ প্রশ্ন করে। তড়িতা মাথা ঘুরিয়ে বলে—কি জানি বল, অত শত বুঝিনি,

তবে এইটুকু বুঝি যে, যারা ঝগড়া করতে জানে, তারা তার সব কৌশলগুলোই বেশ আয়ত্ত করতে জানে, আর লোক না পেলে গাছ গাছই দেয়াল দেয়ালই সই, যা সামনে পায় মূক জড় বলে সে হুঁসটাও থাকে না তাদের।

রবীন্ বলে—এ বার আবার কাকে লক্ষ্য করে ছুড়ছিস শুনি? তড়িতা গ্রীবা উন্নত করে বলে—লক্ষ্য যাকেই করা হয়, সে ঠিক বোঝে দাদা। বলে হেসে ফেলে। অনেক রাত হয়েছে এখন শুয়ে পড়। আমি গিয়ে তোমার জল পাঠিয়ে দিচ্ছি। দরজা বন্ধ করনা যেন।

রবীন্ চুলটাকে সাধারণ ভাবে আঁচড়াতে আঁচড়াতে ডাকে, রাত এমন বেশী হয়নি, বসনা একটু তুই একেবারে বাবার আদরে মিলিটারীরও বাড়া হয়েছিস দেখি।

তড়িতা দু'পা এগিয়ে গিয়ে বলে—ধন্যবাদ দাদা তোমার মড়া কাটা বুদ্ধিকে। তবে বাবার আদরে হয়েছি কিনা বুঝিনে, কিন্তু বৌদির অবস্থা দেখে আমার যে বিলক্ষণ ভয় এবং কড়া হয়েছে মেজাজ, এ আমি জোর করে বলতে পারি।

রবীন্ হঠাৎ স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্য এবং স্বল্পভাষীত্ব ছেড়ে আজ যে কেন উপযাচক হয়ে এত কথা কইছে, তড়িতা ভেবেই পায় না। কিন্তু সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দেওয়া বুদ্ধির পরিচয় নয় বলেই এ সুযোগও সহসা ত্যাগ করতে রাজী নয়। তাই পুনরায় দাদার দিক্ থেকে কি আসে শোনবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে।

রবীন্ বলে—বোস্ না একটা চেয়ার টেনে নিয়ে। পড়্‌বি রাত্রে না-কি?—হুঁ পড়া তো ছিল, কিন্তু হলো কৈ! তোমার আজ কি হয়েছে জানিনে, আধ ঘণ্টা ধরে আমায় বাধা দিচ্ছ যেতে দিচ্ছ না,

আমিও যাই যাই করছি, কিন্তু ঝগড়ার ছুৎ পেয়ে যেতেও পারছি না বলে সত্যিই এবার বসে পড়ে চেয়ারে।

রবীন্ বলে—কলেজে পড়ে তুই একবারেই বকে গেছিস্ দেখছি! তড়িতা হেসে সায় দেয়—তা গেছি সত্যি, একথার মার নেই। আমি মাঝে মাঝে তাই ভাবি, যারা পড়ে তারাই বোধহয়, বকে যায়।

—তুই আজ কাল অনেক কথা শিখেছিস দেখি যে, এঁ্যা! আমার চেয়ে তেরো বছরের ছোট তুই! প্রণতা—ললিতা আজও আমার মুখের ওপর এত কথা বলতে সাহস করে না যে রে! বলে রবীন্ তড়িতাকে আর একটু রাগায়।

—তা হলে আমায় এবার ভাল করেই বসতে হল। বলে তড়িতা জাঁকিয়ে বসে নড়েচড়ে। পড়তে যখন নেহাৎ দিলে না, আমার মুখের ওপর অকারণ নিন্দে করে দিলে রাগিয়ে, তখন উত্তর দিয়েই যাই। আমিও যেচে তোমার সঙ্গে কথা কইতে আসিনি, কিন্তু তুমিই—বলেছি তো ঝগড়া যারা করতে জানে পায়ে পা বাধিয়েই করে থাকে। তাই তুমিই গায়ে পড়ে রাতদুপুরে- রবীন্ হেসে ওঠে। আহা সত্যিই কি তোর সঙ্গে ঝগড়া করছি, যতই লেখাপড়া শেখ্ মেয়েলি বুদ্ধি তোদের যায়নি দেখছিস! তাই বলে যে আমার অখ্যাতি শুধু শুধু করবে কেউ, সে আমি চুপ করে দুনিয়ার মেয়েদের মত পারব না সে রকম অসহিষ্ণুতা আমার নেই। আর ভয়ের কথা যা তুমি বললে, তার উত্তর হল এই, যে মানুষ হয়ে মানুষকে ভয় করা অন্যায়, তাই যদি করতে হয় তাহলে মনের ভয় যে ফুরিয়ে যাবে—বলে তরল হাসিতে স্তব্ধ রাত্রিটার ঘুম ভাঙিয়ে দেয় তড়িতা।

রবীন্ বলে—বাক্‌চাতুরী তো খুব শিখেছিস্, কিন্তু বি-এ তে কি নিলি একবার জানালিও না, জিজ্ঞাসা করারও দরকার মনে করিস্ না বোধহয় ?

তড়িতা বললে—নিই নি এখনো কিছু, ভাব্‌ছি কি নেব। ঠিক আগে মনের সঙ্গে একটা করি, তবে তো নেব। জিজ্ঞাসা করার কথা তুমি যা বলছ, সে আমি বাবাকে ও কোন দিন করিনা, জানো তো আমি একটু উল্টো বুঝি—পড়ব আমি, অন্যকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই !

রবীন্ বলে একটু জল খাওয়া দিকি, গলাটা যেন মরুভূমি হয়ে গেছে। তোর সেতুবন্ধ রামেশ্বর তো জল নিয়ে ফিরল না, রাত্রের মধ্যে বোধ হয় আর ফির্‌বেও না।

বিরক্তির ভাব দেখিয়ে তড়িতা বলে—তুমি বড্ড কষ্ট দাও, বেশ বসেছি—আর জান আমার ধাতে সয় না ওসব,—বলতে বলতে জল নিয়ে আসে এই নাও। রবীন্ বেশীর ভাগ তার খেয়ে নিয়ে বলে বল কি বলছিলি।

তড়িতা বলে—বলছিলুম, পড়ব তো আমি, বাবার, তোমার বা যে কোন লোকের মন নিয়ে তো পড়তে পার্‌ব না তাই—তাছাড়া তোমরা যাবে না পরীক্ষা দিতে, যাব আমি সুতরাং তোমাদের জিজ্ঞাসা করে লাভ কি ? এই বলছিলুম।

রবীন্ ঈষৎ বিদ্রূপ করে বলে—বিয়েও তাহলে নিজেই কর্‌বি, কি বলিস্ ?

অম্লান মুখে বলে তড়িতা—সে স্বাধীনতা বাড়ী থেকেও দেওয়া উচিত, আমারও নেওয়া উচিত মনে করি ! না হলে অশান্তি তো !

তাছাড়া জীবনও পথহারা। বাবাকে বলে দিয়েছি বিয়ের পছন্দর ভার আমার—বলে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

রবীন্ বলে—বলতে পেরেছিস্ ?

—কেন পারব না, ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় লজ্জার ভান করে লাভ কি ? আর যদি বাবা মায়ের ওপর বিশ্বাস থাকে, তাঁরা আমার কল্যান্-কামী বলে, তবে তাঁদের বাছাই করা নিতে ও আট্‌কাবে না, তাঁদের দানকে আশীর্ব্বাদের মতই মাথায় করে নেব।

সত্যিই তোকে প্রশংসা না করে পারি না তড়িৎ! বলে রবীন্ পুলকিত চোখে চাইলে বোনের দিকে। তারপর আত্মগত ভাবেই বলে, নাঃ দেশ এবার স্বাধীন হল সত্যিই, তোরাই একদিন জয়ী হবি। আর আমরা যে তোদের সে পথে তুলে ধরলুম, এ সত্যকে ভুলিস না। তড়িতা বিদ্যুৎ স্পর্শের মত উঠে দাঁড়ায়। আর যে স্বীকার করুক দাদা আমি করব না কোন দিনই—আর নয় অনেক হল বলে তড়িতা নিজের ঘরে চলে যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে বলে সুখ হল না, অন্যায়ের সীমা নেই পুরুষের, আবার বলে আমরাই তুলে ধরলুম। রবীনের অস্বাভাবিক মতিগতি তড়িতার কাছে একটা পরমবিস্ময় হয়েই রইল। এত কথা এর আগে কোনদিন দাদাও কয়নি আমিও কইনি দাদার সঙ্গে।

রবীন্ এবার কয়েক দিন বাড়ীতে থাকে, সরকারী কি কাজেই এসেছে এবং আছে ও। অলকা এসেছে শুনে তড়িতা যায়, গাড়ী থেকে নামে বেশ একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে। রামেশ্বর হাত ধরে নিয়ে আসে ওকে– দিব্যি মেয়েটি! তড়িতা ওর হাত ধরে সাদরে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। অচেনা পরিবেশের মধ্যে ও বেশ সপ্রতিভ।

অলকা! তড়িতা ওকে কোলের কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করে—আমায় চেন?

মাথা নেড়ে অলকা পরিচিতের মত বলে—হ্যাঁ চিনি—পিসিমার কাছে আপনার গল্প অনেক শুনেছি কিনা—তোমার পিসিমার বাড়ী এটা জানত—বলে তড়িতা অলকার মুখ চুম্বন করে।

অলকা জিজ্ঞাসা করে পিসিমার ঘর কোন্‌টা?—চল নিয়ে যাই দেখাতে। বলে তড়িতা ওর হাত ধরে যায় নিয়ে রমলার ঘরে। এই তোমার পিসিমার ঘর—বলে ঘরের মধ্যে ঢুকেই বাধা পায়, রবীন রয়েছে দেখে একটু ইতঃস্তত করে রমলায় ফটোর কাছে নিয়ে যায়। এই হল বিয়ের ফটো—অলকা বলে—খুলে দিন না, অত উঁচু থেকে দেখতে পাচ্ছি না। তড়িতা ফটোখানা খুলে ওর হাতে দিয়ে বলে—চল আমার ঘরে কটাক্ষে একবার অদূরে উপবিষ্ট রবীনের দিকে চায়, দেখে, কি একটা মাসিক পত্র মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে।

ফটোখানা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে অলকা জিজ্ঞাসা করে-পিসিমা বুঝি এইরকম ছিল আগে? তড়িতা উত্তর দেয়- হ্যাঁ, এখন খুব রোগা হয়ে গেছ নাকি? অলকা বলে—খুব রোগা একেবারে—ফটোখানা ফিরিয়ে দিয়ে তড়িতার সঙ্গে গল্প করে, মুখে শুধু পিসিমার-ই কথা ওর।

চলে যাবার সময় তড়িতা বলে—মাঝে মাঝে এস অলকা, কোলের কাছে নিয়ে আদর করে, তারপর আলমারি খুলে নিজের ছেলেবেলার খেলার পুতুল দেয়, বলে নাও পছন্দ করে যেটা খুসী তোমার; আরক্ত মুখে অলকা বলে—আমি তো আর খেলিনা এখন—রবীনের সঙ্গে দেখা হলে তড়িতাকে জিজ্ঞাসা করে—ও মেয়েটি কার রে? তড়িতা উদাসীন

কুণ্ঠে বলে—ও আমার এক বন্ধুর মেয়ে। তোর বন্ধুর মেয়ে তোকে পিসিমা বলে যে ডাক্‌ছিল?—ও তাই ডাকে, ব'লে ও এড়িয়ে যেতে চায়।

চাকরের হাতে চা টোষ্ট পাঠিয়ে সকালে সেদিন তড়িতা গেছে দাদার খাওয়ার তদারক করতে। ঘরে ঢুকেই দু'পা পিছে আসে বিস্মিত হয়ে। বাইরে দাঁড়ায় বারান্দায়, যেখান থেকে দেখা যায় জানালা পথে ঘরের একটা অংশ, সেইখানে চোখ রেখে দাঁড়ায় ও। দেখে রবীন্ একদৃষ্টে রমলার ফটোখানার দিকে চেয়ে আছে। তড়িতার মনে আশার ক্ষীণ আলো একটু জ্বলে ওঠে। বেশীক্ষণ ও দাঁড়াতে সাহস করে না, যদি দাদা দেখে, কি মনে করবে তার ঠিক নেই।

মনে মনে ভগবানকে বলে—ঠাকুর, দাদার মতিগতি বৌদির অনুকূলে আনো।

(২২)

গিরীনবাবু একখানা কাঠ ছিলে চমৎকার একটি সিং যখন মাস খানেক ধরে পরিশ্রম করবার পর তৈরী করে প্রায় এনেছেন, ঠিক এই সময় একদিন রবীন্ গেল দেখা করতে। কদিন ধরে কুলীদের বস্তী-গুলোয় মড়ক সুরু হয়েছে আবার, তাই ওর সময় ছিল না।

পোল এবার শেষ হয়েছে, অল্প এক আধটু যা বাকী। সরকারের লোকেরা এবার ওখান থেকে তল্পি গুটোনোর কাজে লেগেছে। যা কিছু যন্ত্রপাতি কল কব্‌জা এনেছিল, সব এবার মালগাড়ীতে চালান হতে লেগেছে, যাদের কাজ শেষ হয়েছে তারা পদ্মার কাছে বিদায় নিয়ে অস্থায়ী বাসা উঠিয়ে যে যার স্বস্থানে চলে যাচ্ছে।

—শান্তি তোমার বাবা কোথা? ঘরে বোধ হয় বলে রবীন্‌কে নিয়ে

যায় সঙ্গে করে ও। গিরীন্‌বাবু কি এর মধ্যেই মায়া কাটালেন নাকি? বলে রবীন্ কর্মব্যস্ত গিরীন্‌বাবুর চেতনা আনেন।

নিস্পৃহ কণ্ঠে গিরীন্‌বাবু বলেন—না কাটিয়ে উপায় কি বলুন? বলে আবার মন দেন হাতের কাজে।

রবীন্ ওঁর খুব কাছে গিয়ে দাড়ায়।—ওটা কি হচ্ছে? হচ্ছে একটা কিছু! বলে আবার মন দেন কাজে। রবীন্ আসে শেষ পর্য্যন্ত ওর বৌদির কাছে গল্প করতে।

ডাক্তারবাবু বাড়ী আছেন? বলে সেদিন বিকেলে গিরীন্‌বাবু গিয়ে ডাকেন বাইরে থেকে। রবীন্ সবে মাত্র বেরুবার উদ্যোগ করছে, প্রসাধন শেষ হয়েছে পারিপাট্যের কোন ত্রুটি আছে কিনা দেখবার জন্যে আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে গুন্ গুন্ করে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে। গিরীন্‌বাবুর অপ্রত্যাশিত আগমনে বিস্মিত হয়ে দরজা খুলে দেয়।—আসুন, পথ ভুলে, না যাবার সময়ের ভদ্রতা—গিরীন্‌বাবু ঘরের মধ্যে তখন গিয়ে পড়েছেন।

বিস্মিত রবীন্ গিরীন্‌বাবুর হাতের দিকে চায়। ওটা কি? দেখি দেখি, বলে ওর হাত থেকে নেয় সুদৃশ্য হরিণের সিংটা। ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে জিজ্ঞাসা করে কোথায় পেলেন এটা?

তাচ্ছল্যের সঙ্গে গিরীন্‌বাবু উত্তর দেন—এই জঙ্গল থেকে—

—বাঃ চমৎকার জিনিষ তো, সত্যি বলুন কোথায় পেলেন?

কিছুমাত্র উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে পুনরায় গিরীন্‌বাবু বলেন—বন থেকেই পেয়েছি।

দ্বিগুণ বিস্ময়ে রবীন্ বলে—সেকি!

—এমন সুন্দর-সিং-টা জঙ্গলে পেয়েছেন, এ যে খুব আশ্চর্য্য কথা!

সিং-টা তুলে রাখে সামনের টেবিলে। তারপর মুগ্ধ চোখের সবখানি দৃষ্টি দেয় মেলে। পরক্ষণেই তুলে নেয় হাতে, আর শিল্পীর দিকে নির্ব্বাক চেয়ে থাকে, চক্ষে কৌতূহল নারীই মতই আত্মপ্রকাশ করে। গিরীন্‌বাবুকে প্রশ্ন করে মাঝে মাঝে, আর ওর সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়ে।

রবীনের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে এবার কৃত্রিম ঝাঁঝের সঙ্গেই বলেন—সেই থেকেই বল্‌ছি মশাই, জঙ্গল থেকে পেয়েছি, বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনাকে উপহার দিতে নিয়ে এলাম।

গিরীনবাবু সন্ধ্যের চায়ের নেমন্তন্ন করে চলে গেলেন। রবীন্ অন্য-মনস্ক অনেকক্ষণ থাকে। গিরীন্ বাবুর কথাবার্ত্তার মধ্যে কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন আছে এক গোপন রহস্য। কিন্তু সে কি, বুঝে উঠ্‌তে পারে না রবীন্। শেষ পর্য্যন্ত বেরিয়ে পড়ে, সিংএর প্রসঙ্গ ধামা চাপা রেখে। ফিরে এসে রামপদকে একটা ডাক দিয়ে বসে। নাড়াচাড়া করে, অনেক রকম গবেষণা নিজের মনেই করতে থাকে। রামপদ জুতো মোজা খুলে দিয়ে তার নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য পালন করে যায়। খানিক পরে মুখহাত ধোয়ার যোগাড়যন্তর করে এসে খবর দেয়। চিন্তাচ্ছন্ন রবীন্ স্থানুর মতই বসে থাকে দেখে ডাকে—দাদাবাবু! ও বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্নে কি যাবে না? যদি না যান্ তো বলুন, চা করে দিই না হয়। রবীন্ উঠে পড়ে।—একবারে ভুলেছি রে—আর একবার হরিণের সিং-এর গায়ে হাত বুলিয়ে যেন রহস্যের কোন্ রুদ্ধ দরজা খুলে ফেলতে চায়। কিন্তু না, তা হয় না। সামনে উপস্থিত রামপদ ভৃত্যকেই জিজ্ঞাসা করে বসে—এটা-কি বল্‌ত? ওর হাতে দিতে যায় সিংটাকে।

রামপদ সেটা হাতে নিয়ে বলে—আহা, এ যে একটা হরিণের সিং

দাদাবাবু, এদ্দিন বড়লোকের বাড়ী চাকরী করছি—কেন, কোল্‌কাতায় আমাদের বাড়ীতেই তো দুট আছে, তাছাড়া বাজার দোকানেও কত দেখেছি। মনে করছেন আমি জানিনে—হুঁ—বলে অবজ্ঞার সঙ্গে রাখে টেবিলে।

রবীন্ অপ্রতিভ হয়ে বলে—তা হবে, মনে নেই আমার।—কিন্তু এটা বেশ একটু নতুন ধরণের নয়?

রামপদ বলে—বড়লোকেরা অমন আশ্চর্য্যি অনেক কিছুতেই হয় দাদাবাবু। গরীব্‌রা হলেই লোকে বলে, আদেখ্‌লে, কখনো কিছু দেখেনি, তাই হ্যাংলামি করছে! নিন্ এখন উঠুন, আর খুব তাড়াতাড়ি ফিরবেন কিন্তু, নইলে ভাত কটা শুকিয়ে যাবে, আর খাওরাই হবে না। বলে কাপড় জামা ঠিক করে দিয়ে যায়।

চায়ের টেবিলে নীরেনবাবুকেও দেখা যায়। আবার সিং-প্রসঙ্গ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, রবীন্ জিজ্ঞাসা করে—ওটার যেন কি হিষ্ট্রি আছে বলে মনে হয়, কিন্তু কেন যে বল্‌তে নারাজ—

গিরীন্‌বাবু একটিপ্ নস্য নিয়ে নাকের মধ্যে দিতে দিতে বলেন—ওর আবার ইতিহাস কি থাক্‌বে—ডাক্তারবাবু? রুমালে নাকটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন—আপনারা সহুরে লোক কিনা, তাই একটুতেই যেন—বলেছি জঙ্গল থেকে পেয়েছি, এর বেশী কিছু জানিনে। নাকটা আর এক বার ঝেড়ে নিয়ে ডাক্ দেন—শান্তি, ও শান্তি! আর দুটো পান আর চা তিন পেয়ালা দিয়ে যা রে মা!

রবীন্ এবার চেপে ধরে গিরীনবাবুকে।—বেশ আপনার কথাই ধরলাম, জঙ্গলেই পেয়েছেন। কিন্তু এটা কি এই ভাবেই সত্যি পড়েছিল বল্‌তে চান? এইটাই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। গিরীন্‌বাবু

খুব জোরে হেসে ওঠেন। নীরেনবাবুও মিটি মিটি হাসেন এবং সে হাসি বেশ অর্থপূর্ণ।

রবীন্ লক্ষ্য করে দুজনের চোখে চোখে হাসির ভেতর দিয়েই কিসের যেন ইসারা হয়ে যায়। হাসি থাম্‌লে গিরীনবাবু বলেন—এই ভাবে পড়েই কি থাকে ডাক্তারবাবু? তিনি উঠে ঘরের এক কোণে রাখা কাপড ঢাকা একটা টেবিলের কাছে যান্, তারপর বাঁ হাতে আবরণী কাপড় খানা তুলে সরে দাঁড়ান।—দেখুন এটা কি? রবীন্ তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ায় এবং দেখে আর একটী ঠিক ঐ রকম সিং অর্দ্ধসমাপ্ত প্রায় রয়েছে। বিস্ময়ের সঙ্গে কি একটা বল্‌তে যায় বোঝা যায় না। গিরীন্‌বাবু বললেন—বসুন, শেষ করি এটুকু! বলে টেবিলের কাছে গিয়ে বসলেন এবং পর ক্ষণেই দেখা গেল নিবিষ্ট হয়ে গেলেন নিজের কাজের ভেতর।

বিস্ময়াবিষ্ট রবীনের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে বিস্ময় উক্তি।—একি আপনি—গিরীনবাবুর সাড়া পাওয়া গেল না, উত্তর দিলেন নীরেন বাবু। বল্‌লেন, না হলে কি আপনি ভাব্‌ছেন সত্যিই ঐ ভাবে পড়ে থাকে! জঙ্গলের গাছ থেকেই কাঠের যা কিছু হয় এইটাই বলা উদ্দেশ্য ওঁর। গিরীন্‌বাবু তখন দু'চার জায়গা চাঁচা-দোনার কাজ শেষ করে এনেছেন প্রায়। রবীন্ ওঁর হাতের দিকে চেয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ পর গিরীনবাবু ঘাড় তোলেন। সিংটা হাতে করে তুলে রবীন্‌কে জিজ্ঞাসা করেন—দেখুন সেটার মত হয়েছে কিনা দেখুন। হয়েছে মনে হচ্ছে?

রবীন্ বলে—একবারে ঠিক হয়েছে! আপনি একজন এতবড়

শিল্পী, তা তো কোন দিন বলেন নি! কণ্ট্রাক্‌টারী করেন তাই জানি, এসব শিখ্‌লেন কি করে, কর্‌লেনই বা কখন?

গিরীনবাবু বিজ্ঞের মত হাসেন—মন থাক্‌লে সব হয় ডাক্তার বাবু। সব করা যায়। কাজ কি মানুষের হাত পা করে, চলে, মুখকি কথা বলে? করে তো মন, শরীরকে পরিচালনার ক্ষমতা তো শুধু মনেরই একচেটে, কি বলেন নীরেনবাবু! নীরেনবাবু লোকটী স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী, তার ওপর যে ভূমিকা তাঁর, তাতে সায় দিয়েই যেতে হবে, এই রকম কথাবার্ত্তা আছে। রতনবাবুর দুঃখে অভিভূত গিরীন্‌বাবু বোধ হয় এ সময় একবার তাঁকে মনে করলেন। আর এক টিপ্‌ নস্য নাকে বেশ করে ঠেসে দিয়ে বলেন—ঐ যে কাঠটা সেদিন কুলীদের মাথায় দেখেছিলেন, এ দুটো তার থেকেই তৈরী, বুঝলেন! বলে কাঠের অবশিষ্ট যে টুকু ছিল, সেটা টেবিলের তলা থেকে বের করে রবীনের পায়ের কাছে রাখ্‌লেন।

রবীন্‌ একবার টেবিলের হরিণের সিংটার দিকে আর একবার কাঠের টুক্‌রোটার দিকে চায়। সত্যি আপনার মত একজন বিদ্বান লোকের ক্ষমতা অদ্ভূত বলতে হবে, অধ্যবসায় আছে! না হলে মিস্ত্রিরা তো করেই থাকে এবং কাঠের আসবাব বনের গাছ থেকেই হয়।

কিন্তু আপনার পক্ষে এ খুব আশ্চর্য্য, সামান্য একটা আতা গাছের গুঁড়ি, কিন্তু এ সব খুঁজে বের করলেন কোথা থেকে?

গিরীন্‌বাবু আত্ম প্রশংসা শুন্‌ছিলেন না, তিনি তখন আসল কথা কোন্‌ দিক্‌ দিয়ে পাড়বেন সেই ভাবনা ভাব্‌ছিলেন, আর ঘন ঘন নস্যি ঠাস্‌ছিলেন নাকে; সেই সঙ্গে ডাক্তার বাবুর মনটাও লক্ষ্য

করছিলেন। এবার অন্য প্রসঙ্গ অবতারণা করলেন—এইবার তো আমাদের কাজ শেষ হল ডাক্তারবাবু, আপনি আপনার দেশে আমরা অন্য জায়গায়—বাধা দিয়ে নীরেনবাবু বললেন—বেশ থাকা গিয়েছিল সুখে, পদ্মাকে ছেড়ে যেতে হবে ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে! তাছাড়া এতগুলো ভদ্র পরিবার এখানে এসেছিলেন—গিরীন্‌বাবু বলেন, এই হল কর্মস্থানের নিয়ম, কত জায়গায় বাসা বাধা আর জানা শোনা চেনা করে, শেষে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া—আর তেমন কষ্ট হয় না। রবীন্‌ বল্‌লে—আমি এখন ও সব কথা ভাব্‌ছি না, ভাবছি আপনি কত বড় গুণীলোক, আর কত সাদা সিদে থাকেন, বোঝা যায় না আপনাকে দেখে এত গুণ আছে! দরজা ঠেলে ঘরে আসেন সঞ্জীববাবু, তিনিও ইঞ্জিনিয়ার. তেমন মিশুক নন্। আরো যে সব বাঙালীরা এসেছেন, তাঁরা অত্যন্ত আধুনিক গোছের, নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, বড় একটা এদের সঙ্গে দহরম মহরম হয় নি। সঞ্জীববাবু মাঝে মাঝে আসেন দরকার পড়লে গিরীন্‌বাবুর কাছে। ঘরে ঢুকেই প্রথমে টেবিলের ওপরকার বড় বড় সিংযুক্ত হরিণের মুখখানার ওপর দৃষ্টি পড়ল। বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—এ আবার কোথা পেলেন, এ্যা! গিরীন্‌বাবুও তাঁর কণ্ঠস্বরে চম্‌কে গিয়েছিলেন। তারপর তাঁরই অনুকরণ করেন, ভাণ সেটা অবশ্য। বল্‌লেন—ভূত দেখলেন নাকি সাহেব! অমন করে উঠ্‌লেন কেন? সাহেবী চালে থাকেন বলে সবাই তাঁকে সায়েবই বলে, তিনি ও খুশী হন্ মনে মনে।

গিরীন্‌বাবু উঠে তাঁকে আসন দেন। তারপর অভিবাদনাদি শেষ হলে গিরীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন—ওটা এল কোথা থেকে? তারপর ডাক্তারবাবু ভাল তো? হরিণের মুখটা কিন্‌লেন কবে এবং কোথা

থেকে। নীরেনবাবুর ও রবীনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন এটা কার? ইত্যাদি দেড়গণ্ডা প্রশ্ন ঘরের তিনজনকেই পর পর করেন।

গিরীনবাবু হাসেন। আপনার অত গুলো প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে আমার আসেনা, অত তাড়াতাড়িও পারিনে। সাধে কি দম্‌কা ঝড় বলি সায়েব! বল্লুন, ও মুখ কিনিনি, তৈরী করেছি।

—বলেন কি! আপনার তৈরী? আমাকে একটা দিতে হবে বলে হাতে করে নাড়া-চাড়া করে দেখেন। রবীন সঞ্জীববাবুর আগমনে বিশেষ খুসী হয় না, ও একটু এড়িয়েই চলে, বিশেষ পছন্দ করেনা অত চালবাজ লোক! গিরীন্‌বাবু বলেন—আর যে সময় নেই সায়েব, অনেক দিন সময় লাগে তো! দু'চার কথার পর সঞ্জীববাবু বিদায় নেন —রবীন্ বাঁচে।

নীরেনবাবু বলেন—কপাল জোর সবাই সুখ্যাত করছে দেখে হিংসে কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে।

—যাও না! জঙ্গল ও আছে আতা গাছ ও আছে, কেটে আন এনে তৈরীকর দেখি। নীরেনবাবু কথায় খুব জোর দিয়ে বললেন, পারিনে ভাবছেন বুঝি? নিশ্চয় পারি, কালই পার্‌ব —

গিরীনবাবু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন—নিশ্চয় পারবেন, আমি যা পারি সবাই তাই পারে, চেষ্টা করলে মানুষ কি-না পারে? রবীনকে মধ্যস্থ করেন শেষে। কি বলুন, গড়তে ইচ্ছে হলে সবাই গড়তে পারে কিনা?

রবীন্ মৃদু হেসে বলে—সবাই পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। অনেকেই পারে—রবীনের কথার মাঝখানে নীরেনবাবু বলে উঠলেন—কেন, না পারার কারণ কি? গড়ে নিতে জান্‌লে সব জিনিষ-ই মানুষ

গড়তে পারে, আবার গড়বার ইচ্ছে থাকলে গঠনের প্রণালী, কৌশলও জান্‌বার ইচ্ছে হয়।

রবীন্‌ আর প্রতিবাদ করার মত জোরালো ভাষা খুঁজে পায় না। সহজ কণ্ঠে বলে—হয়ত আপনাদের কথাই সত্যি, এ সত্য আমার কাছে গোপন ছিল, তাই আমি আজ নিজেকে ভাগ্যবান্‌ ভাব্‌ছি? গিরীনবাবু একটা সামান্য গাছের গোড়া থেকে এমন সুন্দর হরিণের মুখ তৈরী করেছেন দেখে মনে হচ্ছে একথা যে, ইচ্ছে করলেই অনেক কিছু মানুষ পারে গড়্‌তে।

গিরীনবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন—নিশ্চয়, প্রথম অবস্থায় সব জিনিষই বিশ্রী, কদাকার থাকে মশাই,—তারপর শিল্পির অক্লান্ত পরিশ্রমে অধ্যবসায়ে সেই বিশ্রী কদর্য্য বস্তুই একদিন চিত্তাকর্ষক, মনোহর জিনিষ তৈরী হয়। বাড়ী বলুন, টেবিল, চেয়ার থেকে মেয়েদের অলঙ্কার থেকে পৃথিবীর যাবতীয় জিনিষই তাই—এই দেখুন না 'সারা' পোল্‌টার কথাই ভেবে—আমরা যেদিন এসেছিলাম সেদিন কি আপনারা ভেবেছিলেন, যার আজ রূপ দিয়েছি আমরা এত চমৎকার? আমাদের প্ল্যানে আঁকা দেখে ও কি অনেকে ধারণা করতে পেরেছিল? আপনি তো সেদিন ছিলেন আজও দেখ্‌ছেন—কত লোকের কদিনের খাটুনির পর তৈরী হল এমন ব্রিজটা?

রবীন্‌ মাথা নেড়ে সায় দেয়। তাছাড়া আপনি তো—ডাক্তার, আমার চেয়ে বেশীই জানেন, আমরা যখন ভ্রূণ হয়ে থাকি মাতৃগর্ভে—সেটার মধ্যেও বোধহয় কোন মনোহারিত্ব কোন আকৃতিগত সৌন্দর্য্যই থাকে না একটা মাংসপিণ্ড ছাড়া কিন্তু সেই থেকেই ক্রমশঃ অবয়ব গঠিত হয়ে শেষে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়।

—আপনার কথা সবই সত্যি, আজ আমার মনে হচ্ছে—বলে রবীন্ সহসা চুপ করল। একটু পরে বল্লে—মানুষকে কি করে গড়ে নেওয়া যায় বলুন? সে সম্বন্ধে আপনার মত কি?

গিরীনবাবু এবার সতেজ কণ্ঠে বলেন—মত একই, মানুষকেও নিজ প্রয়োজন মত গড়েই নিতে হয় এবং গড়া ও যায় যে, আপনার স্ত্রীর ওপর দিয়ে পরখ করতে পারেন। এতদিন আপনি মহা ভুলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন, কিন্তু বিয়ের পর থেকে যদি তাঁকে নিজের মনের মতন করে গড়বার চেষ্টা করতেন, এতদিনে দেখতেন তিনি আপনার মনের একখানি জীবন্ত প্রতিমা হয়ে গেছেন, এখনো যদি কিছু দিন ধরে তাঁকে গড়বার চেষ্টা করেন ঠিক শুভ ফলই পাবেন দেখ্‌বেন। হাতী হেন জন্তু, সাপ হেন খলশ্রেষ্ঠ সরীসৃপকে যদি মানুষ নিজ প্রয়োজন মত করে গড়ে নিতে পারে, তাদের যদি অনুগত ভৃত্যে পরিণত করা যায়—কি বলুন নীরেনবাবু? তাহলে মানুষকে কেন গড়ে নেওয়া যাবে না বলতে পারেন? রবীন্‌কেই তিনি প্রশ্ন করে বস্‌লেন।

নীরেনবাবু সায় দিয়ে বল্‌লেন—নিশ্চয়, আপনার যুক্তি অকাট্য। চেষ্টা কোন দিন করেন নি তো, একবার করে দেখুন না ডাক্তারবাবু! বলে নীরেনবাবু রবীনের মুখের দিকে চান উত্তর শোন্‌বার আশায়।

আজকের এই আলোচনায় রবীনের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল রমলার মুখ এবং গড়ে নেওয়া যায় শুনে মনে মনে তারই আন্দোলন করছিল ও নীরেনবাবুর কথায় পুনরায় গিরীনবাবুকে প্রশ্ন করলে—সব মানুষই কি গড়ে নিতে পারে বল্‌তে চান, না সবাইকেই গড়া যায়?

কৃত্রিম রাগের সঙ্গে গিরীনবাবু তীব্র প্রতিবাদ করলেন—

—যায় না কথাটা বলছেন শুধু, কিন্তু কেন যায় না প্রমাণ দিন। আমি যদি ছাপ্পান্ন বছর বয়সে এতখানি ধৈর্য্যের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় একটা কাঠ থেকে দু'দুটো হরিণের মুখ তৈরী করতে পারি, আপনি একজন বাঙ্গালী মেয়েকে পারেন না বিয়ে করে গড়ে নিতে? যান কালই বাড়ী গিয়ে তাঁকে আনুন, আর নয়ত বলুন আমিই গিয়ে তার ব্যবস্থা করি! রবীনকে নীরব দেখে পুনরায় বলেন—বলুন।

বাইরে থেকে রামপদর গলা শোনা যায়—দাদাবাবু রাত যে পুইয়ে এল—রবীন্ ও ঘরের আর সকলের চমক ভাঙল রবীন্ হাতের ঘড়িটা দেখে উঠে দাঁড়ালো, কাল যা হয় বল্‌ব আজ যাই—

—না আমায় বলে যান- আমি কালকেই ব্যবস্থা করব। আপনার বাবার কাছে বাকদত্ত হয়ে আছি, নীরেন তুমি আমার বাসায় ভার দুদিনের জন্যে, আমি কালই ডাক্তারবাবুকে নিয়ে কল্‌কাতা যাব।

রবীন্ বলে—ছুটি না নিয়ে—আর মশাই কাজ তো শেষ হয়ে গেল, আর ছুটি কি হবে? আপনি ঠিক হয়ে থাক্‌বেন সকালের ট্রেণেই যাব আমরা। বাড়ীতে অসুখ বিসুখের নাম দিয়ে একটা দরখাস্ত করে দিয়ে যান।

(২৩)

—কলেজ থেকে তড়িতা দেখে দিদিরা এসেছে। প্রায়ই আজ কাল ওরা আসে বেড়াতে। পিতার সঙ্গে দেখা করা বাড়ী ফিরে-ই তড়িতার প্রথম কাজ। ঘরে গিয়েই দেখে খুব জটলা চলেছে, মা-ও সেখানে উপস্থিত এবং জটলার বিষয় বস্তু হল দাদার নতুন করে বিয়ের ঠিক করা। তড়িতা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে যতটুকু কানে যায় তার

থেকেই আন্দাজ করে নেয় বাকিটা। যথারীতি পিতার সঙ্গে দেখা করে চলে যায় নিজের ঘরে। মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত ভাব নিয়েই খেতে বসে হঠাৎ ওদিকে কিসের একটা সোরগোল শুনে বাইরে আসে কিন্তু বুঝে উঠতে পারে না। কোন রকমে খেয়ে নিয়ে যায় ও পিতার ঘরের দিকে। দরজার কাছ থেকে যা দেখ্‌তে পায় তাতেই বিস্মিত হয়ে যায় এবং মনে মনে প্রমাদ গণে।

দেখে রবীন্‌ ও একজন অচেনা ভদ্রলোককে ঘিরে প্রণতা, ললিতার আনন্দ কোলাহল। তড়িতা ঢুকতে পারে না প্রথমে, ললিতা বেরিয়ে আসে এবং খুব হাঁক ডাক করে—তারই ফাঁকে তড়িতা ওকে প্রশ্ন করে ব্যাপার জেনে নিতে সুযোগ পায়।

রবীন্‌ পিতার পদধূলি নিয়ে মায়ের সন্ধানে চলে যেতেই তড়িতা ইতঃস্তত করে ঘরের ভেতর প্রবেশ করে পিতার পায়ের কাছে বসে। রতনবাবু পরিচয় দেন—এইটি আমার ছোট মেয়ে তড়িতা। তড়িতা প্রণাম কর মা। বলে রতনবাবু কি একটা বলতে যেতেই বাধা পান। গিরীন্‌বাবু বলেন—আমার এখানে আস্‌বার উদ্দেশ্যই হল আপনাকে সুখবর দেওয়া! আজই টেলিগ্রাম করে খবর দিয়ে দিন শুভস্য শীঘ্রং দেরী করবেন না।

তড়িতা বিহ্বলের মত একবার গিরীন্‌বাবুর দিকে আর পরক্ষণেই পিতার দিকে চায়। রতনবাবু একবার ওঠেন একবার বসেন। আনন্দের আতিশয্যে উঠে গিয়ে গিরীন্‌বাবুকে একবার বুকে চেপে ধরেন একবার ওঁর হাত দুটো ধরেন আবেগ কম্পিত হস্তে।

—তড়িৎ শুনেছিস্‌, বৌমাকে রবীন্‌ আনতে যাবে—সরকার মশাই যান টেলিগ্রাম করতে যান। বিস্ময় বিহ্বল তড়িতার এবার বিশ্বাস

হয়, সে আর স্থির থাক্‌তে পারে না। প্রণতারা রবীনের সঙ্গেই চলে গিয়েছিল তড়িতাও ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়ে যুক্তকরে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে কৃতজ্ঞ অন্তরের আনন্দাশ্রুও দেয় নীরবে তাঁর পাদপদ্মে।

টেলিগ্রাম পড়বার মত লোক বাড়ীতে কেউই নেই বলে রমলাকে প্রতিবেশীদেরই শরণাপন্ন হতে হয়। ইংরেজি জানা একজনকে ডেকে এনে তবে টেলিগ্রাম সই করা এবং শোনা হয়। ভজু পাড়ারই একটি সদ্য ম্যাট্রিক পাশ ছেলে। সুখবর শুনিয়ে দেব বৌদি, কি পাব যদি শুনতে পাই—বলে ললিতাকে ঠাট্টা করে। তারপর টেলিগ্রামের মর্মার্থ বাংলায় অনুবাদ করে শুনিয়ে দেয়।

উৎকর্ণ রমলার চোখে হু হু করে অশ্রু এসে পড়ে। উল্লসিত হয়ে ওঠে ললিতা।—ঠাকুরজামাই নিতে আস্‌ছেন! তোমাকে একদিন খাওয়াব ভাই, সত্যি সুখবরই বটে। কিন্তু বাড়ীতে একজনও কেউ বেটাছেলে নেই—কি হবে ঠাকুরঝি? নমিতাও নেই এখানে— চিন্তাচ্ছন্ন মুখে ললিতা রমলার দিকে চায় সে থাক্‌লেও অনেক ভরসা ছিল তবু—

—সময়ও তো নেই যে দাদাদের চিঠি দিয়ে জানাব—কালই যে আসবার কথা—বলে তাঁর থালা হাতে নিয়ে উঠে যায়।

পাড়ায় খবরটা পরিবেশন করে ভজু। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দু'একজন করে কয়েকজন মহিলা এসে উপস্থিত হয়। দীনেশ চক্রবর্ত্তীর মেয়েটাকে জামাই এতদিনে নিতে আসছে। এ খবরে পাড়া সরগরম হয়ে ওঠে। কেউ সহানুভূতির দম্‌কা ছিটে ফোঁটায় রমলার দুঃখ লাঘব করে, কেউ নতুন হুজুগের গন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওদের বাড়ী ছোটে।

লতিকা কচি ছেলেটাকে কাজল-টিপ প্রভৃতি প্রসাধন করে দিচ্ছে; রমলা অদূরে বসে সন্ধ্যা প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছে। এক একখানি কাপড় নিয়ে, পাশে গোছা করা কতকগুলো মৃৎ প্রদীপ বসানো রয়েছে। টুনকু এসে মায়ের কাছে দুটো পয়সার জন্যে বায়না ধরেছে এমন সময় আসে তিন মূর্ত্তি। শামুদি, কালোর মা, দাসী ঠাক্রুণ। ওদের গলার আওয়াজে রমলা মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সদর দরজায় ঢুকতে ঢুকতে নিজেদের আগমন গৃহস্বামীকে জানানোই ওদের রীতি। তাই কি লো, কি কর্‌ছিস্ ও-রমু, তোর বর আস্‌ছে বল্‌তে বল্‌তে উঠোনে এসে উপস্থিত হন। খ্যাতনামা, প্রৌঢ়া এই তিনজন মহিলাকে গাঁয়ের লোকে চিরদিন ভয় করে। সম্মান খ্যাতিতে তাঁদের এমন কিছু যায় আসে নি, রমলা সভয়ে একবার তাকিয়ে মনে মনে প্রমাদ গণে। মুখে বলে, হাঁ ঠাকুমা, সেই খবরই এসেছে তো!

লতিকা বসতে বলে।—বস্‌ব না আর এখন, কাল তখন নাত-জামাই এলে আস্‌ব, খবরটা শুনে আনন্দ হল, তাই একবার এলাম। বলে দাসী ঠাক্রুন আনন্দ প্রকাশ করে।

কালোর মা বলে—যাই হোক্ এখন বরের সুনজরে পড়ে সেই ঘরই করুক রমু, তোমরাও বাঁচ ছা-পুষ্যি নিয়ে, খরচ তো কম নয়, তার ওপর ননদটীকেও তো পুষতে হচ্ছে—আহা! মরে নাই—একটা লোককে চিরটা কাল পোষা তা বড় সোজা নয়!

দাসী ঠাক্রুণ ঘাড় বেঁকিয়ে নাকের নথটা দুলিয়ে সায় দেন—তা আর নয়! যা হোক্ দীনেশ কাকার ছেলে-বৌগুলি ভাল তাই 'টু' শব্দটীও ননদ-ভাজে কি ভাই বোনে কোন দিনের তরেও হয়নি! দাসী ঠাক্রুণের কথায় লতিকার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

—অমন ননদ কারু হয় না ঠাকুমা, ও চলে গেলে আমি যে কি করে এই হাওদাখানা বাড়ীতে একলা থাকব তা জানিনে! বলে লতিকা আঁচলের খুঁটে চোখের জল মোছে। রমলা সন্ধ্যার প্রদীপ হাতে এদিকে আসে দেখাতে দেখাতে—ওমা, নাতনীর সন্ধ্যে পড়ে গেল যে! বলে শামুদিদি উঠে বাড়ী মুখো ছুটল।

লতিকা বলল—সেই থেকে যে দাঁড়িয়েই রইলেন গো, বাবা, কোমরও কি ব্যথা করে না বাপু? একটু বসুন।

—এই পৈঁঠেয় একটু বসে যাই বলে দাসী ঠাক্‌রুণ সিঁড়ির একটা কোণে বস্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে কালোর মাও বস্‌ল। লতিকাও এসে বসে দাসী ঠাক্‌রুণ বলে—ছ্যাও, আমাদের কাল আর আজকাল নেই —রমলা এসে দাঁড়ালে লতিকা রমলাকে রান্না ঘরে যেতে বলে।

রমলা মন্থর গতিতে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। রমলা অদৃশ্য হলে দাসী ঠাক্‌রুণ বলে—কথায় আমাদের যা আছে এখনকার লোকেরা মানুক আর না মানুক, যতই মেয়েলি শাস্তর বলে উড়িয়ে দিক্ তবু তা' হচ্ছে তো! 'অতিবড় সুন্দরী না পায় বর— অতিবড় ঘরণী না পায় ঘর।' দেখ ঠিক কিনা?

কালোর মা বলে—যা হবার হয়ে গেছে, চিরদিন সমান যায় না মানুষের, একদিন সুখ একদিন দুঃখ আছেই—মনিষ্যি জন্ম নিয়ে শুধু সুখ কি শুধুই দুঃখ হয় না কারুর, এতদিনে দুঃখের ভোগ টুটল বোধ হয়, তাই আমাদের নাত্-জামায়ের মনে পড়ল নাত্‌নীকে।

লতিকা বলে আমাদের এখানে কত কষ্ট পেলে, এখন আপনাদের দশ জনের আশীর্ব্বাদে যেন সেই ঘরই পায়। কিন্তু বাবা যদি আজ

বেঁচে থাকতেন ঠাকুমা, তাহলে কি আনন্দের দিন আজ! আহা, কত কষ্ট ঠাকুরঝির জন্যে পেয়ে গেছেন তার ঠিক নেই—

—কি আর করবে বল, তার কপালে মেয়েটার সুখ দেখা নেই শেষ বয়সের একটা মেয়ে, তেমনি কষ্টই মেয়ের জন্যে হল, আহা বড় ভাল ছিল গো দীনেশ কাকা। কি আর করবে বল ভেবে, কেঁদে উপায় তো নেই কিছু, সবই বিধাতার লেখা। যা হোক তিনি চলে গেছেন বুড়ো হয়েছিলেন, মেয়েটার সারা জীবন এখন পড়ে আছে ওর সুখ হলেও তোমরা খালাস পাও। বলে পাড়ার মেয়ে-মোড়ল দাসী ঠাকরুণ উঠে দাঁড়ায় ডান হাতে হাঁটুতে ভর দিয়ে। যা বলুব বাছা উচিৎ কথা। কালোর মাও উঠে—আজ যাই, বসব বলে অনেকক্ষণ বসা হল নাতবৌয়ের কাছে—লতিকা ছেলেটাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, আবার আসবেন যেন।

—হ্যাঁ লো হ্যাঁ,—আসব বৈকি, কাল নাত্‌জামায়ের কোলে বসব এসে অনেকক্ষণ। বলে দুই-মুচ্ছদ্দি চলে যায়।

লতিকা রান্নাঘরে এসে জিজ্ঞেসা করে রমলাকে—কি চড়ল, কি নামল ঠাকুরঝি? সাড়া দিলে না রমলা। ও রান্না চড়িয়ে পিঁড়েয় বসে কাঁদছিল। লতিকা ওর কাছে গিয়ে বসে কি হল ঠাকুরঝি?

আঁচলে চোখ মুছে রমলা বলে কিছু না—তুমি ওঠ আমি বাকীগুলো করে নিচ্ছি।

রমলার হাত ধরে রান্নার পিঁড়ি থেকে উঠিয়ে দেয়। কেঁদ না ভাই, তোমার চোখে জল দেখলে আমার বড্ড কষ্ট হয়। সেই কবে এসেছি তোমাদের বউ হয়ে, তুমি তখন কতটুকু তার ঠিক নেই, আর তোমার জীবনের ওপর দিয়ে আজ কত ঝড় বয়ে গেল, কত কাণ্ডই

হয়ে গেল—লতিকার ডাগর চোখ ছুটো ছাপিয়ে টলটলিয়ে উঠ্‌ল অশ্রু বেরিয়ে আসবার জন্যে বাইরে, আজ যাবার জন্যেই ঠাকুরঝি বেশী কষ্ট হচ্ছে—তোমার ভাবনা ভেবেই তিনি গেলেন—টুন্‌কু এসে জানায়—পড়া হয়ে গেছে পিসিমা, এস তুমি পড়া নেবে এসো। পেছনে অশোকা দাঁড়িয়েছিল, ফস্‌ করে বলে বসে—না পিসিমা, পয়লা নম্বর ফাঁকিবাজ ও, একটুও পড়েনি এতক্ষণ ঘুড়ির কাগজ কাটছিল—

—কাট্‌ছিল বলে টুন্‌কু চটাস্‌ করে এক রামচড় দেয় ওর মাথায়। অশোকা মাথাটা ধরে ধপ্‌ করে বসে পড়ে। দেখ্‌ছ পিসিমা দেখ্‌ছ, তোমার ভাইপোর কাণ্ড দেখছ? রমলা উঠে এসে অশোকার মাথাটা নেয় নিজের কোলের ভেতর।—আহা দেখ দিকিনি—কি জোরে চড় মারলে! লেগেছে খুব তোর? হ্যাঁরে অশোকা লেগেছে? বলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

লতিকা বকে—হতভাগা ছেলে, লাগবে না মাথায়?

অশোকা অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—দেখ না মা, শুধু শুধু আমায় মারলে। আমায় মারলে কি হবে পড়া যে হয়নি সে তো পিসিমা এখুনি দেখ্‌তেই পাবে! বলে মাথা নেড়ে মুখ ভঙ্গি করে শাসায়।

টুন্‌কু রেগে যায়। দেখতে পায় তো কি হবে? পিসিমা তো আর মারবে না কাকীমার মতন! লতিকা হাসি চাপ্‌তে পারে না।—দেখছ ঠাকুরঝি, দুষ্টুমি বুদ্ধি দেখ—বলে কড়ায় ফুটছিল তরকারী, সেটাকে নামিয়ে আর একটা কি চড়ায়। পিসিমা তো কাল চলে যাবে রে—তখন তো মার খাবি কাকীমার কাছে।

দুই ভাই বোনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করে কোথায় চলে যাবে মা? ফুটন্ত মাছের ঝোলে খুন্তী দিতে দিতে লতিকা বলে—কেন নিজের বাড়ী চলে যাবে পিসিমা। তোরা রাতদিন জ্বালাতন করিস এবার রাগ করে চলে যাবে দেখিস!

ওদের পড়া দেওয়া আর হয় না, দুজনেই রমলার গায়ের ওপর পড়ে দুদিক্ থেকে। অশোকা রমলার চিবুক ধরে নেড়ে জিজ্ঞাসা করে—বলনা পিসিমা, সত্যি তুমি কাল চলে যাবে! টুনকু ওকে ধমক দেয়, দ্যুৎ, ও মিছে কথা মায়ের! তারপর ওর দিকে চেয়ে বলে—এইটেই তো পিসিমার বাড়ী বোকা! নয় গো পিসিমা? রমলা সম্মতি সূচক মাথা নেড়ে জবাব দেয় এই তো আমার বাড়ী বাবা! টুনকু জয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।—দেখ্ দেখি—তুই কিছুই জানিস্ না।

রাত্রে শুতে গিয়ে লতিকা বলে—রাত পোয়ালে কি যে করব ঠাকুরঝি, তাই তো ভেবে পাচ্ছি না, বাড়ীতে তো কেউ নেই, সত্যি ঠাকুর জামাই এলে যে কি করব আমরা দুজনে—বাধা দিয়ে রমলা বলে—কি আর করব, যা পারব করব। একটু যেন অন্যমনা হয়ে পড়ে রমলা। সত্যি কি স্বামীর মন বদলেছে! নিশ্চয় বদলেছে, নইলে তড়িতা অন্ততঃ জানাতো তাকে—আশায় আনন্দে বেদনায় রমলার মন দুলতে থাকে।

লতিকা ওর মাথাটা উস্‌কো খুস্‌কো দেখে বলে চুলটাও কি আঁচড়ে একটু সিন্দুর পরতে পার না ঠাকুরঝি? কি বিচ্ছিরি স্বভাব তোমার চিরুণীখানা আন দিকিন্, যাও শীগগীর আন। মৃদু প্রতিবাদের সুরে রমলা বলে রাত দুপুরে চুল বেঁধে আর—তা হোক্

কতদিন বলেছি কিছু হওয়ার জন্যে নয়, সধবা মেয়ের এলো চুলে রাত্রে শুতেই নেই বিছানায়।

রমলা আর দ্বিরুক্তি করে না, মোটা চিরুণীখানা আর সিঁদুরের কৌটাটা নিয়ে আসে। রমলার চুল নিয়ে লতিকা বসে। কোন রকমে একটু আঁচড়ে একটা বিনুনী খাড়া করে যা হয় করে জড়িয়ে দেয়। দেখ দিকিনি চুলের কি খোয়ার, অমন চুল—বলে পিঠটা মুছিয়ে দিয়ে বলে—সাম্‌নে ফের, সিঁদুর দিই। চিরুণীর ডগায় সিঁদুর নিয়ে পরিয়ে দিয়ে ডান হাতের গোটা তিনেক আঙ্গুলের ডগা ওর ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়ে নিজের ওষ্ঠে স্পর্শিত আঙ্গুল ঠেকিয়ে একটু চুক্ শব্দ করে।

রমলা গড় হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নেয়।—দেখি তোমার চুলটাও আঁচড়ে দিই—দাও একটা বিনুনি পাকিয়ে—বলে পেছন হয়ে বসে। রমলার আজ ঘুম আসে না বুকের মধ্যে তোলপাড় করে বিয়ের পরের বছর কটা। ভিড় করে ওর মনের মধ্যে তড়িতা, রতনবাবু, রবীন্ আজ আবার অনেকদিন পরে স্বামীর প্রেম, শ্বশুর বাড়ীর সুখময় দিন গুলোর ছবি তার সঙ্গে অনাস্বাদিত নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ বস্তু স্বামীর দেওয়া আদর সোহাগ, আবার এদিকে দাদা বৌদিদের, ভাইপো ভাইঝিগণের মায়াও বিপর্য্যস্ত করে একসঙ্গে।

একটু তন্দ্রা আসে ওর, চিন্তাচ্ছন্ন মনেই ঘুমিয়ে ভাবতে ভাবতে শেষ রাতে। হঠাৎ বিপিনের দরজা ঠেলায় ডাকা ডাকিতে ধড় মড় করে উঠে বসে, লতিকাকেও জাগিয়ে তোলে। বিপিন এসেও রবীনের আসবার কথা-ই জানায়, রমলা ও লতিকা ওরা হাঁপ ছাড়ে।

টুনকু অশোকা সকালে ঘুম থেকে উঠেই পিসিমার চলে যাবার কথায় ছাড়ে না আর রমলাকে। বায়না ধরে টুনকু, আমি তোমার সঙ্গে যাব পিসিমা—অশোকাও ধুয়ো ধরে। তুমি বুঝি একলাই যাবে? আমিও যাব পিসিমা। রমলা বলে—আমি যাই আগে তবে তো যাবি ও হাসে। যা খেলা করগে যা।

টুনকু নাছোড়—তুমি আমায় নিয়ে যাবে বল—কেন এর বেলায় উত্তর দিচ্ছ না কেন? তুমি যদি চলেই যাও তো থাকব কি করে? কেই বা গল্প বলবে, কেই বা ঘুমিয়ে গেলে খাইয়ে দেবে কেই বা পড়া ধরবে—তোমার যাওয়া হবে না তাহলে। বিজ্ঞবৎ বলে ও।

রমলা বলে—কেন, আমি গেলেই বা, তোর মা, কাকীমা অলকাদি থাকবে—না ওরা পারে না কিছু, তাছাড়া ওরা মারে, বকে, গাল দেয় আরও কত কি করে—না তোমার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হবে না।—মাথা সজোরে নেড়ে টুনকু বলে। অশোকা বলে—আমি তাহলে মরে যাব পিসিমা, বেশ হবে তুমি তখন বুঝবে।

সকাল থেকে কাজের যেমন হুড় বাড়ীতে, তেমনি ওরাও ছাড়ে না পিসিমাকে। রমলা সান্ত্বনা দেয় -দুদিন পরেই তো চলে আসব, তাছাড়া ওখান থেকে খেলনা, পুতুল পাঠিয়ে দেব—রাগ করে টুনকু বলে—চাই না তোমার খেলনা পুতুল ও সব নেবে কে? রমলার চোখে জল আসে। সত্যি বিশ্রী লাগছে বৌদি লতিকাকে বলে। এই সব ছোট ছেলেপিলেদের কাঁদিয়ে গিয়ে কি আমারই মন টিকবে? দেখ দিদি—বরাবর যাওয়া আসা থাকলে ওরা আমায় এমন করে চিনত না, আমারও এত কষ্ট হত না—রমলার চোখ সজল হয়ে আসে।

লতিকার চোখও শুকনো থাকে না। কিন্তু কি যে বলবে তা-ও ভেবে পায় না। বাড়ীতে আজ হর্ষ ও বিষাদ যুগপৎ দেখা দেয়।

রমলার বড়দা বিপিনের আজ আর এতটুকু অবসরও নেই বেচারা বোধহয় ঘণ্টা দুয়েক মাত্র বিশ্রাম করেছে ভোরেই উঠে মাছ ধরাবার জন্যে জেলে বাড়ী যাওয়া তার পর পুকুর ধারে দাঁড়িয়ে থেকে মাছ ধরানো, হাট বাজার করা নিয়ে ব্যস্ত। দুপুরে অনেকটা বেলায় স্নান সেরে খেতে বসে, বসে রমলার সঙ্গে অতীতের দুঃখময় সেই দিনটার আলোচনা করে।

—যেদিন তোর হাত ধরে এনেছিলাম রমা, সেই ভয়ানক দিনটার দুর্য্যোগের কথা-ই বেশী করে আজ মনে পড়েছে উঃ! বিজনেরই কি কম দুঃখ হল? সে চির অপরাধী রয়ে গেল বাবার কাছে—বলে বিপিন জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে। কি ভয়ানক ভাবেই না সে রাত্রিটা আমাদের কেটেছিল—রবীনের ব্যবহার ভোলবার নয়, তবু আজ তোর মুখ চেয়েই ক্ষমা করতে হল।—দাদা ওসব কথা আর বলনা—বলে রমলা ছল্‌ছল্‌ চোখে চায়।—ওকি, কিছুই যে খেলে না— খাও—মাছটা অতি কষ্টে ধরালে—

—খেয়েছি রে খেয়েছি। বলে বিপিন উঠে যায়।

পানের জন্যে বিপিন আসে। রমলা পান সাজছিল, ডিবেটা বিপিনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—বড়দা, যারা তোমাদের দুঃখ দিয়েছে আমাকে অপমান করেছে, আমারও আর যেতে ইচ্ছে নেই—

—তবু যেতে হবে, তারা যখন নিজেরা আসছে নিয়ে যেতে— বলে। হয়ত ভুল ভেঙেছে। কিন্তু তাই বলে তোমরা যেন আমায় ভুল

বুঝ না বড়দা! আবার যদি কোন দিন আস্‌তে হয়—রমলা আর বলতে পারে না কণ্ঠ কে যেন চেপে ধরে।

লতিকা বলে—ছিঃ ঠাকুরঝি কেঁদনা ভাই—মেয়েমানুষের সেই ঘরই সব।

বিপিনও উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে—তোকে সেই ঘরেই যেতে হবে রমা, ডাক পড়েছে যখন নিজের ঘরেই তোর, তখন আর তো পারি না এখানে ধরে রাখতে আমি—কিন্তু যে তোর নারীত্বকে এদ্দিন বঞ্চিত করে লাঞ্ছিত করে সুখী হতে চেয়েছে পায়নি—সে তা পায়নি বলে তাই তোর কাছেই আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখিস্, অতীতকে নিয়ে আর কোন দিন নাড়িস না সে অতীতেরই অতলে ডুবে থাক্, না হলে নিজেও শান্তি পাবি না তাতে ও সংসারকে শান্তি পরিবেশন করতে ও পারবি না। দে, আর দুটো পান দে বলে হাত বাড়িয়ে দেয়। ঠিকই তুই বুঝেছিস্, রবীন্ ভুলই করেনি? মহাভুল করেছিল—কিন্তু তাই বলে আমাদেরও ভুলিস্ না বোন্, এখানে তুই যে গণেশ জননী হয়ে বসেছিলি, তোর অনুপস্থিতিতে তারা স্নেহ হারা হয়ে থাকবে মাঝে মাঝে খুসী মত চলে আসবি বেড়াতে।

লতিকা বলে—আজই তো বাড়ীটা কি রকম ফাঁকা লাগছে।

টুনকু অশোকা কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ায়। গোটা এক গা ধুলো মেখে কাঁদতে কাঁদতে ওদের সাথের আর গোটা কতক পাড়ার ছেলে মেয়ে কিসের নালিশ নিয়ে আসে, বিপিনকে দেখে শিশুর দল যায় থমকে দাঁড়িয়ে—রমলা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি উঠে যায়। পড়েছিল বুঝি! বলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চায় অশোকার দিকে। অশোকা ভয়ে ভীত হয়ে বলে—হ্যাঁ পিসিমা, এত দুষ্টুমি করে যে কিছুতেই

নিতে পারি নে।—তাই ফেলে দিয়েছ? বলে গোরার পায়ের ধুলো ঝেড়ে দেয় আঁচল দিয়ে। তারপর কোলে করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে খুব বুঝি লেগেছে গোরাচাঁদ? গোরার ঠোঁট দুটো আরও ফুলে ওঠে।—হু। গোরাকে রেখে ওদের খেলা করতে যেতে বলে রমা এসে আবার পান নিয়ে বসে। লতিকা বলে—ঠাকুরঝি, আজ কি খাবেও না? গোরাকে নিয়ে তুমি শোওগে একটু, স্বামীকে বলে।

বিপিনের কাছে গোরা যাবে না, পিসিমার কাছেই থাকবে। বিপিন রমলার কোল থেকে ছিনিয়ে জোর করে নিতে গিয়ে পারে না। পরাস্ত হয়ে বলে—তুই চলে গেলে ওদের কি হবে রে তাই ভাবছি! শিশু মনের যে দুঃখের দিন আসবে—এ্যা! আর এই গোরাকে রাখা আরও কষ্টকর হবে দেখছি বড়বৌ—আড়াই বছরের ছেলে গোরাচাঁদ যেন বাপের কথা বুঝতে প্যারে সব। তাই ঘাড়টা ফিরিয়ে দেখে একবার বিপিনের মুখ। পরক্ষণেই পরম নিশ্চিন্তে রমলার কাঁধে মাথা রেখে চোখ বোঁজে। রমলা বলে—খেতে দাও, তুমি নাও—আমি গোরাকে শুইয়ে আসছি, ঘুম এসেছে দেরী নেই।

বিকেলে লতিকা হরির মাকে পাঠায় নাপতিনীর কাছে। যাও গো দিদিমনিকে আলতা পরিয়ে দিয়ে যেতে বল আজই। টুনকুকে পাঠায় শাঁখারি বাড়ী।—যা তোর শাঁখারি পিসিকে ভাল শাঁখা আনতে বলে আয় তো টুনকু। বিপিন ষ্টেশনে ওদের আনতে বেরিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেয়ে বলে যায় স্ত্রীকে—আমার সুটকেশটা খুললে দেখতে পাবে দু'গাছা চুড়ি আছে নীল কাগজ জড়ানো, আর

একটা সায়া, একখানা কাপড়, ওকে পরিয়ে দিও তুমি। লতিকা আচ্ছা বলে চলে যায়।

রমলার হাতের ক্ষয়া শাঁখা খুলে বেণী শাখারির বৌ নতুন শাঁখা পরাতে পরাতে বড়বৌকে বলে দিদি ঠাকৃরুণ শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছেন বৌদিদি, আমার শাঁখা পরার জোরে দেখ্‌বেন ছেলে কোলে নিয়ে আস্‌বেন আর বছর, আজ কিন্তু আমি শুধু শাঁখার দাম নিয়েই যাব না একটা সিদেও নেব। দিদি ঠাকৃরুণ শ্বশুর ঘর করুক মনের সুখে। বলে রমলাকে শাঁখা পরিয়ে প্রণাম করে।

লতিকা উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে ওঠে—তাই তোমরা বল সবাই ছোট বড়র আশীর্ব্বাদে স্বামীর ঘরই করুক জন্ম জন্ম, দেব বৈকি, নিয়ে যাও। রমলা শাঁখা পরে প্রণাম করে বৌদিকে। লতিকা অশ্রুপূর্ণ চোখে বাষ্পাকুল কণ্ঠে অস্পষ্ট ভাষায় কি বলে আশীর্ব্বাদ করে বোঝা যায় না।

বেলা পড়ে এলো, এস চুলটা বেঁধে দিই। বলে ওর চুল নিয়ে বসে যায় লতিকা। আমি কি ছাই বাঁধতেই জানি, আজ নমিতা থাকৃলে ভাল হত। বলে লতিকা সিন্দুরের টিপটা একটু বেঁকে যাওয়ায় নিজ কাপড়ের কোন্‌টা আঙ্গুলে জড়িয়ে আশ-পাশ মুছে মানানসই করে দেয়। রমলা বলে—বেশ হয়েছে বাপু, জ্বালিয়ো না আর সবাই মিলে।

হরির মা এসে ডাকে—কই গো বৌদিদি, নাপিত বউ এসেছে। বলতে বলতে দালানে ওদের দেখতে পায়। লতিকা বলে একটু বস, গা-টা ধুয়ে নিক্—যাও ঠাকুরঝি গা ধুয়ে এস। দেতো রে

হরির মা দু'টব জল তুলে কুয়োর। বলে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে চলে যায়।

রমলা আল্‌তা পর্‌তে বসেছে টুন্‌কু অশোকা এসে বসে ওর গা ঘেঁষে। পিসিমা, আমি আল্‌তা পর্‌ব। পর্‌না, কে বারণ করছে। বড় বৌদি, এস আল্‌তা পরে যাও। বলে লতিকাকে একটা ডাক দিয়ে অশোকার চুলের বেড়া বিনুনি করতে বসে। টুন্‌কু কাছে বসে থাকে। আজ কাকীমা, অলকাদি, ওরাও আসবে পিসিমা! বেশ কর্‌বে, কিন্তু তুমি একটু পরিষ্কার হও দিকিনি বাবা—যাও গামছা খানা একটু ভিজিয়ে নিয়ে এস তো! টুনকু বলে আজ আর খেলা করতে একটু ভাল লাগছে না। গোরাকে নিয়ে অশোকাও গিয়ে পথের রোয়াকে বসে থাকে। লতিকা বলে—দেখ গে যা, এখুনি কত লোক আসবে। মেজ কাকা, ছোট কাকা, কাকীমা, অলকা, অরুণ, তারপর একজন আস্‌বে সে তোর পিসেমশাই হয়, দেখ্‌বি। বলে টুন্‌কুকে সান্ত্বনা দেয়। দুরন্ত ছেলে একদণ্ড যে স্থির থাকে না, আজ সে মুখ চুপ করে রমলার কাছেই ঘুরে বেড়াচ্ছে স্কুলেও যায় নি কেন লতিকা ভাল করেই বোঝে।

রমলা বৌদির দিকে চেয়ে মৃদু হাসে। আজ টুন্‌কু বাবুর মন আজ ভাল নেই বৌদি। চুল আঁচড়ে গা মুছিয়ে দিয়ে ধোয়া জামা কাপড় বের করে দেয়। রান্নাঘরে একবার এস ঠাকুরঝি, চিংড়ি মাছটা তোমাকেই করতে বলে গেছে তোমার বড়দা!

—ওসব থাক্ তুমি রান্না সেরে নাও, মেজ বৌদি এসে করবে খন, ও সব সে ভাল পারে বাপু, শেষে কি অখাদ্য করে ফেল্‌ব?

দীনেশ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীটা অনেক দিন পর জমজমে হয়ে উঠে।

দু'দশটা আলো জ্বলে, ওদিকে রান্নাঘরেও আজ বেশ তোড়জোড় চলছে। দু'তিনটে উনুন জেলে লতিকা রান্না করছে। হরির মা বাটনা বাটছে, রোহিনী তরকারী কোটা ধোওয়া বাছা প্রভৃতি যোগাড় দিচ্ছে, আলোয় তেল দিয়ে চিমনীগুলো মুছে অনেক দিনের পড়ো দেয়াল গিরি ও হারিকেন গুলোর নবজন্ম দিচ্ছে। চাকরটা বিছানা পত্তর ঘর ঝাড় পোঁছ নিয়ে পড়েছে। অশোকা বার বার এসে মাকে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে—ওরা কখন আসবে মা ? ওদের দুই ভাই বোনের মনে স্বস্তি নেই আজ। লতিকা আজ আর রাগ করে না হাসিমুখে উত্তর দিয়ে যায়।

সন্ধ্যে হয়ে আসে। রোয়াক্ থেকে রান্নাঘর ছুটছুটি করে ক্লান্ত অশোকা ধুপ করে গোরাকে কোল থেকে বসিয়ে দেয়। আমি আর নিতে পারছি না মা, সারা বিকেল নিয়ে আছি বলে পা ছড়িয়ে দাওয়ায় বসে। কর্মরতা লতিকাকে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। লতিকা আজ আর বিরক্তি প্রকাশ করে না, এক উত্তর বিশবার দিয়ে যায়। রমলা হেসে বলে—তোমার আজ হল কি বৌদি ? পাড়ার যারা রমলার বরকে দেখবে বলে আসে তারা দেরী দেখে কাল আসবার নিমন্ত্রণ দিয়ে যায়।

যথাসময়ে কোলকাতার দলটি মহা হৈ-চৈ করে এসে পড়ে। অলকা এসেই পিসিমাকে জড়িয়ে ধরে—আমি বাড়ী দেখিছি তোমার। পিসেমশাইকেও দেখেছিলাম কিন্তু চিনি না বলে তখন কথা কইনি পিসিমা—আর তড়িতা পিসিমা ও চিনিয়ে দেয়নি—অশোকা আর টুনকু, ওরাও পেছনে এসে দাঁড়ায়।

বিজন, নমিতা ওরা রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। রমলা আর লতিকা

তখন খুব ব্যস্ত। বিজন লতিকার পায়ের ধূলো নিয়ে বলে—ননদ-ভাজে দেখছি খুব জোর লেগে গেছ, কোমর বেঁধে একেবারে! কথা বলারও ফুরসৎ নেই দেখ্‌ছি—তা না থাক্, প্রণাম করলাম, আশীর্ব্বাদে একটু চা খাওয়াও তোমার অতিথিদের—বলে চলে যায়।

নমিতা রমলার কাছে গিয়ে চায়ের ব্যবস্থায় লেগে যায়। উনুনে কেট্‌লি চড়িয়ে রমলাকে বলে ঠাকুরঝি, কি দিচ্ছ বল? তোমার ঘোড়াটাকে তো ধরে এনেছি এবার, দাও কি পুরস্কার দেবে! রমলা লতিকাকে দেখিয়ে দেয়, বৌদির কাছে নাও আমি জানিনে।

বিনোদ আসে। রমা কোথায় রে? রমলা সাড়া দেয় চাপা গলায়। এই যে এখানেই আছি মেজদা। দাওয়ায় উঠে বসতে বল্‌তে বিনোদ খবর নেয় একে একে।—বৌদির খবর কি? রমা তুই আজও রান্নাঘরে! এঃ, বলে রবীনের চায়ের ফরমাস করে।

ওধারে বিপিনের গলা শোনা যায়। হাঁকডাক লোকজনের ছুটোছুটি ছেলেদের কলরব প্রভৃতিতে বাড়ীটা বেশ একটু কাজের বাড়ীর মত হয়। দেখতে দেখতে পাড়ার মেয়ে ও পুরুষে বাড়ী ভরে ওঠে। বিজন, অলকা, অরুণ ও তার বন্ধু কিশোর এসে রান্নাঘরেই আশ্রয় নেয়।

রমলাকে জোর করে টেনে আনে ওরা বাইরের দাওয়ায়, রান্নায় রান্নায় আজও সারাক্ষণ থাকবে ঠাকুরঝি—

রমলা মৃদু হেসে বলে রান্নায় তো বাঙালীর মেয়ের গৌরব বৌদি, অগৌরবের কিছু তো নেই! বিজন বলে, বড় বৌদি আজ কতদিন পরে বাড়ী এসে সপ্রতিভ হতে পার্‌লুম—উঃ! রবীন্ আমায় কত বড় অপরাধি যে করে রেখেছিল—

রমলা বলে—কেই বা তোমায় অপরাধি ভেবেছিল ছোড়্দা কোন্ দিন আমি তো ভাবিনি—অলকা বলে—আমি পিসিমার বাড়ী দেখেছি জ্যাঠাইমা জান? তড়িতা পিসিমা খুব ভাল লোক, কি আদর যে করলে তার ঠিক নেই। অরুণ বলে—জান জ্যাঠাইমা ও একবারে পিসিমার বাড়ীর লোকেদের সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছে, ওস্তাদ মেয়ে! কিশোর ও হাসে—বিস্কুট লজেঞ্জ, ট্রফি, চকোলেট আসে ওর জন্যে!

অলকা বলে তোমাদের যে হিংসে হয় তা জানি—পিসিমা গেলে এবার আরও বেশী করেই যাব—টুনকু-অশোকা ওরা এই ভিড়ের মধ্যে, এত অচেনা লোকের সাম্‌নে কথা কইতে পারে না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে শোনে সবারই কথা। নির্জন প্রায় বাড়ীখানার একসঙ্গে এত লোক সমাগম ওদের ছোট্ট জীবনে এই নতুন।

ও দিকেও বাইরের ঘরে রবীন্‌কে নিয়ে মস্ত জট্‌লা চলেছে। বিয়ের পর এই ওর প্রথম শ্বশুর বাড়ী আসা। দুঃখের দীর্ঘ রাত্রি এ নয়, তাই রমলার রাত্রি তাড়াতাড়ি প্রভাত হয়ে গেল। রবীনের সঙ্গে গভীর রাতে রমলার যখন দেখা হল, রবীন্‌কে প্রণাম করে রুদ্ধ অভিমান বুকের মধ্যে নিয়েই রমলা সংক্ষেপে কুশল জিজ্ঞাসা করেছিল। উত্তরে রবীন্ ওকে খুব কাছে টেনে লজ্জা-সঙ্কোচ, অপরাধ সব মুহূর্ত্তের জন্যে ভুলে কদিনের নিয়ত সাধা মনটাকে চাবুক মেরে মেরে যা শিখিয়েছিল তাই প্রয়োগ করল।

—রমলা আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি—রমলা একবার ওর দিকে চেয়ে মুখ নীচু করল। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌ল জানি।

রাত্রি প্রভাতে সবাই দেখ্‌ল রমলার মধ্যে এসেছে পরিবর্ত্তন।

ওর সারা দেহে-মুখে যা ছিল না এদ্দিন, যেখানে ছিল শুধু রিক্ততার হাহাকার, ম্লান বেদনা, আজ সেখানে এসেছে পবিত্র কমনীয়তা, আনন্দের উজ্জ্বলতা। একটি মাত্র রাত্রির মধ্যে কি বিপুল পরিবর্ত্তন রমলার। লতিকা, নমিতা ওরা আড়ি পেতেছিল, সকালে তারা একটি একটি করে যখন ওদের নিশীথ আলাপের কথা বলে, রমলা আজ আর কিছু বাদ-প্রতিবাদ করে না চোখ নামিয়ে নেয় লজ্জায়।

সকাল হতেই টুনকু ও অশোকা পিসিমাকে খোঁজে ঘুম থেকে উঠেই।—মা, পিসিমা কই? পিসিমা কি ঘুমুবেও না? বলে লতিকা চলে যায় উঠে।

অলকা বলে—ওরে, পিসিমা যে আজ শ্বশুর বাড়ী যাবে, জানিস! অদূরে রমলাকে আসতে দেখে অশোকা দৌড়ে যায়। চোখ ওর ছলছল করে—পিসিমা! তুমি কোথায় ছিলে দেখতে পাচ্ছিলাম না যে। টুনকু কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে—সত্যি তুমি আজ চলে যাবে পিসিমা? রমলা নিরুত্তর।

রমলাকে দেখতে না পেয়ে নমিতা খোঁজে এঘর-ওঘর, লতিকা বলে—মাঝের ঘরটা দেখ নমিতা, ঠাকুরঝি ঠিক সেখানেই আছে। নমিতা বড় জায়ের কথা মত গিয়ে দেখে রমলা কাঁদছে। হাত ধরে তোলে। আজ আর কেঁদ না ঠাকুরঝি, আজ তোমার জীবনের বড় একটা সুখের দিন—অকল্যাণ হবে—ওঠ। বৌদি, আজ যে আমার কি দিন, একদিকে তোমাদের ছেলেমেয়েদের মায়া, ওরা কি রকম ভালবাসে দেখছ তো—এই ছেড়ে যেতে—

পিসিমাকে আজ আমরা তিনজনে সাজিয়ে দেব মা। বলে

অলকা আবদার করে। নমিতা হাসে—দে না বাপু, কে বারণ করছে? অলকার পাছে পাছে অশোকা বেড়াচ্ছে। অলকা বলে ওরে অশোকা, আমাদের পিসিমা আজ শ্বশুর বাড়ী যাবে—মা বললে আমরা সাজিয়ে দেব—আয় ভাই, তুই আমি দেব—কেমন? অশোকা খুব খুসী হয়েছে বলে মনে হয় না। শুধু বলে—আচ্ছা।

—চিরুণী তেলফেলগুলো আন্ তো। বলে রমলার সন্ধানে যায় ও। রমলাকে অনেক করে নিয়ে আসে ডেকে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি পিসিমা—চুপ করে বস তুমি। রমলার দুঃখের মধ্যেও হাসি পায়, মৃদু আপত্তি করেও তাই আবার বসে গিয়ে। অলকা চিরুণী নিয়ে বসে যায়।

বিপিন, বিনোদ ওরা রবীনের পরিচর্য্যা নিয়েই ব্যস্ত বিজন অনেক কাল পর পুরোন বন্ধু মহলের কে কোথায় আছে সেই খবরাখবর সংগ্রহ করতে গেছে।

ছেলেরা আজ আর খেলা-ধূলো করে না, রমলার কাছেই ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তীব্র অভিমানে টুনকু কথা কয় না, গোরা মাঝে মাঝে ঝাঁপিয়ে রমলার কোলে আসে আবার চলে যায় ওর মুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে আপনিই উঠে যায়। ওর শিশু হৃদয় বোধ হয় বুঝতে পারে পিসিমার অকৃতজ্ঞতা।

অশোকা বলে—দিদি আমি সাজিয়ে দেব—

তুই তো ভারি জানিস্ যে দিবি! আমি এবার অনেক রকম চুল বাঁধা শিখেছি, তোকে সব শিখিয়ে দেব—এর পর দিস্। জাপানী খোঁপা করে দোব পিসিমা! রমলা হাত নেড়ে বলে—না না, না, তাড়াতাড়ি যা হয় করে দে বাপু কাজ আছে।

অশোকা ম্লান মুখে বসে থাকে। রমলা নীরবে মাথা পেতে দিয়ে ভাইঝির আদর উপভোগ করে।

রবীন্ খেতে বসেছে, ওকে ঘিরে বসে নমিতারা দু'জায়ে।—আজ আজ আপনার যাওয়া হতেই পারে না, সেই বিয়ের রাত্তিরে এসেছিলেন আর সাত বছর পরে এলেন, একটা দিনও থাকতে হয় তো?

রবীন্ মৃদু আপত্তির স্বরে বলে—উপায় নেই মাপ করুন। রমলার হয়েছে গো? বলে বিপিন তাগাদা দিতে যায়। লতিকা খাবার জন্যে ডাকতে গিয়ে দেখে সেখানে বিরাট পর্ব স্নুরু হয়েছে।

চুল বেঁধে দিয়ে অলকা নিজের প্রসাধনের বাক্স খুলে বেছে বেছে একটা ভাল টিপ বের করে রমলাকে পরাবার জন্যে প্রাণপণ করছে।

নমিতা ঘরে ঢুকতেই অলকা বললে—দেখনা মা—এই টিপ পিসিমার কপালে ভাল দেখাবে না?

—দেখাবে। বাঃ, বেশ চুল বেঁধেছিস তো। অনুযোগ করে অলকা—কেন, তুমি তো টিপ্ পরতে ভালবাস, তোমার কৌটোয় যে টিপ্ আছে আমি দেখেছি গো—রমলা আপত্তি করে—দ্যুৎ টিপ আবার এই বয়সে পরব কি? নমিতা হেসে ফেলে। এইবার মেয়েরা তোমায় জব্দ করবে ঠাকুরঝি।

—বৌদি, তুমি ভাই বাঁচাও। অলকাকে বলে—তখন ছোট ছিলাম যে পাগলী তাই—দে সিন্দুর টিপ দে পরছি।

অশোকা বলে আমি আল্তা পরিয়ে দিই ভাই দিদি!—দে বলে অলকা মুখে পাউডার দিতে যায়।

রমলা মুখখানা সরিয়ে নিয়ে বলে—বুড়ো বয়সে তোরা কি সং সাজাবি, না-কি? নমিতা বলে—এত কি বুড়ো হয়েছ শুনি?

অশোকা পা নিয়ে বাড়িয়ে ধরতে পারে না, এক হাত আল্‌তা মেখে বলে—ও হল না দিদি, পিসিমার বড় পা—নমিতা হাসি সামলে নিতে পারে না।—আজ ঠাকুরঝি তোমার রেহাই নেই বলেই খিল্‌ খিল্‌ করে হাসে। রমলা চাপা তর্জনের সঙ্গে বলে—তুমিও দেখ্‌ছি মেয়েদের মতন!—ভাইঝিরা সাজাচ্ছে, না হয় একদিন সাজলেই! বলে আবার হাসে। তোমার মতন মেয়েদের আজ কাল বিয়েই হয় না, নাও পর, ভাইঝির আদর উপেক্ষা কর না।

রমলা আর পারে না, বাদ প্রতিবাদ করতে। বলে—দে বাপু দে, যা তোদের খুসী কর?

এবার অলকা রুজ, ক্রীম, পাউডার একে একে মুখে ঘস্‌তে থাকে অশোকা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বসে বসে। মুখের পেণ্ট শেষ করে টিপ পরিয়ে অলকা খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আয়না খানা ধরে মুখের কাছে। দেখ দিকিন্‌, কেমন মানিয়েছে তোমায়! মা দেখ ঠিক পেরেছি কিনা দেখ। নমিতা কাছে গিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখে রায় দেয়, ঠিক হযেছে। রমলা আয়নার মুখের বিম্ব দেখে বলে—ঠিক বলেছি; সং সাজানো—মুখ বের করব কি করে বলত বৌদি? তুমি আবার হাস্‌ছ বলে কৃত্রিম কোপ দৃষ্টিতে চায়।

অলকা আল্‌তা পরায়।—কেন মাও তো মাখে মুখে? অশোকা বলে—আমি একটা পায়ে পরাব পিসিমা! ধ্যেৎ,—এই তো পরালি না, আবার!

—দেনা বাপু—তুই সাজাচ্ছিস, ওর তো সাধ যায়, অনেক কষ্টে আল্‌তা পরানো হয়। রমলা উঠে দাঁড়াতেই দেখা যায়, দুপায়ে দুরকম করে হয়েছে নমিতা বলে বেশ হয়েছে এবার! রমলা বলে

হোক্, যেমন পারে দিয়েছে, কেউ নিন্দে করনা তোমরা। প্রসাধন শেষ করে অলকা বলে, এবার কিন্তু কাপড় তোমায় পরে নিতে হবে পিসিমা, ঐটী আমি পারব না—রমলা হেসে বলে—তা পারুবি কেন, ভূত সাজাতেই শুধু পারিস্। নমিতা বলে সবই পারলি গিন্নীপন্না করে, আর পিসিমাকে কাপড় পরিয়ে দেবে কে? বলে রমলার পায়ের আল্‌তার দিকে চেয়ে হেসে বলে—দাঁড়াও ঠিক করে দি, নইলে সবাই হাসবে যে, পরানো দু'পারে দু'রকম হয়েছে। কাপড় খানা সাদাসিদে পরা দেখে অলকার পছন্দ হয় না। কুঁচিয়ে পর না পিসিমা! বলে দিতে আসে আগ্রহ করে কোঁচ দিতে? লতিকা চুড়ী আর জামা কাপড় নিয়ে আসে এই সময় তোমার কাপড় পরা হয়ে গেল যে! ওখানা ছেড়ে ফেল, তোমার বড়দার দেওয়া এই গুলো পর বলে নমিতার হাতে দিয়ে যায় তাড়াতাড়ি চলে।

—চুড়ি ক'গাছা পরে নাও ঠাকুরঝি, বলে এগিয়ে দেয় ওর হাতে। রমলা বলে—তুমি পরিয়ে দাও, নইলে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। পিসিমাকে নতুন কাপড় গয়না পরা, সাজ গোজ করা কোন দিনই টুন্‌কু, অশোকারা দেখেনি, আজ তাই অবাক্ বিস্ময়ে মূক্‌বালক বালিকারা রমলাকে দেখ্‌ছিল এমন করেই যে রমলার কান্না পাচ্ছিল ওদের সেই দৃষ্টি আর নির্ব্বাক স্তব্ধতায়। দুরন্ত যারা তারা আজ কয়েক ঘণ্টা যাবৎ একাদিক্রমে এমন ছবির মত চুপচাপ থাক্‌তে পারে, এ যে কল্পনারও বাইরে তার! তাই ও যে দিকে যখন ঘুরছে ফিরছে সেই দিকে ওরা ও অমনি ঘুরছে আর ওরই পানে শুধু চেয়ে আছে আহার তৃষ্ণা খেলা সব—ভুলে, এযে শিশুর জীবনে সম্ভব, একথা নিজেই কোন রকমে বুঝতে পারে না। কে জানে ওরা আমায় কি ভাব্‌ছে, কেজানে

এরপর আর কোন দিন এই রকম ভালবাসতে পারবে কিনা—হয়ত এত বড় স্নেহ আমিই আজ ভেঙ্গে দিয়ে চলে যাচ্ছি; এরপর জীবনে ওরা কোন দিনই কি পারবে ক্ষমা করতে? হয়ত পারবে না বা। টুনকুকে বলে বাবা, একবার বড়দাকে ডাক্ তো। টুনকু ওঠে ও না সাড়াও দেয় না—অলকা বলে আমি ডেকে দিচ্ছি—

বাইরে বিপিনের কণ্ঠস্বর শুনে নমিতা ঘোমটাটা একটু টেনে দেয়! বিপিন বাইরে থেকে ডাকে রমা! ডাকছিস্?—হ্যাঁ বড়দা—বলে লজ্জায় ও বেরুতে পারে না—বড়দার সঙ্গে কথা কইবে কি করে। দরজার ভেতর থেকেই বলে—বলছিলাম কি, টুনকু আর অশোকাকে কি পাঠাবে বড়দা? তাহলে নিয়ে যাই—

বিপিন দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে—তোমা অস্ত প্রাণ, যাও নিয়ে আমি আর কি বল্‌ব? তাহলে তাড়াতাড়ি সেরে-নাও আর খুব দেরী নেই বিশেষ।

—আচ্ছা বলে রমলা লতিকাকে ডেকে আন্‌তে যায় ছুটে। মুহূর্ত্ত মধ্যে টুনকু, অশোকার মুখের বিষাদ চিহ্ন অন্তর্হিত হয়ে যায়, বৌদি তুমি ওদের জামা কাপড় চাট্টি দাও-ভাই, ওরা চলুক।

নমিতা আর অশোকা দুজনে মিলে ক্ষিপ্র হাতে দেয় ওদের সব গুছিয়ে। ওদের ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেয়। পিসিমার সঙ্গে যাবার আনন্দে ওরা চপ্পল পায়ে, সেজে গুজে হরিণের মত ছুটাছুটি করে। রমলার মনটা ও অনেক খানিই শান্ত হয়।

গাড়ীর সময় হয়েছে বৌদি, দাও দুটো খেয়ে ছুটি আবার বলে বিজন আসে রান্নাঘরে। অরুণ ও কিশোরও আসে। লতিকা সবিস্ময়ে বলে সেকি, তোমার ও সব আজই যাচ্ছ বুঝি একসঙ্গে ওমা!—উপায় নেই বৌদি, থাক্‌লে চল্‌বে না।

রমলার বিদায় মুহূর্ত্ত বড় সকরুণ হয়ে ওঠে এই পরিবারটীর কাছে। বিপিন বিদায় সম্ভাষণ করতে গিয়ে ঠিক ছোট শিশুর মতই কেঁদে ফেলে সবই হল রমা, শুধু বাবার ভাগ্যে দেখা হল না—রমলা প্রণাম করতেই বিপিন বলে। নমিতা লতিকার তো কথাই নেই, কেঁদে চোখ মুখ লাল হয়েছে রমলারও তাই—তবু তার মাঝে আজ অনেকখানি ছিল আনন্দ ওর। বড় বৌদি, তোমরাও যদি এমন করে কাঁদ দুই ভাজের হাত ধরে রমলা বলে। তাহলে আমি কি যেতে পারি? আমারই কি এখান ছেড়ে যেতে মন চাইছে? কিন্তু তবুও যেতে হবে আমায়—অলকা এসে পায়ের ধুলো নিয়ে নত মুখে দাঁড়িয়ে থাকে, কোলে গোরাচাঁদ। রমলা অলকার মুখ চুম্বন করে গোরাকে বুকের ভেতর চেপে ধরে প্রাণপণে। বাবা রাগ করিস না—গোরাচাঁদ আধ আধ ভাষায় কত কি বলে নিজের মনের ব্যথা জানাতে চায়, বিনোদ এসে ওকে কোল থেকে নিয়ে রমলার হাত ধরে গাড়ীতে তুলে দিতে যায়। পাড়ার যারা দাঁড়িয়েছিল তারাও অলকারা গাড়ীর কাছে এসে দাঁডিয়ে থাকে বিজনরা টুনুকু অশোকা আগেই উঠে বসেছিল। চোখের জলে সবাই বাড়ী ফেরে। শেয়ালদা ষ্টেশনে তড়িতা, প্রণতা, নকুলবাবু প্রভৃতি সদলবলেই ছিলেন, ওদের নামিয়ে নিতে। বিজনদেরও ওরা ছাড়ে না কাজেই যেতে হয়। পাশাপাশি চলেছে চারখানা গাড়ী হু হু শব্দে।

(২৪)

বাড়ীর দরজায় মঙ্গলকলস, কলাগাছ, আমের পল্লব প্রভৃতিতে সাজানো বিয়ে বাড়ীর মতন গাড়ী এসে দরজায় দাঁড়ায়, অমনি ওপরের বারন্দা থেকে সুগম্ভীর শাঁকের আওয়াজ হয়! নকুল বাবুরা দুই ভায়রা ভায়ে তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে পড়েন এবং পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মতই একজন গাড়ু হাতে আর একজন শাখ হাতে দাঁড়াল, রণেন ওপর থেকে পুষ্পবৃষ্টি করে যেমন রবীন্ আর রমলা নামে গাড়ী থেকে। রবীন্ ওপর দিকে চেয়ে মাথা থেকে ফুলগুলো ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে নকুলবাবুকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়, অম্নি গাড়ুটা বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে ওকে চেপে ধরেন।—পালালে হবে না—অমন লম্বা লম্বা পা ফেলে চল্‌ছ কোথা! তড়িতা গাড়ুটা নিয়ে নেয় ওঁর হাতের। ললিতা ততক্ষণে নীচে নেমে এসেছে। কুমুদবাবু ললিতার হাতে শাঁখটা দিয়ে অদূরে দণ্ডায়মানা রমলার শাড়ীর খুঁটটা টেনে নিয়ে রবীনের কোঁচার সঙ্গে খুব শক্ত করে বেঁধে দিয়ে বলেন—চল এবার রমলার হাত ধরে। নকুলবাবু দুজনের হাত শক্ত করে পরস্পর গিঁট দিয়েছেন আঙ্গুলে আঙ্গুলে এবার দেখ্‌ব কে তোমাদের গিঁট খোলে! বিজন রণেন খুব হেসে ওঠে পেছনে, ছেলে গুলো অবাক হয়ে দেখে, রমলা ঘোমটা আর একটু টেনে দেয়, রবীন্ নকুলবাবুকে বলে—এসব কি? বলে হাত ছাড়িয়ে নেয়, যেতে দিন মশাই—নকুল বাবু না-ছোড় লোক, জোর করে হাত খানা টেনে দিয়ে ধরিয়ে দেন রমলার হাতের ভেতর।—বৌদি সাবধান, ধরুন খুব জোরে এবার—আর যেন না ফস্‌কায় খুব হুস্

করে—আবার সবাই হেসে ওঠে হো হো করে। এবার রবীনও মুচ্‌কি হাসে। এসব পাগলামি বুদ্ধি কার? যারই কেন হোক্ না তুমি চল—বলে ওদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি চল্‌তে থাকেন, তড়িতা শাঁখ বাজাতে বাজাতে সর্বাগ্রে যায় কুমুদবাবু জলের ঝারা দিতে দিতে তারপর. মাঝখানে ওরা পেছনে তড়িতারা সিঁড়িতে উঠতে কুমুদবাবু মাঝে মাঝে পেছনে চেয়ে বলেন—বৌদি হুঁসিয়ার, খুব হুঁসিয়ার, দেখবেন হাত যেন না ছাড়ে। ওপরে উঠে রতন বাবুর ঘরের কাছে গিয়ে রবীন হাত ছাড়িয়ে নেয়, তারপর ঘরে ঢুকে দেখে গিরীন্‌বাবু এবং রতনবাবু উদগ্রীব হয়ে বসে আছেন। রবীন ওঁদের প্রণাম ও নমস্কার করে বেরিয়ে আসে, বিজনও যায় ওঁর কাছে। এর-পর যায় রমলাকে নিয়ে তড়িতারা, রমলা রতনবাবুকে প্রণাম করতেই তিনি গিরীনবাবুর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলেন—বৌমা ওঁর পায়ের ধূলো ভাল করে নাও মা। রমলা গিরীন্‌বাবুকে প্রণাম করে। গিরীনবাবু ওকে আশীর্বাদ করেন—রবীনের মা এসে ঘরে ঢোকেন, অশ্রুসিক্ত চোখে রমলাকে বুকে ধরে গিরীনবাবুর দিকে চেয়ে বলেন—দেখেছেন, আমার ঘরের লক্ষ্মীকে? বলে মুখের ঘোমটা খুলে মুখখানা দুহাতে তুলে ধরে ফিরিয়ে দেখান। গিরীনবাবু প্রশংসা ভরা দৃষ্টিতে রমলার ম্লান সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ দীপ্তিপূর্ণ মুখখানার দিকে একবার ভাল করে চেয়ে চোখ আর ফেরাতে ইচ্ছা হয় না যদিও তবু নামিয়ে নেন দৃষ্টি। তড়িতা হাত ধরে নিয়ে যায় রমলাকে, পেছনে আর সবাই চায়। ও ঘরে তখন খুব হাসি খুসীর ধুম চলছে রবীন্ নিজের ঘরে চলে গেছে।

আজ রতনবাবুর গায়ে অনেকটাই শক্তি এসেছে যেন। তিনিও

অতিথি, অভ্যাগত, জামাই কুটুম্বদের জন্যে অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়েই খাবার ঘরে গিয়ে তদারক করছেন, গিন্নীও সেখানে উপস্থিত আছেন দেখা গেল।

বাড়ীখানায় রীতিমত বিয়ের ধুম লেগে গেছে। অল্প কোলাহলে সামান্য ভিড়ে বেশ মাঝারি রকমের উৎসব বলে মনে হচ্ছে। তড়িতারা উপস্থিত পড়েছে বিছানা বিভ্রাটে। রবীনের শোবার ঘর ফুল দিয়ে সাজান হচ্ছে, তড়িতা নকুলবাবু কুমুদবাবু তিনজনে মিলেই ওঁরা লেগেছেন। এঘরে রমলাকে নিয়ে পড়েছে ললিতারা দু'বোনে। টুনকু অশোকা কাছে বসে আছে।

তড়িতারা এসে দর্শন দেয় এঘরে সদলবলে। কুমুদবাবু বলেন— বৌদি খুব খেটে এলুম কিন্তু, ফুলের যে বিছানা করেছি—আঃ, রাত্রে আমারই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে বুঝলেন, বলে খুব একচোট হাসেন। প্রণতা একটু তর্জন করে বলে তোমরা কি এ ঘর ছাড়বে না? ওরা কোথায়? বিজন, রবীন্? তড়িতা বলে—তা আমি অত খবর জানিনে। বলে ওরা চলে যায়। ললিতা ডাকে—শুনে যা তড়িত। তড়িতা ফিরে আসে—কি বল, সেই থেকে তোমাদের সাজান হলনা! কোন্ কাপড় পরাব বলে দে ভাই—বৌদির আলমারি খুলে দেখে শুনে দিয়ে যা সব, কি মানায় না মানায়—আর ফুলের গয়নার যে ঝুড়িটা এসেছে—তড়িতা বলে—তবে তো আমিও পারি সাজাতে। খাওয়া দাওয়ার ধুম তখনও ওদিকে চলেছে, রণেন আর গিরীনবাবু তার তদারকে আছেন, সেই ঘরেই অপর দিকে বসে বিজন আর রবীন্ গল্প করছে।

খাওয়ার জন্যে ডাক পড়ে রবীন্রা খেতে যায়! তড়িতা শুদ্ধ এবার

যোগ দেয়। গ্লোব নার্শরীর ফুলের গয়নার ঝুড়ি এনে বসে, একবাটি চন্দন আর গোটাকতক লবঙ্গ নিয়ে আসে প্রণতা পেছনে নকুলবাবু। —বৌদিকে কিন্তু আমি চন্দন পরিয়ে দেব।

রমলা ঘোরতর আপত্তি করে কিন্তু তা টেঁকে না শেষ পর্য্যন্ত। তড়িতা বলে—বৌদিকে যেন সপ্তরথীতে আজ ঘিরেছে, সেই থেকে যার যা খুসী সে তাই করছে। কেউ মাথার চুল নিয়ে কেউ মুখ নিয়ে একটা না একটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর চলেছে অত্যাচার।

এবার রমলা মুখ খোলে—দেখনা ভাই অত্যাচার ছাড়া আর কি এই বয়সে আমায় নিয়ে সব কি যে করছ তোমরা তার ঠিক নেই কিন্তু কেউ তোমার কথা আজ শুনবে না—যতই বল রাগ কর। বলে প্রণতা ফুলের গয়না পরাতে লাগল। কুমুদবাবু বললেন—বৌদি, আজই প্রকৃতপক্ষে আপনার ফুলশয্যা রাত্রি—কনে আজ আপনি সুতরাং কথা বলা নিষেধ। আজ আমরা যা খুসী করব—সাজাব, না বলতে পারবেন না। বলে গালচের ওপর প্রণতার এক ধারে কাছে গিয়ে গান ধরেন—'আজি সাজাব তোমারে সমর সাজে, বলি যেখানে যা সাজে'। ঘরের সবাই হেসে ওঠে। নকুলবাবু একটু তফাতেই ছিলেন, উঠে এসে রমলার খুব কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসতেই সবাই হেসে উঠল একসঙ্গে। তড়িতা বলল—ও কি, বেটাছেলেকে মোটেই মানায় না ও ভাবে বসলে। নকুলবাবু ধুপ করে মাটিতেই বসে পড়লেন—আচ্ছা মুস্কিল বটে! মেয়েদের সবেতেই মানায়, আর আমাদের কিছুতে কি ছাই মানায়, মুকুটখানা প্রণতা তখন মাথায় আটকে দিচ্ছে। চমৎকার মানিয়েছে সত্যি, তবু তো আজ কিছু নেই সে চেহারার—নাঃ বৌদির ফুলশয্যের বহর দেখে, ঘটা-পটা দেখে

আমারও আজ নতুন করে বিয়েটাকে ঝালিয়ে নিতে ইচ্ছে মন যাচ্ছে।

প্রণতা বললে উঠে পড় এবার—রমলা দাঁড়াতেই কুমুদবাবু হাততালি দিয়ে উঠলেন সজোরে—চমৎকার মানিয়েছে, আর সাজ ও খুব সুন্দর—কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আজ কেমন লাগছে বৌদি? এই দিন যে আসবে—খুড়ি এই রাত যে আসবে মনেও হয়নি। কিন্তু আপনাদের মিল করলে শেষে কে জানেন? তুচ্ছ, জড় একটা হরিণের মুখ, ইয়া বড় বড় সিং দেখিয়ে? রমলা সিং বৃত্তান্ত কিছুই জানেনা, চেয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে। রমলা ছাড়া সবাই বলে উঠল—হাসির কথা বটে। কিন্তু আর কেন, এবার ছেড়ে দাও বৌদিকে বলে স্বামীর ওপর কটাক্ষ করেন।

তড়িতা ওর গায়ে এক ঠেলা দেয়।—সব হয়েছে কিন্তু বিজয় তিলকই ভুল! আহা! বলে চন্দনের বাটি আর লবঙ্গ একটা তুলে নিয়ে নকুলবাবু এগিয়ে গেলেন, লবঙ্গ চন্দনে ডুবিয়ে গালের কাছে হাত নিয়ে যেতেই প্রণতার দিকে চেয়ে তড়িতা বলে উঠল, দেখবেন সাবধান, হাত পর্য্যন্তই—ঘরের সকলে হো হো করে হেসে উঠল, রমলাও একটু হাসলে। নকুলবাবু বললেন—আজ দোষ নেই, দেখি বৌদি, দুচারটে জায়গায় এখানে ওখানে দিয়ে নাকে একটা বড় করে আঙ্গুল দিয়ে দিয়ে বললেন বাঃ, সুন্দর হয়েছে। এইবার বানপ্রস্থ নিন, চলে যান।

—কিন্তু বিছানায় ফুল ঢাকা সিংটা আছে দেখে শুনে শোবেন—ললিতা চোখ টিপে বলে—আঃ,—দেখুন বৌদি, আপনাকে বসতে

মানা করছেন উনি, ললিতাকে বলেন—তুমি কি চাও বৌদি সিংএর গুঁতোয় আহত হন্? নকুলবাবু বলেন—আশ্চর্য্য করলেন আপনারা হরিণের সিং হল মিলনের সেতু হায়রে! নাঃ, রোমেন্স আছে জীবনে আপনাদের, কিন্তু বৌদি—তড়িতা বলে কি করেন তার ঠিক নেই।—না-না কিছু করছিনে, সর্বশেষে নিবেদন, রমলার হাত ধরে প্রণতা নিয়ে যায়। রমলা ফিরে জিজ্ঞাসা করে—কি বলুন। বিয়ের আমোদ আজ কড়ায় গণ্ডায় উস্থল করব ভাই—অর্থাৎ আড়ি পাত্‌ব, আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে—ললিতা বলে—ওমা তার আবার সাহায্য কি করবে?

—তুমি জান না, একটু জোরে জোরে কথা বলবেন বৌদি যাতে বাইরে থেকে আমরা শুনতে পাই একটু মেহের বাণীই না হয় করবেন। তড়িতা এবার সত্যি বিরক্ত হয়।—একে দীর্ঘ পথ ট্রেনে আসার কষ্ট, তার ওপর তিনঘণ্টা বসিয়ে রেখে, রাত তো কাবার হল আর কখনই বা? কথায় বলে সাজ করতে দোল ফুরোয়। বলে তড়িতা উঠে পড়ে। সবাই এবার গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। নকুলবাবু বলেন—তাই তো বৌদির দ্বিধা—লজ্জা—ভয় আছে তার ওপর বাড়তির ভাগ মানাভিমান ভাঙানোর ব্যাপার কিন্তু—না আর না, বৌদি জোরে জোরে মনে থাকে যেন। প্রণতা চলে যায় রমলার সঙ্গে। কুমুদবাবু পৈতার গোছা বের করে দুর্গানাম জপ করেন! দুর্গা দুর্গা, মা মিল যেন চিরস্থায়ী হয় এবার দেখ মা! ললিতা নকুলবাবু হাসেন, তড়িতা মুখে কাপড় দেয়।

—বৌদির যাত্রা শুভ হোক্, প্রেম জয়ী হোক্—বলে নকুলবাবু লাফিয়ে ওঠেন।

রমলা ঘরে গিয়ে দেখে রবীন একখানা ডাক্তারী বইয়ের মধ্যে সমাহিত হয়ে আছে। দরজার অর্গল বন্ধ করে রমলা থমকে দাঁড়িয়ে যায় আজ কটি বছর পরে আবার ফিরে এসেছে—হ্যাঁ অনেকদিন পর—পরিচিত ঘরখানায় ঢুকেই অতীতের এক বিষাদ-ময় দিনের স্মৃতি চিত্তপটে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। ঘরের চারদিকের সব কিছু দেখে চেয়ে চেয়ে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে, নিজেইও যেখানে যেটী যে ভাবে রেখেছিল আজও সেখানে সেটী তেমনিভাবেই রয়েছে। যাবার দিনের সেই সাজিয়ে যাওয়া বেদনার স্মৃতি সে, তবু—তবু আজ তারই সাথে পায় বর্ত্তমানকে, বেদনার সঙ্গে আনন্দ আজ অনেকখানি পরিতৃপ্তি আনে। দুঃখকে পরাস্ত করে, অতীতকে মুছে দিয়ে অতীতে, তার সামনে দাঁড়ায় আজ রবীন্ বর্ত্তমান। এই আমার ঘর, এই আমার নিজস্ব স্থান, নির্ভরশীল নারীজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ নিরাপদ আশ্রয়, সর্বতীর্থের বড় তীর্থ এই ঘরখানা—রমলা আবিষ্টের মত দাঁড়িয়েছিল।—রমা! কি ভাবছ? রবীনের চকিত স্পর্শে রমলা চমকে বলে, কিছু না! রবীন্ হাত ধরে বিছানায় ওকে নিয়ে যায়। নিজেও বসে ওর পাশে। টেবিলের সবুজ শেডের আলো এসে রমলার সর্ব্বাঙ্গে পড়েছে, নরম ফুলের ওপর বসে দু'জনে। সামনে রমলার পরিত্যক্ত গয়নার বাক্সটার ডালা খোলা, তারই পাশে সেই হরিণের মুখখানা বসানো। আর একটা ছোট টিপয়ে একটা রূপার ডিসে একগাছা দামী সুগন্ধি ফুলের মালা এ সবই তড়িতার কাণ্ড যে, তা ওর বুঝতে দেরী হয় না। রমলা ডিস থেকে মালাটা তুলে নিয়ে রবীনের গলায় পরিয়ে দেয়, তারপর প্রণাম করে নিজের মাথার মুকুটটা খুলতে যায়,

রবীন্ ওর হাত চেপে ধরে—খুল্‌ছ কেন রমা বেশ মানিয়েছে একটু দেখি।

লজ্জায় রমলার আকর্ণ লাল হয়ে উঠে। মনে হয় আর একদিনের কথা—রবীন্ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওরা যে তোমায় কনে সাজিয়েছে দেখ্‌ছি—আনত মুখে রমলা বলে—কনে, না সং বল! রমলার মুখখানা তুলে ধরে রবীন্ বলে যাই সাজাক্, চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু রমলা লজ্জায় সংকুচিত হয়। রবীন্ ওকে আরো কাছে একটু টেনে নিয়ে বলে তুমি এত সঙ্কুচিত কেন হচ্ছ বলত? এত নীরব এত উদাস—কেন, আমাকে ভাল লাগছেনা নয়? লাগবার কথাও নয়, আমি তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি তো—

—না ভাল আমার লাগছে, বলে রমলা ম্লান হেসে বলে সেদিন বয়েস কম ছিল, এগুলো পায় নি মন-প্রাণ, আজ তো আর সে রকম বয়েস নেই, তাই যেন হাসি পাচ্ছে মনে হচ্ছে আমার জীবন নিয়ে ভগবান বুঝি ব্যঙ্গ করছেন আর এই সব এক ঝুড়ি ফুল গায়ে চাপিয়ে দিয়েছে হচ্ছে একটু অস্বস্তিও তাই কি রকম লাগছে। রমলা ফুলের গয়নাগুলো একটা একটা করে গা থেকে খোলে। বড্ড ঘুম আসছে, এবার খুলি। রবীন বলে দেখ না, ওদের কাণ্ডখানা রমা, তোমার ভাল লাগছে না আমায়। কাছের টেবিলে রাখা জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে খানিকটা জল খায়। আঃ, বলে ফুলের মিষ্টি গন্ধ বোধ হয় উপভোগ করে, কাছের ফুলদানীর বড় বড় দুটো ফুলের তোড়া থেকে। মধ্যরাত্রির রুদ্ধ ঘরের বন্দী বাতাস ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন খালি পায়ে ছুটোছুটি করছে অবাধ গতি হারিয়ে। কিংবা রবীন ও রমলার বহুদিনের বাঞ্ছিত মিলনে ফুলের ও বাতাসের মধ্যেও এসেছে

মদির চাঞ্চল্য, তাই রাশিকৃত সুরভিত ফুলের বিবিধ গন্ধে বাতাস হয়েছে আত্মহারা।

মুগ্ধ রবীন্ বলে ওঠে—আজই আমাদের যেন ফুলশয্যা বলে মনে হচ্ছে রমা, নয় কি? রমা মৃদু হাসে। হাস্‌লে যে? রমলা নিরুত্তর। রবীন্ বলে—বলবে না! রমলা তবুও উত্তর দেয় না ফুলের গয়নাগুলো টেবিলে সাজিয়ে রাখে।

হঠাৎ রবীনের নজর পড়ে হরিণের মুখটার ওপর। উঠে সেটাকে হাতে নিয়ে বলে—এটা কি জান? রমলা ঘাড় নেড়ে জানায়, জানে। রবীন এসে রমলার পাশটিতে বসে সেটা ওর মুখের কাছে তুলে ধরে বলে আজকের এই রাত্রিটা কে এনেছে জান? এই কাঠের মুখটা! এর ইতিহাস শুনেছ? রমলা বলে, না।

আর একদিন শুনব আজ ঘুম আসছে।—আজ নাইবা ঘুমলে রমা, কালকেই আমায় চলে যেতে হবে পাক্‌শীতে, বলে হরিণের মুখটা টেবিলে রাখতে গিয়ে কি যেন মনে হয়ে যায়। তড়িতার মত দুষ্টু আর দুটি নেই—দেখ দিকিন্—রমলা জিজ্ঞাসা করে—কি করেছে সে? এই দেখ না, বলে গয়নার বাক্সটা তুলে আনে, এখনো ভোলেনি ও, তোমার সেই পরিত্যক্ত গয়নাগুলো পর্য্যন্ত দিয়ে গেছে এখানে! রমলা একবার ডালা খোলা বাক্সর দিকে তাকায়।

রবীন বাক্স থেকে গয়না বের করে এক একটি করে ওকে পরায়। এটা কোথায় পরে?—কানে।—এটা? কব্জি দেখিয়ে দেয় রমলা, এইখানে। ব্রেস্‌লেটের খিল্ আটকান নিয়ে বাধে গোল, কিছুতেই রবীন্ পারে না, শেষ পর্য্যন্ত অনেক কষ্টে আঁটা হয়। গয়নার খালি বাক্সটা তুলে রেখে এসে রবীন এবার বুকের কাছে রমলার মাথা টেনে

নেয়। তারপর আদরের চিহ্ন এঁকে দেয় রমলার দ্বিধা কম্পিত ওষ্ঠে। রমা হাস্‌ছ না কেন? আজ তোমারই তো বেশী আনন্দের দিন, তুমি যখন একদিন প্রতিজ্ঞা করে গায়ের গয়না খুলে দিয়েছিলে আমার পায়ের কাছে, সেদিন আমি ভাবতে পারিনি, যে তুমি আমায় এমন করে আজ পরাজয় দেবে, সেদিন আমি যা শুনিনি, তাই শুনেছিলেন ভগবান, তাই তোমার প্রতিজ্ঞা তিনি রাখলেন।

তুমি এই ঘরেই আবার ফিরে এলে! আজ দেখছি তুমিই জয়ী হয়েছ। কিন্তু যতটা প্রফুল্ল দেখবার কথা, তোমার মধ্যে যেন তা নেই মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে তোমায় যেন জোর করে টেনে এনে কষ্ট দিচ্ছি—তুমি যেন আমায় চাইছনা, তোমার কি সত্যি আনন্দ হয়নি?

রমলার মুখের খুব কাছে রবীনের মুখ, দৃষ্টি ওর মুখের ওপর অপলক। রমলার চোখে দেখা দেয় গোপন অশ্রু এবার, সে অশ্রু অভিমানের। ধীরে ধীরে আবেগ কম্পিত তরুণী রমলা বলে—ওসব কথা কেন বল্‌ছ? ভাল বোধ হয় খুব বেশীই লাগ্‌ছে, আর তাই বোধ হয় কথা কইতেও পারছিনে, তাছাড়া বাবার কথা বড্ড বেশী মনে পড়ছে তাই—রমলার চোখের জল হাত দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে রবীন বলে—তাই হয়ও তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারছ না রমা? ব্যগ্রকণ্ঠে রমলা বলে—না-না ও কথা তুমি বল না, ক্ষমা করব তোমাকে আমি? তুমি গুরুজন—তাছাড়া তুমি তো কোন দোষ করনি! আর কখনো ক্ষমার কথা মুখে এনো না আমার পাপ হয় যে!

—তবে তুমি কাঁদছ কেন বল! অনুতপ্ত কণ্ঠে রবীন বলে—তোমার বাবার কাছে আর বিজনের কাছে চির অপরাধী হয়ে রইলুম রমা—তার ওপর তুমি আর বোঝা বাড়িয়োনা—রবীনের

কণ্ঠস্বরে অনেকখানি বেদনা ছিল। ব্যগ্র ভাবে রমলাকে বলিষ্ঠ হাতের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করল। রমা, তুমি তো এঘরের সঙ্গে, আমার সঙ্গে একবারেই অপরিচিত নও, তবে আজ কিসের এত কুণ্ঠা তোমার?

রমলা শঙ্কিত কণ্ঠে বলে—অনেক দিন পরে কি না তাই একটু নতুন লাগছে। ছোড়দার ওপর তোমায় বন্ধুত্বের জোর তো আছে, ছোট্ ঠাকুরঝি ও আইবুড় যদি ওদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে পার, হয়ত তোমার দোষক্ষালন হতে পারে —

—আমার চেয়ে তোমার জোরই তো বেশী, দুদিক থেকেই ঘটকালি তুমিই কর —

যারা আড়ি পাত্‌তে গিয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিরাশ হয়ে পালিয়েছিল—নকুলবাবু ললিতাকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করেন—কি খবর, পালিয়ে এলেন কেন? ললিতা এমনিই বলে চলে যাচ্ছিল। নকুলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—এরা দুই মূর্ত্তিতে কোথায় গেল বলতে পারেন?

—কারা?—এই আপনারটি আর আমারটি? বলে নকুলবাবু এদিক ওদিক একবার খোঁজেন।

ললিতা বললে—ওরা চালাক্ আছে এতক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে নিলে আড়ি পাত্‌বে বলে একজন তো বলে শুয়েছিল ডাক্‌তে, ভেবেছিলুম কাল সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্‌ব, কিন্তু উঠেছে দেখ্‌ছি।

—যাক্ তবু ভাল। আমি ভাব্‌ছি হয়ত তাঁদেরও ফুলশয্যে করতে ইচ্ছে গেছে, তাই দুজনে কোথা গোপনে হয়ত—বাব্বা, তোমার মুখে কিছু বাধে না দেখছি। বলে ললিতা হাসির আসন্ন বেগ সংযত করল মুখে কাপড় দিয়ে।

তড়িতা অন্ধকার রাত্রেও মনে মনে নিজের কাছে যেন লজ্জা অনুভব করল। রমলা স্বামীর কথায় এবার হেসে ফেলে—তুমি না করলে ও আমাকে করতে হবে। আমার জন্যে ছোট ঠাকুর ঝর এতটা ত্যাগ-স্বীকার আমি জীবনে ও ভুলব না—সে আমার জন্যে প্রতিজ্ঞা করেছিল কি জানো? সবিস্ময়ে রবীন রমলার দিকে চায় —

উচ্ছ্বসিত রমলা বলে—প্রতিজ্ঞা করেছিল —

আমি না এলে বিয়ে করবে না,—তার আন্তরিকতার জোরই আমায় আজ তোমার কাছে ফিরিয়ে এনেছে তা জান? বলে সগর্বে চায় স্বামীর মুখের দিকে।

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে রবীন রমলার দিকে চেয়ে বলে—বাঃ, এই তো কথা ফুটেছে, তোমার ছোট্ট ঠাকুরঝির নামেই মুখ খুলে গেল? আমি মনে করিনি তুমি এত গুছিয়ে কথা বলতে পারবে।

—হয়ত পারতুম না, কিন্তু পাছে তা না পারি, এ ভাবনা ও ছোট্ট ঠাকুরঝিই ভেবেছিল, তাই জোর করে পড়িয়েছিল বুঝলে?

বাইরে একটু গুঞ্জন, একটা চাপা হাসির শব্দে বেরিয়ে আসতে চায় রবীন্। রমলা এবার হাত ধরে বসায়। কি হবে গিয়ে? স্তব্ধ রাতের বুক চিরে বাইরে শব্দ স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্রমশঃ—মৃদু কণ্ঠে রবীন্ বলে—ওরা কেউ এসেছে বোধ হচ্ছে —

রমলা হাসে।—বাবা-মা ছাড়া সবাই আছে। ওর চিবুকটায় একটু স্পর্শ করে রবীন বলে তুমি তো দেখছি ভারী দুষ্টু! কাল মুখ দেখাবে কি করে বলত?

—বিকেলে গরম দুধের বাটী নিয়ে শ্বশুরের ঘরে গিয়ে অনেক দিন পরে রমলা বসল, আগের মত।

রতনবাবু কাকে চিঠি লিখছিলেন, রমলার ডাকে মুখ তুলে চাইতেই রমলা দুধটা খেয়ে নিতে বলল—কলম রাখুন, আগে দুধ খেয়ে নিন, তার পর কথা আছে। রতনবাবু সুবোধ বালকের মত পুত্রবধুর কথা রাখলেন! সত্যি-সত্যিই হাতের কলম নামিয়ে রেখে দুধটুকু এক-চুমুকে নিঃশেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন—কি কথা বল তো?

—ছোড়দার সঙ্গে ছোট্ট ঠাকুরঝির বিয়ের কথা বাবা। বললেন—তড়িৎ যে বিয়ে করবে না মা!—যদি করে আপনার কোন আপত্তি নেই?—আপত্তি! কি বলছ তুমি বউমা বিজনের মত ছেলের সঙ্গে বিয়ের আপত্তি হবে কেন বউমা? তুমি যদি ওকে রাজী করাতে পার, সে তো খুব সুখের কথা মা? সে লেখা-পড়া শিখেছে তাছাড়া বড় হয়েছে তার মতামত জানতেই হবে।

—সে ভার আমি নিচ্ছি বাবা। বলে রমলা চলে গেল তড়িতার সন্ধানে। পথে রবীনের সঙ্গে দেখা—সে ডেকে নিয়ে গেল, তড়িতার সঙ্গে পরে কথা বল, পাক্‌সী যাওয়ার উদ্যোগে আজও রবীন ব্যস্ত।

গিরীনবাবু বাজারে কিছু সওদা করতে গেছেন। রবীন ক্লান্ত-ভাবে বলে—কোথায় ছিলে এতক্ষণ, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না? রমলা ঈষৎ হেসে বলে—এর মধ্যে খোঁজা—হেসে বলে—এর মধ্যে খোজা হয়ে গেছে, কেন বলত? একদিন ঠিক এমনি বিদায় দিনেই এ ঘর থেকে চলে যেতে বলেছিলে মনে আছে?—আর লজ্জা দিও না রমা, দুঃখের দুঃস্বপ্নময় রাত্রির স্মৃতি ভুলে যাও। বলে ওর হাত ধরে সুটকেশের কাছে নিয়ে যায়—আজই যেতে হবে?—হ্যাঁ, রাত্রির ট্রেনে যাব। চাকরী তো হয়ে গেল, পোল শেষ হয়েছে, এবার তোমার

কাছেই ফিরে আস্‌ছি। সারা ব্রিজের সঙ্গে তোমার আমার জীবনের খানিকটা অংশ জড়িয়ে রইল।

বিদায় মুহূর্ত্তে আজ রবীন রমলার হাত ধরে বলল, ফিরে এসে যেন দেখি—তোমার ছোড়দার সঙ্গে ছোট্ ঠাকুরঝির' বিয়ের শাঁক বাজ্‌ছে, তোমার জয়। গিয়ে চিঠি লিখ্‌ব—ভয় নেই - আর বোধ হয় সেই চিঠিই আমার আগমন খবরও দেবে। রমলা গলায় আঁচল দিয়ে স্বামীকে প্রণাম করে। রবীন বিদায়ের প্রীতিচিহ্ন দেয় এঁকে প্রণামের বিনিময়ে। রবীন্ চলে গেলে রমলা—সেইখানেই আবিষ্ট হয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ। ভাবে রবীনেরই মনের অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনের কথা। মানুষ যখন বদলায়—এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই—ভাল মন্দে এবং মন্দ ভালতে পরিবর্ত্তিত হয়। তড়িতার ডাকে চমকে ওঠে।—ঠাকুরঝি! যদি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি?—করতে পার। বলে তড়িতা রমলার জিজ্ঞাসু মুখের দিকে চায়। রমলা ওর হাত ধরে বলে—এবার তোমার সেই প্রতিজ্ঞা কিন্তু রাখতে হবে. ঠাকুরঝি, আমি এসে'ছি, আর তো বিয়ের আপত্তির কারণ নেই?

তড়িতা ওকে এক ঠেলা দিয়ে বলে—বিয়ে করে কি হবে?—তোমার না হোক ছোড়দার কিছু হবে তো? তড়িতার গাল রাঙা হয়ে উঠে।—চিরদিন যাকে দাদা বলে জানি, তাকে নিয়ে ঠাট্টা—আজ কাল সবাই তো প্রায় দাদা বলে ভাব করেই শেষ পর্য্যন্ত সম্বন্ধ বদলে দেয় দেখি ঠাকুরঝি। তুমি তো আমার চেয়ে বেশী জান। আমি অনেক বইতে পড়ে'ছি ওখানে—তা ছাড়া লোকের মুখেও শুনি।—তোমার ঠাকুরঝিকে ওলোকের দলে কেন দেখছ, ভাল। বলে হাত ছাড়িয়ে নেয়।

—তা নয় ভাই—তোমার অমত না থাকলে আমি তোমায় ছোট বৌদি করব। কিন্তু তুমি এখন নিজের সদ্য পাওয়া ঘর-বর সামলাও দিকি, তারপর পরের চরকায় তেল দিও। নিজের কে যে সামলায় ঠিক নেই,—এসেই আমার কেন পেছনে লাগা বল? রমলার ওপর দৃষ্টিবাণ বর্ষণ করে সহাস্যে তড়িতা চলে যায়।—শোন ঠাকুরঝি, যেও না,—কি আমায় বিদেয় করতে এলে বুঝি এবার?

যা—খুসী বল, আমি কিন্তু—আমায় বুঝি আর ভাল লাগছে না? বলে তড়িতা সকৌতুকে হাসে।

—আমার ফিরে আসার আন্তরিক প্রার্থনা সফল হল, আর আমার সাধ কর্ত্তব্য কি সফল হবে না? তুমি পরের বাড়ী গেলে যে সহ্য করতে পারব না—তা ছাড়া ছোড়দার সঙ্গে বিয়ে হলে ভয়ের কিছু নেই—

তড়িতা বলে—তাই নাকি, তুমি গ্যারান্টি দিচ্ছ তাহলে? তোমার ছোড়দার সঙ্গে বিয়ে হলে আমি নির্ভয়ই তা-ভাল, তবে হোক! একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে—কিন্তু বুঝে সুজে বৌদি, আগে তোমার ছোড়দা বি-এ পাশ বউ সইতে পারবে কিনা জেনে নিও—

বাধা দিয়ে রমলা বলে—পারবে মানে? ছোড়দার মস্ত সৌভাগ্য বল! পাড়া-গাঁ বলে বড়দা সাহস করছে না বল্‌তে—কেন, পাড়া গাঁয়ে বুঝি মানুষ বাস করে না?—তা আমি জানি। বলে রমলা এবার ঠাট্টা করে। নকুল বাবু ঘরের মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত হতে দুজনেই যায় অবাক্ হয়ে। তড়িতা দরজার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে বসে একটু আরাম করে। তারপর বলে আবার কি মনে করে!—দেখুন বৌদি, বলে তড়িতার অতি কাছে গিয়ে বসেন। তারপর কর্ত্তার মতিগতি

ফিরল! রমলা মৃদু হাসে। কিন্তু বৌদি শেষ পর্য্যন্ত একটা জড় পদার্থ কিনা আপনাদের—অদ্ভুত, লোকের স্ত্রীর সৌন্দর্য্য, প্রেম, মাধুর্য্য এরা টেনে আনে আপনাকে—নাঃ হেসে হেসে প্রাণ গেল!

বিপিন, বিজন ওরা এসেছে রমলাকে দেখতে এবং নমিতা অলকাদের পত্র বাহক হয়েও বটে। রতনবাবুর ভগ্নস্বাস্থ্য একবারে ফিরে আসবার নয় বটে, তবু রবীনের মতি-গ তর পরিবর্ত্তনে দীর্ঘকাল পরে আবার চলাফেরা করার মত শক্তি পেয়েছিল অনেকখানি। আজ দোকানে যেতে পেরেছেন। ওরা এসে দেখা পায় না তাই—তড়িতা নিয়ে আসে রমলার ঘরে।

রমলার ঘরে এসেই বিজনের নজর পড়ে হরিণের মুখটার ওপর। টেবিল থেকে তুলে নিয়ে শিং এ হাত বুলিয়ে রমলাকে বলে, কি বড় শিং-রে! তড়িতা রমলার দিকে চেয়ে হেসে ফেলতেই চোখে চোখে ওদের কি তর্জন ইসারা চলে। তড়িতা বিপিনকে বলে জানেন বড়দা, এই শিংটা, সেই গিরীনবাবুর হাতের তৈরী, দাদাকে উপহার দিয়েছেন! বিজন আর একটু মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করে তাই নাকি? ভদ্রলোক খুব গুণী তো! বিজনের হাত থেকে বিপিনও নিয়ে দেখে—বাঃ! উচ্ছ্বসিত তড়িতা বলে—দেখলেন না আপনি তাঁকে—লোকটি বিলেত আমেরিকা সব ঘুরে এসেছে, কিন্তু না বললে কে বুঝবে খুব সাদাসিদে। দাদাকে নিয়ে তিনিই তো এসেছিলেন কিনা সারাব্রিজের অত বড় বড় সব ইঞ্জিনিয়ার-কণ্ট্রাক্টর য়ুরোপের তাদের সঙ্গে উনিও কণ্ট্রাক্ট পেয়েছিলেন, মস্ত বড় বিদ্বান্ বিজনও যোগ দেয়, আমাদের যে উপকার করলেন তিনি, জান বড়দা!—কি রকম? বলে সিংটা যথাস্থানে রেখে বিপিন উভয়ের দিকেই সবিস্ময়ে চাইলে।

রমলা কখন চলে গিয়েছিল, কেউ দেখেনি খাবারের ডিস হাতে ফিরলো,—বড়দা, বাবা তোমায় ডাকছেন—জল খেয়ে দেখা কর। বিপিন উঠতে যেতে তড়িতা বাধা দিয়ে বসিয়ে খাওয়ায়।—বড়দা, আজকের এই দিনটা যে আস্‌বে কেউ আমরা জান্‌তেও পারিনি! হঠাৎ গিরীনবাবু সেদিন দাদার সঙ্গে এসেছেন কলেজ থেকে ফিরে শুন্‌লুম—তারপর দুদিনের মধ্যেই মস্ত এক দম্‌কা ঝড়ের মত কত বড় অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। উনিই এই সিংজীর সাহায্যে দাদার মনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছেন—বিপিন মুখের মধ্যে একটু কি চিবুতে চিবুতে বিস্ময়ের সঙ্গে মাথা নাড়েন—হুঁ! বিজন বলে ওঠে—ওঁর ঋণ অপরিশোধ্য বড়দা—আমার সঙ্গে দেখা হল না তড়িতা—তোমাদের মুখে শুনে এখুনিই দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে যে? রমলা চা হাতে এবার পুনঃ প্রবেশ করে।

তড়িতা বলে এবার ওঁর পরিবারের সবাইকে আসবার জন্যে দাদাকে বলে দিয়েছেন বাবা ওখানকার কাজ তো শেষ হল, দাদারা শীগগীরই চলে আসবে, সেই সঙ্গে গিরীন্‌বাবুর স্ত্রীকেও আনবে।

—আমি যেন খবর পাই তড়িতা—বলে তিনি রমলার ইঙ্গিতে রতনবাবুর ঘরের দিকে গেলেন। তড়িতা বললে নিশ্চয় খবর দেব। যেতে যেতে আচ্ছা বলে বিপিন অদৃশ্য হল। রমলাও আসছি ছোড়দা, তুমি ততক্ষণ খাও—বলে দ্রুত পায়ে চলে গেল।

ওরা চলে গেলে তড়িতার বড় অস্বস্তি লাগে, তবু ভদ্রতা রক্ষা করার জন্যে একথা সে কথার অবতারণা করল।—অলকারা এখানে কবে আসছে ছোড়দা? এই তো গেল দেশে, তাছাড়া কল্‌কাতার অবস্থাও তো বিশেষ ভাল নয় বলে বিজন জবাব দিলে।

অলকা, বেশ মেয়েটি—ওর এবার একজামিনও হল না বোধ হয় দেখ্‌লুম লেখা পড়ায় বেশ ভাল—ওকি, আপনি শুধু চা-টাই খেলেন! বিজন তড়িতার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চায়। অনেকদিন পরে আজ আবার আগের মতন আনন্দ নিয়ে তোমাদের এখানে এসেছি তড়িৎ! উঃ! রবীন্‌ অনেক রকমই দেখালে—বলে তড়িতার উত্তর শোন্‌বার জন্যে উৎসুক হয়। তড়িতা হাতের সেলাইটার দিকেই চেয়ে মৃদু হেসে বলে, একজনের দোষের জন্যে আপনিও তো আমাদের খোঁজ নেন্‌নি, বৌদির খবর, আপনাদের খবর দেবার কি আমাদের খবর নেবার কিছুমাত্র দরকার মনে করেন নি—আজ আপনার রমলা বোন্‌টী এসেছে, তাই শুভাগমন হল! বলে ঈষৎ ঘাড় ফিরিয়ে দুষ্টুমি ভরা চাউনি চায়। তবু মাঝখানে অলকা আমায় খুঁজেছিল—

বিজন বলে বাইরের খোঁজা-ই কি সব তড়িৎ!—অতশত জানিনে। কি অতশত জাননা ঠাকুরঝি? বলে রমলা এসে ওদের পাশে বসে। —তোমার ছোড়দা জল খেলে না বৌদি আমি এঘরে ছিলুম বলে দায়ী করনা যেন—রমলা হেসে বলে—ছোড়দা বোধহয় তোমার বিয়ের আগে আর খাবে না! বলে বিজনের ও তড়িতার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে খুব গম্ভীর হয়েই।—কবে রে? বলে বিস্মিত বিজন রমলার দিকে ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে ধরে। কষ্টে হাসি চেপে রমলা বলে এই বোশেখ মাসেরই শেষে বোধহয়—এটা কি মাস রে? ওমা তাও জাননা বোশেখ মাস! তড়িতার লজ্জারুণ মুখের দিকে সকৌতুকে চেয়ে বলে দিনটা ঠিক করিগে যাই, তবে তো বৌদিদের চিঠির উত্তরে জানিয়ে দিতে পারব!

—তার মানে? তার মানে তড়িতা ওরফে ছোট্‌ঠাকুরঝি, আমাদের

বাড়ীতে যাওয়ার আগে অভ্যর্থনার আয়োজন করতে হবে তো, দিন আর কটা আছে! তড়িতা কৃত্রিম রাগের সঙ্গে বলে উঠে যেতে বলছ না কি বৌদি! বিজন এবার ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে, বেশ একটু লজ্জা পায় তড়িতার মত বিদুষীর কাছে, তারই সামনে ছোট বোন কওয়া মোটেই শিষ্টাচার সঙ্গত নয়।

রমলা বলে আমিই যাচ্ছি, আমার কাজ আছে, বস ছোড়দা—আর একটু চায়ের ব্যবস্থা করে আসি। রমলার প্রস্থানে দুজনেই কিছু বিপন্ন হয়ে পড়ে। নির্জন ঘর তা ছাড়া এই মাত্র যে লজ্জাকর সম্বন্ধ স্থাপনের প্রস্তাব জানিয়ে গেল রমলা। কিন্তু তবু বিজন পুরুষ, তাই সে ভাব সামলে নিয়ে প্রথমে কথা কয়।—রমা যা বলে গেল তা স্বপ্ন না সত্য? তড়িতার দিক থেকে সাড়া নেই দেখে পুনরায় বিজন প্রশ্ন করে, তবু তড়িতা নিস্তব্ধ। চেয়ে দেখে, তড়িতা চেয়ারের হাতলে মুখ ঢেকে বসে।

বিজন উৎসুক হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করে—তুমি আমার কাছে অস্পষ্ট হয়ে থাকবে!—আমি জানি না, বৌদিকেই জিজ্ঞাসা করুন। —কিন্তু আমার মনের সত্য-মিথ্যা, স্বপ্ন-কল্পনার বাস্তব রূপ কি, সে তা জানতে পারে না তোমার অজ্ঞাতে!

তড়িতা এবার মুখ তুলে সহজ সুরেই বলে—দয়া করে দাদা, বৌদি, মা, বাবা, ওদের কাছে জানুন, তারা আমার অভিভাবক, তবে এটুকু বলতে পারি, বৌদি মিথ্যে বলবার লোক নয়, সে যা ভাল বুঝবে করবে—তার ওপর আমার ও ক্ষমতা নেই না বলতে। আমি জানি, বৌদি আমার কল্যাণই করবে।—তোমার মত নারীরত্ন পাওয়া আমার পক্ষে তাহলে আকাশ কুসুম নয়! এ যে বিশ্বাস করতেও পারছিনা

তড়িতা! বিজনের কণ্ঠে অবিশ্বাসের আভাষ সুস্পষ্টতর। তড়িতা এবার সোজা হয়ে বসে। লজ্জার প্রথম বেগ কেটে গেছে, এখন বেশ দ্বিধাহীন কণ্ঠেই বলে—আকাশ কুসুম নাও হতে পারে, এও হতে পারে আপনি ভুল বুঝেছেন!

বিজন স্তব্ধ বিস্ময়ে খানিকক্ষণ পুতুলের মত বসে থাকে। তারপরে বলে হয়ত তুমি আলেয়ার মত আমার কাছে কিন্তু একজন সৌভাগ্যবান লোকের কাছে তুমিই আলো হয়ে দেখা দেবে! ভ্রূ কুঁচকে তড়িতা বলে—কেন এমন অন্যায় ধারণা আমার বা বাবার ওপর হল বলতে পারেন!—হওয়া উচিত নয় কি? আমি তোমার মত বিদ্বান নই, সামান্য একজন এম্‌-বি ডাক্তার, অবস্থাও খুব ভাল নয় মোটামুটি। তা ছাড়া বাড়ী মুর্শিদাবাদ জেলায় অখ্যাত প্রায় এক পল্লীগ্রামে—বলে বিজন হাসবার চেষ্টা করে।

তড়িতা দৃপ্ত কণ্ঠে বলে—সে ধারণা ভুল, অন্ততঃ আমার সম্বন্ধে। বিজন বলে—ভুলই হোক। কিছুদিন আগে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, সত্য হয় স্বপ্নও এই বুঝব। বলে তড়িতার একটু কাছে সরে এসে দাঁড়ায়। চলি আজ তড়িৎ, তুমিও যদি আমাকেই বিয়ে করতে চাও বেশ করে ভাবতে অনুরোধ করি, রবীনের মত মারাত্মক কিছু না হয়। তড়িতা বলে অর্থাৎ—? কাকে বলছেন একথা, নিশ্চয়ই আমাকেই?

বিজন বলে—তোমার দিক থেকে আমার সম্ভাবনা কি করা চলে না ভাব! তুমি ডবল এম-এ যদি হও আর দুদিন পর আর যদিই বা কেন, পড়ছ যখন হবেই—বাধা দিয়ে তড়িতা বলে তাতে কি তখন আপনার হিংসে হবে! আমার স্ত্রী ডবল এম, এ বলে।

বিজন আমতা আমতা করে বলে, না তা হবেনা সত্যি কিন্তু তুমি

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নাম করা ছাত্রী, একটা অলঙ্কার বলতে গেলে, তোমার জীবনের পরিণতি পল্লীর প্রাণহীন, ছোট্ট, অশিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে, তাদের গণ্ডীবদ্ধ দৃষ্টির সামনে কতক্ষণ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে বল। সংকুচিত আবহাওয়া তোমার উচ্চ শিক্ষাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে কি পারবে? সংঘর্ষ আরম্ভ হবে, আর তোমাকেই দেবে আঘাত।—যে শিক্ষার মধ্যে ত্রুটি থাকে সেই শিক্ষাই মানুষকে সহিষ্ণু করে তুলতে পারে না। ভাল, তুমি যা বোঝ কর। বলে চলে যায় বিজন, তড়িতা সেই ভাবেই বসে থাকে।

রমলা চা নিয়ে প্রবেশ করে।—কৈ ছোড়দা কৈ? রমলা তড়িতাকে জিজ্ঞাসা করে। মুখ তুলে চাইতেও লজ্জা করে তড়িতার।—বোধহয় বাবার ঘরে। রমলা চলে যায় খুঁজতে। একটু পরে ফিরে আসে এ ঘরে।—কি হল অমন করে বসে যে? তড়িতা রাগের ভাণ করে বলে যা বিপদে ফেলে গিয়েছিলে বাব্বা!

রমলা হেসে বসে পড়ে ওর গায়ের ওপর, তারপর মুখখানা তুলে ধরে বলে—বিপদ থেকে তার ফল কি হল তাই শুনি? ভাল না মন্দ হল?—তা অত জানিনে, তোমাদের ব্যারিষ্টারী জেরার উত্তর আমার যোগায় না অত! তুমি যা ভাল বুঝবে, তাই হবে এই বলে কাটিয়েছি।—ক্ষিপ্র পায়ে তড়িতা চলে যেতে চায় রমলা ওর হাত চেপে ধরে।—ছাড় সব সময় ও সব ভাল লাগে না বলছি,—ওরে বাবা! খুব রাগ দেখছি যে আমার ওপর!—না রাগ নয় পড়তে হবে না?—তা হোক অত চট না দাঁড়াও। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ফিক করে হেসে তড়িতা বলে যাও, ভাল লাগে না—আমার পড়া আছে। ও চলে যায় রমলার মন ভরে ওঠে তৃপ্তিতে। তড়িতা ছোট বৌদি হবে আর দুদিন পরে।

(২৫)

কিশোরকে ছেড়ে এসে অলকার মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, তার ওপর চিঠি পেয়েছে, সে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে আজাদ ফৌজে যোগ দিতে। কোন দেশে আর কোথায় কখন থাকবে যে, তার ঠিক নেই—কবে দেশে ফিরবে এবং আর ফিরবে কিনা তারও ঠিক নেই। চিঠিখানা হাতে নিয়ে অন্য মনে অলকা বসে আছে নমিতা ডেকে ডেকে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত খুঁজতে খুঁজতে এসে উপস্থিত ঘরে। অলকাকে তেমন ভাবে বসে থাকতে দেখে রাগটা বেড়ে ওঠে।—সেই থেকে যে চুল বাঁধতে ডাকছি, যাওয়ার বুঝি আর সময় হয় না? অলকা পায়ের ফাঁকে চিঠিখানা লুকিয়ে বলে ভাল লাগছে না, একজামিনটা দেওয়া হলনা কিছুনা, তোমাদের যে কি ভয় মা—এত লোক রয়েছে, পিসিমারাও আছে, মামারাও আছে, তোমাদের কে জানিয়ে আসছে বল?

—তোমায় সে বিচার করবার ভার কেউ দেয়নি, সন্ধ্যে হচ্ছে চুল বাঁধবে তো এসো। অলকা মায়ের পেছন পেছন আসে।—দাওনা মা আমাকে পাঠিয়ে ওখানে। ভাল লাগছে না একটু ও সত্যি। মা কোন উত্তরই দেন না—অন্যমনস্ক অলকা ভাবে কালকেই চলে যাবে আর চিঠিখানা এল আজ, উত্তর দেবারও উপায় রাখেনি! মনে মনে কিশোরের ওপর ভয়ানক অভিমান আসে ওর। আবার ভাবে হয়ত ঠিক দিন না যাবার, তাই। উন্মনা অলকার চোখে ঘুম নেই—আহারে রুচি নেই মুখে কথা নেই, অত্যন্ত মন মরা হয়েই থাকে কদিন, কৈশোরের প্রীতি আজ যৌবনের সন্ধি লগ্নে এসেছে ভালবাসা হয়ে দুজনের মনে, আর এমনি সময়েই চলে আসতে হল?

অরুণেরই ক্লাশ ফ্রেণ্ড কিশোর। পড়া শোনার দিক দিয়ে অরুণ

যেমন স্কুলে সুনাম পেলে, কিশোর তা পায়নি, পড়ার চেয়ে ওর ঝোঁক ছিল, প্রিয় ছিল দেশ এবং জাতির সেবা করার। স্কুল ফেরৎ ও প্রতিদিন যায় ব্যায়াম সমিতিতে, অলকাকেও নারী ব্যায়াম সমিতিতে ভর্ত্তি করিয়ে দিয়েছিল। ক মাস আগের অতীত আজ অলকার মনের ওপর পর্দার ছবির মঞ্চ পর পর দেখা দেয়।

প্রিয়দর্শন সদ্য-আগত-যৌবন প্রতিভাবান কিশোরের চেহারা অলকার মনের পটে জ্বল জ্বল করে। গত বছর বোমা পড়ার জন্যে পরীক্ষার দিন পেছিয়ে যাওয়ায় ওর কি স্ফূর্ত্তি—ভালই হল অলকা, বেঁচেছি, বিদেশী শিক্ষায় দেশ উচ্ছন্নে গেছে। নেতাজীর দলে গোপনে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে ওর তখন থেকে। মা কখন চুল বেঁধে দিয়ে উঠে গেছেন তার ঠিক নেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রির প্রহর ঘোষণা করেছে—খাওয়ার জন্যে তড়িতা কয়েকবার ডেকে গেছে। অলকার চেতনা লোপ পেয়েছে যেন।

রাত্রি তখন অনেকখানি। অলকা ছাতে গিয়ে বসে আকাশের দিকে উদাস নেত্রে চেয়ে থাকে। ম্লান দুএকটি নক্ষত্র জেগে আছে, শান্ত সমাহিত স্তব্ধ পৃথিবী, অলকা ভাবে কিশোরের বীরত্বের কথা, ওর উদার প্রেমিকতার কথা। কে জানে আর দেখা হবে কি না?—আজ কলকাতায় থাকলে নিজে হাতে যুদ্ধ যাত্রার সাজে সাজিয়ে দিত সে—চেয়েছিল অলকার কাছে কিশোর আদর্শ রাজপুত নারীর ব্যবহার।

কিশোরের কথা-ই হল মনটা দৃঢ় করতে শেখ অলকা, আমার চলার পথ বড় দুর্গম জীবনের পরিধি বিশাল—অলকা ঠিক করে এই পল্লীতেই সে সুরু করবে কাল থেকে কিশোরের আদর্শবাদ নিয়ে নারী সংঘ গঠন করে তাদের জীবন ধারার সুনিয়ন্ত্রণ কাজে পরিণত করতে,

ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীন নারীর সব কর্ত্তব্যে অনুপ্রাণিত করবে গুটি কতক পল্লী রমণীকে নিয়ে। কিশোরের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে ভিত্তি পত্তন এই খানেই নিজের গ্রামে করবে। কিশোরের নিজের লেখা ছোট্ট পুস্তিকাখানা 'স্বাধীন দেশের নারীর কর্ত্তব্য কি'? 'বের করেছিল প্রচারের জন্যে তাকে ও দিয়ে ছিল একখানা। কাল ভাল করে একবার দেখে নিতে হবে—তারপর গোয়াল বাড়ীর অত বড় প্রাঙ্গন পড়ে আছে সেইখানেই পাড়ার মেয়েদের নিয়ে করবে—ব্যায়াম শিক্ষালয়।

*   *   *   *

—আমাকে ভালবাস, কিংবা আমার কাছে ভালবাসার আশা করা তোমার পক্ষে স্বপ্নই থাকবে অলকা। অধীর ব্যাকুলতার সংগে বিছানা ছেড়ে অলকা উঠে বসে। ফ্যাকাসে হয়ে যায় মুখের চেহারা ওর। স্বপ্নেই থাকবে?—হ্যাঁ,—আশ্চর্য্য হয়োনি অলকা, আশ্চর্য্য বলে কিছু নেই আর, সেদিন পৃথিবী থেকে চলে গেছে, সে পৃথিবী আর নেই অলকা।

—কোন্ পৃথিবীর কথা তুমি বলছ কিশোর?

—যে পৃথিবীতে এদ্দিন তুমি ছিলে অলকা—যে পৃথিবীতে এক দিন পদার্পণ করেছিলে, সে পৃথিবীর সন্ধান আজ পাবেনা তোমার আমার চিরদিনের পরিচিত পৃথিবী! তার পরিবেশ ছিল সংকীর্ণ সেখানে শুধু তুমি আর আমি দুজনায় মিলে ছোট্ট একটি নীড় রচনার স্বপ্ন দেখতেই মানুষ অভ্যস্ত ছিল, যেখানে ছিল শুধু অন্তর বাহিরের নিয়ত সংঘর্ষ। অন্তরের সেই মানবীয় বৃত্তি যা মানুষকে জগতে বরেণ্য করে—যে বৃত্তি হল মানব জীবনের চিরন্তন সত্য, সেই সহজাত

হৃদয় বৃত্তির সঙ্গে বাইরের সমাজ নামে বর্ণিত জড় অসত্য ভিত্তিহীন কতকগুলো নীচ মানুষের নিজ হাতে গড়া স্বার্থমূলক মতবাদ তারই সঙ্গে অহর্নিশ হৃদয়ের অকারণ দ্বন্দ। অর্থাৎ মানুষের হৃদয়জাত সহজ স্বাভাবিকতার সঙ্গে অসরলসমাজের বিবাদ। একদিকে মানুষকে পিষ্ট করছে অপরদিকে জাতীয় শক্তিকে দুর্ব্বল করেছে, স্নেহ, প্রীতি প্রেম এরা পেয়ে এসেছে গণ্ডীর অসীম বাঁধন। কিন্তু আজকের এই পৃথিবীতে আর এ সব চলবে না, ফাঁকির নেশা গেছে কেটে অলকা, আর ওসবের জায়গা নেই—একটু জল দাওতো অলকা! দেবে? গলাটা শুকিয়ে গেছে বড়—অলকা বেয়ারাকে জল আনতে হুকুম করে বসে এসে। বেয়ারা জল রেখে যায়। কিশোর বলে—ঘরে সোরাই থাকতে জল আনতে পাঠালে যে?—আমি অসুস্থ তোমাকে জল দেব না। কিশোর জলের খালি গ্লাসটা ওর দিকে ধরে আর একটু জলের ফরমাস করে।—হও অসুস্থ তবু তুমি দেবে জল।—কেন তুমি নিজেই ঢেলে নাও না, বলে অলকা বিরক্তি প্রকাশ করে। কিশোর ওর বিরক্তি দেখে বলে মনের অসুস্থতাই বেশী মারাত্মক অলকা, প্রকৃত অসুস্থ তুমি মনে, আর ঐটা হল বড্ড বেশী সংক্রামক। কিশোর উঠে নিজেই জল নিয়ে খায়। তারপর গ্লাসটা মাটিতে রাখতে নীচু হয়, অলকা ওর হাত থেকে গ্লাস এক রকম কেড়ে নিয়ে রাখে। —আমি তো হাত বাড়িয়ে নিতে যাচ্ছিলুম তবু তুমি কষ্ট করে নীচু হচ্ছিলে কেন বলত? অলকা কিশোরকে প্রশ্ন করে!

—তোমাকে ছোঁব না বলে—তোমার অসুখ, সংক্রমিত হবার ভয়ে অলকা! কোঁচার খুঁটে মুখ মুছতে মুছতে বলে—তোমাদের

ঐ মামুলি সেবা করার নেশা যেমন তোমার মধ্যেও এসেছে, যুগ যুগ ধরে প্রতি পুরুষে নারীরা অর্জ্জন করে আসচে তাদের আগের যুগের আদর্শকেই—তুমিও তার থেকে বাদ পড়নি অলকা তোমাদের নিয়ে যে কতগুলো সংবরণ হল তার খবর আজও সঠিক মেলে না।

অলকার ভাল লাগে না একটুও কিশোরের এ সব বাজে কথা। ওর আজকের এই উগ্রতা অলকাকে আহত করে অথচ সংকোচের বালাইও কাটে না যে! —অরুণ কখন ফিরবে অলকা? এই কথাটি অলকার সংযম ভাঙিয়ে দেয়।

তুমি কি সে—ই?

বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে কিশোর বলে ওঠে—না, সেই কে বললে তোমায়? ইমফলের অত বড় সংগ্রামের পর আজাদ হিন্দ্ সেনা-দলের সৈনিক আমি আজ, আজ আর সেই কিশোর নই। আজ আমার প্রত্যেক স্নায়ুর রক্তে খেলছে সর্বনাশের দুর্দ্দান্ত বিপ্লবের তড়িৎ প্রবাহ—বাঙলায় ফিরে এসে দেখছি জান অলকা? দেখছি এখানকার আকাশে, বাতাসে, সমাজে, রাষ্ট্রে, মানুষের অন্তরে অন্তরে সর্বত্র সেই অতি পুরাতনের জীর্ণ স্থবির চেহারা আর মনে বচ্ছে বর্মার সেই রণক্ষেত্র, যুদ্ধের সেই চঞ্চল জীবন্ত দিনগুলোর বিশৃঙ্খল আনন্দ রক্তের স্রোত। যার মধ্যে পেয়েছি দেখতে জাতীয় ভবিষ্যৎ, তারই উজ্জ্বল চিত্র সেখানকার আকাশে প্রতিফলিত হতে দেখেছি তার আমিও একজন। আমার তারুণ্য আজ বাংলায় ফিরেই তাই চাইছে এখানকার সব কিছুকে নূতন করে গড়তে। অলকা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে সত্যিই তুমি নূতন হয়েই ফিরেছ দেখ্‌ছি। আমার মনে হচ্ছে তুমি যেন আজ আরও সুন্দর আরও বেশী লোভনীয়

হয়েছ আমার কাছে, ইচ্ছে করছে আমিও তোমার মত হই, তোমার সঙ্গে আমায় নাও না কিশোর? আমারও যে এই পুরানো কোন কিছুই সত্যি প্রিয় নয়, বোধহয় মানুষের প্রিয় হতে পারে না।

—তুমি! তুমি পারবে না অলকা, আজও বিলাসের আড়ম্বরকে ভুলতে শেখনি, আজও—না তুমি ভুল বলছ, আমি আমাদের দেশের বাড়ীতে পাড়ায় মেয়েদের নিয়ে তোমার লেখা সেই ব্যায়াম পুস্তিকা নিয়ে নারী ব্যায়াম কেন্দ্র খুলেছি, জানি তুমি আমার মধ্যে কি দেখতে চাও। কিশোর হেসে ফেলে।—ভুল অলকা মস্ত ভুল এ তোমার, তুমি আমাকে পাওয়ার জন্য করেছ, সত্যিকার কাজ করবার জন্যে করনি। সে নারী দেখে আসুক লক্ষ্মীবাইকে। আজও বাংলায় সে রকম নারীর জন্ম হয়নি। তোমারা পুরুষের গোলামী করতে পার অলকা, তার লীলা-সঙ্গিনী হতে পার, পার না তাদের কর্মের যথার্থ সহযোগিনী হয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সৈন্য চালনা করতে। —আর যদি কেউ পারে তাকেও তোমরা মেনে নিতে চাও কই? আমি বাংলায় প্রথম নারীসেনা গড়ব পরিচালনা করব তাদের আমিই একা, তোমারা সে সুযোগ দাও কই? অরুণ আসে, অলকা আজ কেমন আছিস রে? এই যে কিশোর, কবে ফিরলে বলত? কিশোরকে ডেকে নিয়ে চলে যায় অরুণ।

* * *

—তড়িতাকে কেমন লাগছে বৌদি, ও পারে তো তোমাদের মতন কাজ করতে? লতিকা আর নমিতা উভয়েই পরস্পর মুখ চায়, উত্তর দিতে পারে না সহসা। তড়িতা অদূরে বসে কুটনো কুটে থালায় সাজিয়ে রাখছিল, বিজনের গলার আওয়াজ পেয়ে

মাথার কাপড়টা একটু নামিয়ে দিল। বিজন এসে ওর বৌদিদের কাছেই বসে। পারে না বুঝি বৌদি, তাই জবাব দিচ্ছ না? বলে তড়িতার দিবে একবার কটাক্ষ করে নেয়। লতিকা এবার জবাব দেয় কি বলব বল ঠাকুরপো তড়িতার গল্প ঠাকুরঝির কাছে এত শুনেছি যে, এখানে বউ হয়ে আসবার আগেই আমার চেনা হয়ে গেছে ওর সঙ্গে। নতুন করে আর চেনবার দরকার তাই নেই। বিয়ের আগে তোমার দাদার সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়েছিল বুঝলে? —কি রকম? বলে বিজন এবার জাঁকিয়ে বসে। নমিতা বলে—বট্‌ঠাকুর তখন খুব ভয় পেয়েছিলেন—একে বড় লোকের মেয়ে, তায় বিএ, এম, এ পাশ, আমাদের পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে এসে কষ্ট দেব, বাস করতে পারবেনা, এই সব ভেবে। এখন ভয় তো ভেঙ্গেছে তা ছাড়া ওর উঠোন ঝাঁট দেওয়া দেখে আশ্চর্য্য হয়েছেন খুব—লতিকা উচ্ছ্বসিত প্রশংসমান দৃষ্টিতে তড়িতার দিকে চায় বিজনকে বলে এখন আবার উল্টো সুর; তড়িতার হাতের রান্না খেয়ে, ছেলে মেয়েদের পড়ানো দেখে অবাক! বলে—যার বাপের বাড়ী দশটা ঝি চাকর সে এত কাজ জানলেই বা কি করে, উনি যতই করুন, তোমরা বেশী খাটিয়ো না তাই বলে! সত্যি ঠাকুরপো তোমার পত্নীভাগ্যি খুব ভালই, আজ যদি বাবা থাকতেন সার্থক হত ভাই। অশোকা এসে খাবার চায়—কাকীমা ক্ষিদে পেয়েছে খুব, আজ আমি এতক্ষণ ধরে অঙ্ক কষলাম, আর পারিনি বলতে পাবে না হ্যাঁ—বলে নমিতার কাছে দাঁড়ায়। বিজন জিজ্ঞাসা করে—কি পড়িস্? কোন ক্লাস তোর এবার? লজ্জায় অশোকা মুখ নত করে।—কি জানি কাকামনি, বোধ হয় ক্লাস ফাইভ

হবে। আর কি করিস্?—কত কি করি সেলাই করি রান্নাও করি—লতিকা হেসে বলে আমি ওসব খবরও রাখিনে।

*　　*　　*　　*

আমাদের দেশ কেমন লাগল ছোট ঠাকুরঝি? বলে রমলা তড়িতার মুখের চেহারা দেখে। তড়িতা সরল ভাবেই বলে—আমি তো ভাই পাড়াগাঁয়ে কখনো যাইনি, আমার ভালই লাগল।

রমলা বলে—বড়দার খুব ভয় হয়েছিল ঠাকুরঝি, তুমি পাশ করা মেয়ে বলে, কিন্তু সে ভয় ভেঙেচে শুধু নয়, বড়দা তোমার রান্না খেয়ে অবাক হয়েছিল সেদিন। তড়িতা বলে বাংলাদেশের পুরুষদের ধারণা মেয়েরা লেখা-পড়া শিখলেই একটা বাঘ ভালুক বিশেষ হয়ে যায়! সবাই প্রায় ভয় করে আমাদের, কিন্তু তোমার ছোড়দাই একটু অদ্ভুত মতের পরিচয় দিয়েছে।—তাই-নাকি, ভাল!

(২৬)

—অলকা, আজ আবার বিদায় নিতে এসেছি, তুমি সেদিন অসুস্থ ছিলে, আজ কেমন আছ? বলে কিশোর হঠাৎ ঝড়ের মত অলকাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে এসে দাঁড়ায় এবং প্রশ্ন করে। অলকার সামনে খোলা রয়েছে টেবিলে নতুন মানচিত্র খানা সেখানার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসেছিল অলকা। আর ক'দিন পরেই ওর পরীক্ষা। কিশোরের আগমনে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।—বস তোমার সঙ্গে কথা আছে। বলে একবার অরুণের খোঁজে বেয়ারাকে পাঠায় তারপর এসে বসে। খুব ব্যস্ত যে মনে হচ্ছে—বলে সৈনিকের পোষাকধারী কিশোরের বীরত্ব ব্যঞ্জক প্রতিভা দীপ্ত সুদীর্ঘ ললাট দীর্ঘায়ত চোখের

দিকে তাকায়। আজ যে দেখছি আজাদ হিন্দ্ পোষাক পরা হয়েছে আবার কোথাও যাওয়া হচ্ছে বুঝি? অলকার কণ্ঠের স্বরে বিস্ময় ক্ষোভ, বেদনা, বিদ্রূপ মিশ্রিত ছিল। কিশোরের বুঝিতে দেরী হয়নি। বলে অসুস্থ অবস্থাতেও রোজ চিঠি লিখেছ আসতে, কিন্তু অপরাধ-ক্ষমা কর অলকা, আমার আর সময় নেই। এখন বাইরের জগৎ হাতছানি দিয়ে ডাকছে, কর্মের আহ্বান এসেছে আর অলস দিন যাপনের সময় নেই। আজ গবর্ণর হাউসে ডাক্ পড়েছিল, ফিরছি। বেয়ারা এসে জানিয়ে দেয় অরুণ বেরিয়ে গেছে। অলকা মনে মনে হাঁপ ছাড়ে। আচ্ছা বলে বেয়ারাকে বিদায় দিয়ে অলকা প্রশ্ন করে—কেন সেখানে কি কাজ ছিল?—কাজ! রেঙ্গুন ন্যাশানাল গার্ড তৈরী হয়েছে এবার,—তাই তার মধ্যে যোগ দিতে—শিবির তৈরী হয়েছে সহর থেকে কিছু দূরে ময়দানে, সেইখানেই এখন থাকতে হবে, তাই বিদায় চাইছি অলকা, হয়ত আর দেখা হবে না—তুমিও তৈরী হও বাংলার নারী জাগরণ কাজে আত্মনিয়োগ কর, দাসত্ব বৃত্তি নিয়ে বিবাহিত জীবনের গণ্ডীতে আবদ্ধ হবার দিন আর নেই অলকা। তোমার বুদ্ধি প্রতিভা বিদেশী পাশ কোর্স নিয়ে একজামিন দিয়ে অর্থকরী পুরুষাণি বিদ্যা অর্জন করতে গিয়ে নিজের স্বভাবকে হারিয়ো না—দেশ বিদেশের নারীকর্মীদের আদর্শ নিয়ে বাংলার নারীদের পক্ষ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়—অলকার হাসি পায় ওর বক্তৃতায়।—বলে ঝাঁপিয়ে, তো পড়তে বলছ, কিন্তু সে কোথায় ঝাঁপ বলতে পার? আগুনে, জলে?—দেশের এত বড় দুর্দ্দিনের মুহূর্ত্তে ব্যঙ্গ করার সময় নয় অলকা—দিকে দিকে এত কাজ ছড়ান আছে যে বলবার নয়, সমস্ত নরনারীর মিলিত চেষ্টায় অন্ততঃ দশ বছরের

সমস্ত শক্তি নিয়ে একনিষ্ঠতার সঙ্গে যদি ত্যাগ স্বীকার করতে পারে তাহলেই এদেশের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরবে—সমাজের রাষ্ট্রের চেহারা বদলাবে।

—তোমার মাথার গোলমাল হয়েছে কিশোর—তাই যত বাজে কথার আলোচনা করছ। বর্মা যাবার আগে যে মত পোষণ করতে সেটায় ছিল যুক্তি, কিন্তু এর মধ্যে যুক্তি কোথায়?—হিহি করে ব্যঙ্গের হাসি হেসে ওঠে ও। ক্ষুব্ধ হয়ে কিশোর বলে তুমি আমায় বুঝবার চেষ্টা করছ না তাই বুঝনা অলকা, বুঝেছি তোমার রক্তের মধ্যে বইছে ভোগের তীব্র নেশা, আর আমার রক্তের শিরায় শিরায় বইছে ভাঙ্গা-গড়ার নেশা। আমি চাই ঘুণ ধরা জীর্ণ রাবিশ স্তূপ সরিয়ে নতুন করে সমাজ রাষ্ট্র গড়তে, দুর্গন্ধ পচা ভেপ্‌সানি আবর্জনা রাশি ফেলে দিয়ে নতুন ইমারতের ভিত খুঁড়তে, সেই কাজে সমগ্র সত্ত্বা শক্তি খরচ করে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে—তারই জন্যে বেরিয়েছি, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় দিয়ে তারুণ্যের বলিষ্ঠ মন রঙীন্ আকাঙ্খা নিয়ে। আজ উঠে পড়ে লেগেছি আমার নতুন মাল-মসলায় যে ভিত গাঁথব তা হবে মজবুত যার ওপর বিরাট প্রাসাদ উঠলেও তুচ্ছ ভূমিকম্পে, সামান্যঝড়ে, দুর্দান্ত বর্ষায় এক কণাও পড়বে না সব কিছুই সহ্য করবার শক্তি তার থাকা চাই অলকা। সে রাষ্ট্র সে সমাজ হবে উদার পরিকল্পনায় উন্নত আদর্শে সকলের জন্যে। সেখানে মুষ্টিমেয় ধনীকের বা কংগ্রেস কথিত হরিজন সমাজের এক চেটে থাকবে না সার্বভৌম অধিকার সেখানে প্রতিষ্ঠিত করব আমরা! কিশোরের মুখে প্রতিফলিত হল দৃঢ়তার সংকল্প। অলকা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলে।

—কিশোর! তুমি এত নিষ্ঠুর হলে কেন? যদি তা হয় ফিরে না আস তবে কেন বলছ না আমার কর্ত্তব্য কি? আমি কি করব কেন বললে না এখনো? কাতর মিনতি অলকার প্রত্যেক কথায় ব্যক্ত হয়ে পড়ে হয়ত নিজের অজ্ঞাতে।· অলকা তুমি কাঁদছ? সেদিন কি বলেছিলে? নিজ হাতে বর্ম চর্ম পরিয়ে বিদায় দিতে পারবে, আজ তোমার সে সতেজ মন দেখছি না কেন? তোমার সেই মামুলি প্রথা তো ভুলতে পারনি অলকা! আজ পৃথিবীর তালে তাল ফেলে চলতে শেখ, জেনে রাখ বর্ত্তমান যুগের তরুণ পুরুষ জাতির মন জয় করতে হলে ঐ রকম ঠুন্‌কো ছোট্ট কোন কিছু দিয়ে হবে না, ও রীতি একেবারে পুরাতন। ওঠ শান্ত হও—আমি দেবীর মত পূজো করতে চাই তোমাদের দাস ভাব ছাড় তোমরা।

অশ্রু ব্যথাতুর চোখে অলকা উঠে গিয়ে ধীরে ধীরে সৈনিক কিশোরের কোলের মধ্যে মাথা গোঁজে।—তুমি বাঁচাও আমায় বিয়ে করে যেখানে খুসী যাও, অন্যের হাতে আমায় দিয়ে দেবে কোন্ দিন ওরা! তাই তুমি চাও কিশোর?—না! দৃঢ় কণ্ঠে কিশোর বলে—না, আমি চাই তুমি আদর্শ সমাজ গড়তে সহায়তা কর, পারবে? পারবে নারী জগতে যুগান্তর আনতে? অতখানি শক্তি যদি থাকে, তবে আজ আমাকে ভালবাসতে পার, না হলে ভুলে যাও অলকা, চোখের জলে নিজের মনকে দুর্ব্বল করা হয়। কিন্তু তাতে তোমাদের গৌরব বাড়ে না, পুরুষ সত্যিকার ভালবাসতে পারে না, তাই বলছি ওই তুচ্ছ চোখের জল দিয়ে আর তোমরা আমাদের ধরতে চেওনা, নতুন কিছুর আবিষ্কার কর। ওঠ, কেউ এসে পড়লে লজ্জা পাবে, আজও আমরা অবিবাহিত—কিশোরের স্পর্শে অলকা

যেন আজ নবশক্তি লাভ করে। নিজের আসনে বসে এসে। অভিমানে অপমানে ওর সমস্ত মুখে ফুটে ওঠে।—তুমি আমায় ভালবাস না, তাই ভর্ৎসনা করছ কিশোর, উঃ! অলকা জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে চায় ওর দিকে।

কিশোর অলকার অন্তরের নিভৃত বেদনা বুঝলেও আজ আর প্রকাশ করে না, চাই কাজ, আজ নারীর প্রেমে কর্ত্তব্যে ত্রুটি, কর্ম জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে চিরাচরিত সংসার বন্ধন স্বীকার করে নিতে প্রাণ চায় না ওর—অথচ অলকার ভালবাসায় মুগ্ধ না হলেও আজ, ভালবাসার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে নারীত্বের অপমাননা করতে চায় না ওর বীর হৃদয়। নেপোলিয়ানের কথা মনে হয়ে যায়। উভয় সংকট মুহূর্ত্ত কিশোরের বীর হৃদয়কে বিচলিত করে। যৌনাকাঙ্খা, নারীর পবিত্র প্রেম—না, আজ এই চিরন্তনীর ভেতর এতটা শক্তিকে আবদ্ধ রাখার দিন নয়। কিশোর চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়। টুপী পড়ে থাকে। টেবিলে। অলকা মনে করিয়ে দেয়।—কিশোর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াও আমি কি করব বলে যাও। বল তোমাদের বর্ত্তমান পৃথিবীতে ভালবাসার স্থান নেই? বিয়ের প্রথাও কি উঠিয়ে দেবে? তোমাদের রাষ্ট্রে সমাজে তা হলে কি থাকবে, আর কি থাকবে না বলে যাও। কিশোর পুনরায় এসে বসে। একজন সৈনিক মাত্র আমি অলকা, আজাদ হিন্দ সেনার ব্রত ভঙ্গ করনা অলকা।

অলকার মন কঠিন হয়ে ওঠে। তোমাদের অভিধানে কোন্ কোন্ শব্দ থাকবে, কোনগুলো তুলবে শুনে রাখি, তোমাদের পাগলামীর নতুন পৃথিবীতে নির্বাসিত হবে ভালবাসা, বন্ধন, সদ্য স্বাধীন ভারতের নতুন আইন কানুনে, সমাজের নতুন নিয়মে তা হলে বল মানুষে মানুষ

খাওয়া ছাড়া আর কিছু থাকবে না? অলকার বিদ্রূপের হাসিতে স্তব্ধ কক্ষ কেঁপে ওঠে।

কিশোর ভয় পায় অলকার মুখ চোখের অস্বাভাবিক চেহারা দেখে। তবু অকম্পিত কণ্ঠে বলে—না অলকা—মানুষ এদ্দিন মানুষ খেয়ে এলো, এবার সেটা বন্ধ করা নতুন যুগের আদর্শ।

—তুমিও তো নতুন হয়েই ফিরেছ দেখছি, আজকের অনেক কথা-ই দুর্বোধ্য-তোমার—। বিশ্রী লাগছে—বুঝেছি অলকা, তোমার আমার মত এক নেই আর, তোমার মন স্থিতিশীল, তাই ছোট পরিবেশ ধরে আঁকড়ে বসে আছে, মনের পরিবর্ত্তন হয়নি এত বড় ঝাপটাতে ও। আমি যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎসতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেয়েছি শুধু স্বাধীনতার আনন্দ, শক্তির সাক্ষাৎ লাভ। আমার মনের পরিবর্ত্তন হয়েছে এই তফাৎ। নেতাজীর বাস্তব আদর্শ অনুপ্রাণিত করেছে আমার মনকে। তোমার আশা-আকাঙ্খা-কামনা-আদর্শ সব কিছু আছে, একমাত্র আমায় ঘিরে অলকা। তফাৎ এইখানে—তুমি যে স্বপ্ন দেখ যে কিছু নিয়ে ভাঙা-গড়া কর যত উচ্ছ্বাস, আবেগ কল্পনায় যত ছবি আঁক, যে গান গাও সব তুমি আর আমির গণ্ডিবদ্ধ, তার বাইরে চাওনা সারা দুনিয়ার পানে—কিশোর সহসা যেন অসম্ভব গম্ভীর হয়ে যায়।

—থামলে কেন, বেশ বলছিলে বলে যাও গড় গড় করে—বিক্ষোভ যে মুখে চোখে ব্যক্ত হয় কিশোর তাকিয়েই মুখ নীচু করে। অলকা বলে সকলের জন্যে তোমার কর্ত্তব্য আছে নেই-শুধু আমার জন্যে, এই যদি তোমার উন্নত আদর্শ হয়, তাহলে বলবার কিছু নেই। বাবা-মা-দাদা সবাই জানে এখানকার, একদিন বিয়ে আমার তোমারই সঙ্গে হবে, আমারও এতদিন সেই ধারণা ছিল, তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে

আমাদের এই অবাধ মিলনে কেউ বাধা দেয় না আমিও দোষ মনে করি না। কিন্তু তুমি কি যে আবোল তাবোল বলছ যেন কি রকম—

একটু শুষ্ক হাসি হেসে কিশোর বলে—প্রলাপের পূর্ব লক্ষণ আর কি—এই তো ? কিন্তু আমি কতবড় গুরু দায়িত্ব নিয়েছি জান ? যাক্ আর না অলকা, আজকের বেদনায় গাঢ় যে রাত্রি আসবে আমাদের কাছে—তারপর কাল যে প্রভাত হবে—সেই প্রভাত হবে—তোমার আমার জীবনের নতুন প্রভাত। রবির অভ্যুদয়ের সঙ্গে আমাদের ও নব জীবনের অভ্যুত্থান হবে। পুরান ভালবাসা, আজকের স্মৃতিটি পর্য্যন্ত মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নতুনকে বসাব আমরা। তুমি চলবে একপথে আমি অন্যপথে অলকা ! বেশ দেখছি অদূরে সুসময় ভবিষ্যৎ উঁকি দিচ্ছে আমাদের—আর দেখছি, তোমার আমার পথ এক নয়, একটানাও নয়।

—অর্থাৎ ? ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে অলকা অগ্নি বর্ষণ করে। মানসিক বিপ্লবে প্রেমের প্রত্যাখানে, নৈরাশ্যে ওর সুশ্রী সুন্দর মুখখানার চেহারা বিশ্রী হয়। বেদনার তীব্র গাঢ় ছায়া ফুটে ওঠে মুখে। সুন্দর চোখের দীপ্তি ও জ্বালাময়ী।

—অর্থাৎ তুমি বিয়ে করে সুখী হও, দুচারটি ছেলে মেয়ের মাতৃত্বের গৌরব নিয়ে একজন পুরুষকে স্বামীত্বে বরণ করে ভালবেসে এবং তার দিক থেকে ভালবাসা লাভ করে ধন্য হও অলকা—আর বলনা কিশোর —আর্ত্তস্বরে অলকা বলে ওঠে। কিশোর মুক্তার মত দাঁতগুলির খানিক অংশ বের করে খুব খোলা হাসি হেসে নেয়, কেন অন্যায় কিছু বলেছি ? তুমি মামুলি প্রথায় চলবে, ছোট একটু সংসার পেতে তারই ভেতর আত্মরক্ষা করবে, তোমার চলার পথ ফুল বিছানো নরম। সেই পথে আস্তে আস্তে পা ফেলে একজন তরুণের যখন হাত দৃঢ় করে ধরে নিজের

মুঠোয়, তুমি যাবে একটা সিদে রাস্তায়, প্রশস্ত রাজপথে, আর আমি, আমি যাব গলি খুঁজি ধরে, পথে বহু বাধা বিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অলকা। আমার পথের আশে পাশে পায়ের তলায় আগাগোড়া কুশঙ্কুর, তারই ওপর দিয়ে হন হন করে দুম দুম করে কাদাকে মাড়িয়ে, পায়ের চাপে পিষে দিতে দিতে চল্‌ব, স্বাধীন ভারতের সৈন্য শিবিরের অস্থায়ী ঘরের মধ্যে রাত্রিবাস করব—হয়ত শত্রু বেষ্টিত দেশকে রক্ষা করতে রাত্রির পর রাত্রি জাগতে হবে, হয়ত যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত দেহে বিপক্ষের অস্ত্রের ঘায়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়বে শরীর, ভালবাসার অবসান তাই করতে চাই অলকা! অবসর হবে না সংসার পাতবার. পুরাতনকে সরিয়ে নতুনের সিংহাসন পাতবার কাজ আমার রক্তকে চঞ্চল করে তুলছে।

বিস্ময়ের সঙ্গে অলকা বলে এমন সব আজগুবি কথা শিখলে কোত্থেকে তুমি? এই দু'তিনটে বছর বোধহয় বাড়ী ছেড়ে দেশ ছেড়ে দেশের কাজে যোগ দিয়েছ, এ-রি মধ্যে এত পরিবর্ত্তন হয়েছে? কিন্তু যেদিন গিয়েছিলে, সেদিনও চিঠিতে আশ্বাস দিয়েই লিখেছিলে, মনে করে দেখ—আমার ভালবাসা ফিরে এসে চেয়েছিলে কিনা, এই নারীরই শক্তি-সাহচর্য্য, সঙ্গ সহনীয় তোমার, শেষ পত্রের অনেক জায়গায় সেকথা জানিয়েছিলে—

—নতুন করে মনে করবার দরকার থাকত ভুলে গেলে, কিন্তু আমি অস্বীকার তো করছি না—সেদিনের আমি আজ কই! মানুষের মনের ভাঙা-গড়া নিয়ত রাত্রি দিন চলেছে, একথা তুমি স্বীকার কর কিনা জানিনা, পুরোনর স্থান সেখানেও নেই; সর্বদা নতুনত্বের জন্যে লালায়িত মানুষের মন। তাই সেদিন ভালবাসার জগতে যে মন বিচরণ করত,

সেই মনের ঐ ভাষা ছিল, আজ মনের রঙ্‌ বদলে যাওয়ায় দেখছি, আজকের এই—

—রক্তাক্ত ভারতের দেশ জোড়া অভাব-অনটন-দৈন্য বহু সমস্যার মধ্যে দিয়ে যে ভাবে দেশের গতি মন্থর হয়েছে, এত ঝড় ঝাপ্‌টার মধ্যে দিয়ে তার চলবার রাস্তাখানা ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে, যে আজ এই ভারতের যে কোন অঞ্চলে বসে কোন ভারতবাসী তরুণ, বিয়ে করে সংসার পাতানোর স্বপ্ন দেখতে পারে না অলকা! ব্যক্তিগত স্বার্থ-কামনার স্থান রক্তাক্ত, সদ্য স্বাধীন ভারতে নয়। আজ আমাদের দায়িত্ব নিয়ে প্রত্যেক নর-নারীকে চল্‌তে হবে জীবনের সর্বত্র সব ক্ষেত্রে চাই উদার দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ—মা ছেলেকে, স্ত্রী-স্বামীকে, বোন ভাইকে আঁকড়ে নিজের স্নেহ-প্রেমের নাগপাশে বেঁধে আট্‌কে রাখবার দিন নেই। অলস বিলাসী মনের স্থান নেই আজ এদেশে, রঙীন্‌ স্বপ্ন দেখবার কল্পনার পাখা মেলে স্বর্গরাজ্য ভ্রমণ করবার দিন নয় আজ। আজ চাই সমাজের মরচে তোলার কাজে, রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রত্যেক নীতিকে কাজে লাগাবার জন্যে শক্ত মন, মজবুত স্বাস্থ্যবান মানুষ, অনলস কর্মী নর-নারী। সার্বভৌম ভারতের সাধারণতন্ত্রের আগমনে কাজ সবারই, দায়িত্ব সকলেরই আজ সমান। আমি দেশের আমি সমাজের একজন এই কথা ভাব্‌বার এবং সংস্কার করতে অগ্রণী হবার ঘর থেকে হোক আর বাইরে এসে হোক্‌ তোমাদের ও করা চাই। তোমরা হয় লক্ষ্মীবাইয়ের মত পড় ঝাঁপিয়ে, নয় পেছন থেকে টেনো না দয়া করে এবং পারতো ঠেলে দাও কর্মক্ষেত্রের পথের ধুলোয়, ঝড় জলের মধ্যে। ঘরের মামুলি বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দাও তোমরা—তোমাদের কুসুম কোমল মন হয় শক্ত করতে শেখ, নয় পথ থেকে সরে

দাঁড়াও বাধা হয়ো না। চললাম অলকা, আশীর্ব্বাদ করে যাই তুমি সুখী হও, আমার আশা ছাড়—

উঃ! আর্ত্তনাদের মত অস্ফুট একটা উঃ শব্দ করে অলকা মাথা নীচু করে। আমাকে তুমি গড়ে নাও, অলকাকে অন্যের হওয়ার কথা বলতে তোমার মুখে বেধে যাক কথা—

(২৭)

—রমলা, তোমার সেবায় এ যাত্রা বেঁচে গেলুম—গিরীনবাবু এই সময় ঘরের মধ্যে ঢোকেন ব্যস্ত হয়ে। রমলা ঘোম্‌টা দিয়ে সরে দাঁড়ায় রবীনের বিছানা ছেড়ে। রতনবাবু ও রণেন ওঁরা ছিলেন পেছনে, এখন ঘরের মধ্যে এসে পড়েন। রমলা চলে যাবার জন্যে পথ খোঁজে, রতনবাবু বলেন—বউমা, ওঁকে দেখে লজ্জা করলে চলবে না, উনি তোমার কাকাবাবু—প্রণাম করে আশীর্ব্বাদ চেয়ে নাও। গিরীনবাবু ততক্ষণে রবীনের বিছানায় গিয়ে বসেছেন। ডাক্তারবাবু, সময়ে আসতে পারি নি, পরের চাকরী করি বলে—রবীন্ খুব আস্তে আস্তে বলে—তা জানি।

রতনবাবু রবীনের মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়ান,—রণেন, বৌমাকে জিজ্ঞেস করতো ওষুধ ক'বার দিয়েছিল, বলে টুলের ওপর বসেন। জানেন গিরীনবাবু, গত বুধবার এমন সময় অবসর করতেই পারিনি যে—ওষুধ তিনবার দেওয়া হয়েছে। আমি কি আজ দোকানে যাব মামা? বৌদিই-তো বেশ পারছেন—বলে রতনবাবুর সম্মতির অপেক্ষায় তাকায় ওঁর দিকে!

সকলের চোখ পড়ে রমলার দিকে। বেদানার রস করছে অদূরে বসে রমলা। রতনবাবু বললেন—যাও, আজ গিরীন্‌বাবুও আছেন—তারপর আপনার সব ভাল? বদলি হবেন আবার কোথায়?

—ওই কাছেই, সরষেবাড়ী বলে, ময়মনসিংএর একটা জায়গায়। রমলা বেদানার রস এনে কাচের টেবিলে রেখে দূরে দাঁড়ায়। গিরীনবাবু বলেন—আমি সরে যাই আপনি খাইয়ে দিন বউমা—না বসুন আপনি, আমি এই দিক দিয়ে খাইয়ে দিই! বলে অন্য দিকে যায় রমলা। রবীনবাবু, আজ বউমার দরকারটা বেশ বুঝলে, আমার কথার সত্যতার প্রমাণ আমি ঘরে ঢুকেই পেয়েছি আপনার মুখ দেখে। বলে উপস্থিত সবার দিকেই গিরীন্‌বাবু তাকালেন। ফলের রস হাতে ঘোমটার ভেতর রমলা মৃদু হাস্‌ল।

(২৮)

একি অলকা, তুমি এখানে? এতশক্তি তোমার কোথায় ছিল ঘুমিয়ে?

—ছিল না, তুমি সেদিন দিয়ে এসেছিলে—নিস্তব্ধ রাত্রির স্বভাব গাম্ভীর্য্যের মধ্যে কিশোরের জলদ গম্ভীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল—ছিঃ, তুমি জান অলকা, আমার জীবনের আমার নীতির মধ্যে কোথাও কোন কদর্য্যতার স্থান দিতে আমি নারাজ!

অলকা নত চক্ষে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তোমায় ঘর ছেড়ে এসে এই সামরিক শিবিরে আমার সঙ্গে দেখা করতে শিক্ষা দিইনি—তোমাকে আমি ভালবাসি অলকা, তোমার ঐ কুমারী সৌন্দর্য্য মণ্ডিত যৌবনশ্রীকে অক্ষত রাখবার জন্যেই বিয়ের কথা বলে এসেছিলাম।

দৃপ্তকণ্ঠে অলকা এবার গ্রীবা উন্নত করে বলে একজন ন্যাশনাল সেনাধ্যক্ষের মুখে একথা শোভা পায় না—অন্ততঃ তোমার মুখে এরকম কথা আমি শুনতে চাই না—

কিশোর এবার বেশ একটু ঘাবড়ে গেল অলকার কথায়। তারপর সংযত কণ্ঠে বললে আমায় কি করতে বল অলকা? তোমার নারীত্ব বিকাশ করবার, তাকে বজায় রাখবার ক্ষমতা আজকে আমার নেই, এই অতিবড় বাস্তব সত্য আমি স্বীকার করে এসেছি বলে নিশ্চয় অন্যায় করিনি?

—অন্যায় তোমরা করনা, করি-আমরা, তাই তার সুকঠোর প্রায়শ্চিত্ত ও আমাদেরই করতে হয় চিরদিন!

রূঢ় দৃষ্টিতে অলকার দিকে চেয়ে কিশোর বলে—এ সত্যের সঙ্গে তুমি তবে ঘনিষ্ঠ ভাবেই পরিচিত অলকা, আর তাই যদি হবে তা জেনেও আজন্মের স্নেহনীড় ছেড়ে এলে কেন? জান এর ফল কত ভয়ানক?—জানি, তাই এসেছি ভালবাসার দাবী নিয়ে তোমার—কাছেই আগে আমার দাবী রাখবে কিনা জানতে চাই তারপর—তারপর কি অলকা?—কিছু নয়। বল তুমি আমার কাছে কিছু চাও কি-না?

কিশোর শিবিরের স্তিমিত আলোয় অলকার মুখ ভাল করে দেখতে পায় না উঠে এসে দাঁড়ায় ওর কাছে। অদূরে পেটা ঘড়িতে ঘোষণা করে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর। চমকে ওঠে কিশোর।—এটা বাড়ী ঘর নয় অলকা, সৈনিকদের শিবির আর এই নব জীবনের যে নীতি আমার তা লঙ্ঘন করে তুমি অন্যায় করছ এবং আমাকেও বাধ্য করাচ্ছ। নিশুতি পৃথিবী নিভৃত অন্ধকারের সুযোগে গা ঢাকা দিয়ে তুমি যে দুঃসাহসিক কাজ করেছ, আমাকেও করতে হচ্ছে।

একজন তরুণী নারী তুমি, তোমার ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে একা এই জনহীন শিবিরে আজাদ হিন্দ্‌ সেনার সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে অলকা —তুমি চলে যাও, এখানে তোমার নারীত্ব সম্মান পাবে না, সে স্থান এ নয়, যাও তুমি—অলকা দলিতা ফণিনীর মত এবার গর্জন করে ওঠে। যাচ্ছি তুমি আমায় ভৎর্সনা করোনা মিথ্যে মিথ্যে জান আমি প্রাণ ভয়ে পালিয়ে এসেছি? বাবা তোমার আশা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র আমার বিয়ের চেষ্টা করছেন খবর রাখ কি? তাই এসেছি তোমায় বিয়ে করতে এখানে।

বিস্ময়ে কিশোর নির্বাক হয়ে যায় তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে বসে পড়ে ক্যাম্প খাটে মাথাটা ধরে। অলকা দু'পা এগিয়ে যায় —চললাম কিশোর—দৃঢ় অবিচলিত অলকা শিবিরের দরজায় পথের দিকে দ্রুত পায়ে যায়। কিশোর বলে এক মিনিট দাঁড়াও অলকা —অলকা যেতে যেতে বলে প্রয়োজন নেই। অলকা শিবিরের বাইরে অদৃশ্য হলো কিশোর স্তব্ধ হয়ে তেমনি ভাবে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর যে পথে অলকা গেছে সেই পথ দিয়ে ও বেরিয়ে এল খোলা মাঠে। জ্যোৎস্না রাত্রি, অদূরে অলকাকে দেখা যাচ্ছে, কিশোর ওর পেছনে দ্রুত পায়ে চলতে লাগল। পাহারায় যারা আছে তারা নির্ব্বাক। কাছাকাছি গিয়ে কিশোর ডাকে—অলকা! শুনে যাও,—অলকা ফিরে দাঁড়ায়। তুমি এত রাত্রে এই জনহীন প্রান্তরে যাবে কোথায় অলকা? কিশোর ওর হাত ধরে, অলকার চোখে জল আসে। নারীত্বের অপমানকারী যে, তার কাছে চোখের জল গোপন রাখতে মুখ নীচু করে উত্তর দেয় না।—আমি নিজে গিয়ে তোমায় রেখে আসব কাল সকালে। আজ ফিরে চল আর

যদি সম্ভব হয়—অলকা হাত ছাড়িয়ে নিতে চায়। তুমি ছাড় আমি নিজেই এসেছি নিজেই যাব—কিশোর শক্ত করে ধরে ওর হাত অলকার চোখের জল ওর হাতে পড়ে!—অলকা, তুমি কাঁদছ? কণ্ঠস্বর কোমল। মুখখানা তুলে ধরে হাত ছেড়ে দিয়ে। কেন, কেন অলকা, তোমরা আমাদের ভালবেসে নিজেদের সত্ত্বা হারাও—ওর হাতখানা ধরে একটা ঝাঁকানি দেয় কিশোর। ওর সবল হাতের ঝাঁকানিতে অলকার হাতখানা ঝণ্ ঝণ্ করে ওঠে।—ছেড়ে দাও—না, ছাড়ব না। অলকা জুজুৎসুর প্যাঁচ দেয় হাত ছাড়াবার জন্যে। কিশোর প্রশংসমান চোখে চেয়ে বলে—বাঃ তো বেশ শক্তি রাখ। কৌশলও জান দেখছি—হাতটায় বেশ একটু লাগল, হয়ত ব্যাথা হবে। অলকা ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যায়—অলকা যেও না, আমি তোমায় —তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসি অলকার ওষ্ঠপ্রান্তে মিলিয়ে যায়। পুরুষের জন্যে তাদের ভালবাসায় নারী যেমন অন্ধ হয়ে ছুটতে জানে, এইটাই এতদিন দেখেছ। কিন্তু এটাও দেখ, যে নারীও পুরুষের ভালবাসাকে অবজ্ঞা করে চলে যেতে জানে—তারাও পারে ইচ্ছে করলে প্রত্যাখ্যান করে—তুমি জান না, আমি মুষ্টি-যুদ্ধে, ছোরা খেলায় সেবার মহিলা ব্যায়াম সমিতিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলুম, দেশের সেবায় আমারও অনেকখানি ইচ্ছে আছে আত্ম-নিয়োগ করতে, কিন্তু সে যাক্—আমি জানি কিশোর, আজ তোমরা আমাদের পেছনে ফেলে রাখতে চাও—পাশে নিয়ে কর্মজগতের সঙ্গে পরিচিত হবার, পরিচয় করিয়ে দেবার মত মনোবৃত্তি তোমাদের নেই। যতই উন্নত হয়ে থাক, তবু আজও তোমাদের মনের অন্ধকার, সংস্কার হয়নি জ্ঞানে প্রেমে। আরও দুটো কথা বলে যাই—

বাংলার নারী পুরুষের চেয়ে কিছু কম জাগেনি, কিন্তু তোমরা চাওনা তারা জাগে, তোমাদের আওতায় তারা থাক—এইটাই চাও। অলকা চলে যায়, কিশোর নীথর দাঁড়িয়ে থাকে।—অলকা, দাঁড়াও। নিস্তব্ধ রাত্রিতে প্রান্তরের ধূ ধূ করা ফাঁকায় সে কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়। অলকা সভয়ে পেছনে তাকায়। শুক্ল পক্ষের রাত্রি—চাঁদ অস্তাচলের পথে ফিরছে তখন—হেমন্তের কুয়াশায় আকাশ ঝাপ্সা, চাঁদের আলো ম্লান—চারিদিকের ছোট বড় তাঁবুগুলো তার মাঝে বিকটাকার লাগে। স্তিমিত আলোক রশ্মি কোনটায়, তাঁবু ঘুটঘুটে হয়ে গেছে অলকা ভাল করে একবার সারা মাঠটা দেখে নেয়। গা ছম্ছম্ করে ওঠে। সহসা কিশোরের স্পর্শে ওঠে কেঁপে। পেশীবহুল সবল হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরে কিশোর ওর ভয়-বিহ্বল তনুটা। ওরা বসে পড়ে নির্জন মাঠে। অলকার দেহ কাঁপছে পুরুষের প্রথম স্পর্শে কিশোরের বাহু বেষ্টনীর ভেতর।

কিশোর প্রাণপণে ওকে নিজের বুকে চেপে ধরে।—অলকা এত কাঁপছ কেন, ভয়ে, না আমার স্পর্শে? আত্মান্ধ প্রেম, কিশোরের হৃদয়ে তখন তাণ্ডব ঝড় তুলেছে। নারীর নিবিড় স্পর্শ পুরুষের চঞ্চল রক্ত স্রোতকে উদ্দাম করে তুলেছে। অলকা! অলকা! নীরব ওর দেহলতা। আবেগ কম্পিত কণ্ঠে আত্মহারা কিশোর ওকে নাড়া দেয় আর নাম ধরে ডাকে। পুলকশিহরণ সমস্ত দেহে মাথায় মুহুর্মুহু তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চারিত করে। দুজনেই বিহ্বল। পেটা ঘড়ি ঘোষণা করে রাত্রি দুটো। দুজনেই ফিরে আসে প্রেমের জগৎ থেকে বাস্তবে। অলকার বাঁ হাতে জড়ানো এক ছড়া মালা দেখা যায় উঠতে গিয়ে। কিশোর প্রশ্ন করে হাতে কি ওটা? অলকা কিংকর্ত্তব্য

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিশোর ওকে নিজের বুকে টেনে নেয়। চঞ্চল কণ্ঠে ওকে আবার বলে—কথা কও অলকা, রাত শেষ হয়ে এসেছে দেখ—কিশোর বিদায়মান রাত্রির আকাশের দিকে চায় মাথা তুলে, তারপর দূরে শিবিরের পানে চেয়ে থাকে কেউ এই নিভৃত মিলনের দর্শক আছে কিনা দেখতে। না এত দূরে কেউ দেখতে পাবে না, নিশ্চিত মন আবার বক্ষলগ্না অলকার কাছে ফিরে আসে। গাঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ একান্ত নির্ভরশীলা অলকা, কিন্তু এর মূল্য আজ প্রভাতে ওকি দিতে পারবে? মাথা নুইয়ে দিয়ে ওর মুখের উপর মুখ রেখে আবেশের গভীরতা-পূর্ণ স্বরে অলকাকেই প্রশ্ন করে কিশোর। অলকা, আজ একি স্বপ্ন, একি নতুন অনুভূতি দিলে আমায়? তোমাকে ত্যাগ করে মানবীয় হৃদয় বৃত্তিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রের নীরস যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা নেওয়া প্যারেড করানো একি ভাল লাগবে অলকা?

অলকা মাথা তুলে এবার কথা কয়।—তবে আমাকে যেতে দাও —ও নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিশোর একটু জোর করেই মাথাটা চেপে ধরে বলে—আর একটু সময় আছে অলকা হয়ত আর ঐ শুভ মুহূর্ত্ত জীবনে আসবে না, কিন্তু অলকা—না থাক্ চল তোমায় দিয়ে আসি তোমার মামাদের কাছে রাতারাতি একখানা জিপে, না হলে সকলে যখন কাল খোঁজাখুজি করবে, তখন যে অপরিসীম গ্লানিকর—না—না আর নয়, চল—তুমি দাঁড়াও আমি গাড়ী আনি—কিশোর মুহূর্ত্তের দুর্বলতা পরিহার করে অলকাকে ছেড়ে দেয়। অলকা দৃঢ় কণ্ঠে বলে—যেও না, আমার কাজ শেষ করতে দাও। তারপর—অলকা কিশোরের হাত ধরে। কিশোর

ব্যাকুল দ্বিধাপূর্ণ-কণ্ঠে বলে—হাত ছাড়, রাত্রি ভোর হয়ে এল, আর নয় অলকা—হোক্ ভোর—অসঙ্কোচে অলকা বলে। চঞ্চল কিশোর ভয় চকিত কণ্ঠে বলে—কি বলছ অলকা, তুমি ভুলে গেছ এ ধনীর প্রমোদ গৃহ নয়। গরীবের কুটীরও নয়, এ একটা সেনা নিবাস এক্ষুণি রাত্রি প্রভাত হবে যে, তখন কোথায় তোমায় লুকিয়ে রাখব অলকা? তোমার কুমারী জীবনের যে অমর্য্যাদাকর সম্ভাবনা তারই যে ভয় বেশী। আমার আদর্শকে কলুষিত হতে দিও না, আমারও কৌমার্য্যের বিপর্য্যয় কত বড় তাও কি ভুলে যাচ্ছ? অলকা কিশোরের হাত ছেড়ে দেয়, যাও চলে যাও—জানি তুমি সত্যিকার চাওয়া চাও না—বাধা দিয়ে কিশোর বলে—হয়ত তাই —এই ময়দানে, আমার তাঁবুর পাশে পাশে কত তাঁবু দেখেছ কি? ওই গুলোর ভেতর যারা ঘুমচ্ছে এখন, একটু পরে তারা যে জাগবে অলকা! এ যে আমার কর্মক্ষেত্র, এখানে যারা আছে সবাই বি, এ, এম, এ পাশ ভদ্র সন্তান, আমাদের চেনা অচেনা প্রায় এক হাজার ছেলে আছে কথাগুলো বলবার সঙ্গে সঙ্গে কিশোর ঘুমন্ত পুরীর দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চায়।

অলকা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে—ভুল আমিই করেছি, যাও তুমি—আমার জন্যে তুমি লজ্জার গ্লানি ভোগ যদি কর, আমার কি তাতে আনন্দ হবে ভাব? যাতে তা না হয় তার ব্যবস্থা আমি আগেই করেছি—বলে যাই শোন—তোমার এখানকার দুচার জন জানে আমি তোমার স্ত্রী। সেই পরিচয় দিয়েই আমি তাঁবুতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পেয়েছি তা জান? বলে অলকা হেসে ওঠে। যাবার আগে বলে যাচ্ছি তোমায়। অলকা চলতে সুরু

করে। কিশোর এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করে নেয়--তারপর ডাকে —ফিরে এস যেও না—অলকা পেছনে চায় না চলে যায়।

আপনহারা কিশোর দৌড়ে গিয়ে পেছন থেকে ধরে ফেলে। —কোথায় যাবে এই অন্ধকারে একা? যেতে দেব না তোমায় —যখন আমার সহধর্মিনী বলে আত্মপরিচয় জানিয়েছ এখানকার দ্বার-রক্ষীদের। তখন বাকী সবাই তাই জানবে—তাই জানবার আগে চলে যেতে চায় কিশোর, তুমি তাঁবুতে চলে যাও—তা হয় না অলকা! তোমার অত বড় গর্ব ধুলোয় লুটিয়ে যেতে দেব এমন সাহসহীন নই আমি। আবার বুকের কাছে টেনে নেয় ওকে। তোমার এ স্বীকৃতিকে মেনে নিলাম সমস্ত শক্তি দিয়ে অলকা! আমার বীর হৃদয় তোমার বীর নারীত্বের সমর্থনই করবে অলকা—তোমার হাতের ঐ মালা ছড়াটা বলে দিচ্ছে তুমি ওটা আমার জন্যেই লুকিয়ে এনেছ, বল আননি? অলকায় মুখখানা তুলে ধরে আদর করে বলে, দিয়ে দাও অলকা—সবাই জানুক তুমি আমার ধর্মপত্নী।

বিমূঢ় অলকা ধীরে ধীরে উত্তর দেয়, তোমার জন্যেই এনেছিলুম। কিন্তু লগ্ন চলে গেছে কিশোর, আর হয় না—আমায় যেতে দাও! ব্যগ্র হয়ে কিশোর ওকে কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে—দাও আর দেরী কর না, লগ্ন এখন যায় নি, যায় নি—এখনো রাত্রি আছে, যে মালা আমায় দিতে এনেছ—আর একজনকে দিলে সইবে না আমার যে অলকা—কিশোর ওর হাত ধরে সন্তর্পনে খুলে নেয় মালা ছড়া। তারপর ওকে পরিয়ে দিতে দু'হাতে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করে—গন্ধর্ব্ব মতের উপর বিশ্বাস আছ তোমার অলকা? বল আমার পত্নীত্বে একবার বরণ করলে আর ফিরবে না বল?

ব্যগ্র হয়ে অলকা সায় দেয়।—তবে দিয়ে দাও আমার গলায় মালা—দ্বিধা কেন অলকা? কিশোর ওর হাতে মালা গাছা দিয়ে নিজের গলা নত করে ধরে—অলকা মালা পরিয়ে দেয়—কিশোর নিজের গলা থেকে খুলে অলকার গলায় সেই মালা পরিয়ে দেয়, তারপর বলে ভাল করে তাকাও অলকা আমার দিকে—শুভদৃষ্টি হোক—বলে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে ভাল করে পরস্পরের দিকে চায় উভয়ে—এই নিরালা ময়দানে গভীর রাত্রে ভারতের অতীত যুগের প্রথায় বর্ত্তমান যুগের দুটি নরনারী নিজেদের বন্দী করল। অলকা, প্রার্থনা কর, বন্ধন অটুট হয়ে থাক্। দুজনে উর্দ্ধে আকাশের দিকে তাকিয়ে যুক্তকর কপালে ঠেকায়। চল অলকা এবার তাঁবুতে ফিরে যাই আমরা কাল তোমায় রেখে আসব বাড়ীতে। নিস্পন্দ অলকাকে একরকম টেনে নিয়ে যায় কিশোর তাঁবুর ভেতর গিয়ে অলকাকে নিজের বাঁপাশে বসিয়ে কিশোর বলে তোমায় আমার একটা অনুরোধ আছে অলকা! অলকা এবার ভয়ার্ত্তদৃষ্টিতে চায় কিশোরের দিকে।-তোমার অনুরোধ শুনে ভয় হয় যে—বাধা দিয়ে কিশোর বলে আর ভয় নেই অলকা! আমার প্রতিশ্রুতি আমি পালন করেছি, মনে আছে দু'বছর আগের একদিনের কথা—যদি নারীকেই হয় বিয়ে করতে তবে তুমিই আমার সহধর্মিণী হবে আজ তুমি আমারই সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, ধন্য করলে অলকা! আর এই অনুরোধটি রাখ—আমার হাতে হাত দাও, বল আমায় কোন দিন কর্মপথ থেকে ভ্রষ্ট করার চেষ্টা করবে না?

অলকা হাত ছিনিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।—অত কঠোর প্রতিজ্ঞা নাই বা করালে, যদি কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে বাধ্য

করে পাপ হবে যে ছিঃ! যে সম্বন্ধ আজ তোমার. আমার মধ্যে হল· একে মনে প্রাণে মেনে নিতে হলে অতবড় প্রতিজ্ঞা থাকে না—তা হলে কোন্‌টা চাও বল?—অলকার মুখের ওপর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে কিশোর বলে তা হলে তোমার নারীসেনা বাহিনী গড়্‌বার স্বপ্ন স্বপ্নই থাকবে, আর দেবে না আমাকেও কর্ম পথে অটল থাকৃতে। বল—অবাধ্য হয়ো না অলকা, দেরী নেই বল—ভোরের ঘুম ভাঙ্গানো পাখীরা কাছেই কোথাও করে ওঠে কলরব কিশোর লজ্জারুণ মুখে বলে—আর সময় নেই—ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় যেখানে একটি ছোট্ট টেবিলে রাখা আছে নেতাজীর একখানা আবক্ষ তৈলচিত্র তারই সামনে জাতীয় পতাকা সেইখানে গিয়ে বলে এই পতাকা স্পর্শ করে বল অলকা—বিমূঢ় অলকা যেন জেগে ওঠে, দৃপ্ত কণ্ঠে বলে—তোমাকেও বলতে হবে—আমি প্রতিজ্ঞা যদি ভঙ্গ করি, তোমাকে বিচলিত করি কর্মপথ থেকে তবে সেই মুহূর্তে তুমিও আমায় আমার মৃত্যুদণ্ডই শুধু দেবে না, নিজের হাতে মৃত্যুই দেবে। প্রতিজ্ঞা তোমাকেও করতে হবে। অলকার চোখে মুখে দৃঢ়তরে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠতে দেখে কিশোর।—পারব না অলকা অতবড রূঢ় অনুরোধ রাখা সম্ভব নয় কিশোরের হাত শিথিল হয়ে আসে অলকা তা অনুভব করে। মৃদু হাসি অলকার ওষ্ঠে দেখা দেয়।—তুমি পুরুষ, ভারতের একদল সেনার অধ্যক্ষ, তোমার মন অত লঘু হওয়া ঠিক নয় তো! কিশোর ওর হাত ছেড়ে দিয়ে বলে না—না অলকা তুমি অত কঠোর হতে বল না, নারীহত্যা পাপে লিপ্ত তোমার স্বামী হতে পারবে না, পারবে না—তবে আমাকেও শপথ করিও না, মানুষের দাবী নিতে দাও, মানুষকে

মানুষ ভাবতে শেখ তোমার ধর্মপত্নী কখনো অধর্মের পথে পুরুষকে ঠেলে দেয় না, বরং অধর্ম থেকে বাঁচিয়ে দিতে তার কল্যাণ হাত —শুভকামীমন নিয়ে সব সময় বাংলার নারী সব যুগে দাঁড়িয়ে থাকে।

আবার পাখীর কাকলী এবং তার সঙ্গে প্রভাতের বাঁশীর আওয়াজ হয় প্যারেডের সময় ঘোষণা করে সঙ্কেত। কিশোর এবার উন্মাদনা নিয়ে কর্মজগতের জন্যে তৈরী হয়। ওর একটু আগের সরল মানবীয়তার প্রেমে উদ্ভাসিত মুখ এইবার কঠিন কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। সৈনিকের পোষাক পরতে যায় তাঁবুর অপর দিকে ছুটেই প্রায়। আর সময় নেই অলকা, তুমি অপেক্ষা কর নয়ত ঘুমিয়ে নাও— আমি যাই প্যারেডের সময় হয়েছে—ক্ষিপ্র হাতে পোষাক পরে অলকাও যায় সেইখানে, আমি সাহায্য করি বলে। ব্যস্ত কিশোরের আর ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে ওর। অলকা নিজের জামার ভেতর থেকে একটা ছোট্ট সিঁদুর কৌটা ততক্ষণে বের করে ঢাকনী খুলে কিশোরের সামনে ধরে—ও জুতোর ফিতে বাঁধছে হেঁট হয়ে, অলকা দাঁড়িয়ে। কিশোর মাথা তুলতেই বলে, এখনো একটু বাকী অছে, শেষ করে যাও—আমার সিঁথিতে এঁকে দাও বিয়ের চিহ্ন—বলে মাথা নত করে। কিশোর মন্ত্রমুগ্ধের মত আঙ্গুলে একটু সিঁদুর নিয়ে অলকার সিঁথিতে দিতে উদ্যত হয় আবার বাঁশী বেজে ওঠে। বাঁ হাতে আস্তে ওর মাথাটা ধরে সিঁদুরটা দিতে দিতে বলে—কি ভয়ানক, এখুনি যদি আমার এখানে কেউ আসে, আর না—দুজনেই একসঙ্গে বাইরের দিকে তাকায় উৎকণ্ঠা ও লজ্জার সঙ্গে তাঁবুতে প্রবেশ পথের দিকে। কিশোর অলকার মুখের কাছে মুখ নিয়ে

গিয়ে ছোট্ট একটা চুম্বনের জন্যে উদগ্রীব হয় অলকা। মুখ
—যাও দেরী হয়ে যাচ্ছে—অরুণ হঠাৎ প্রবেশ করে সেই মুহূ
—তোমার—সেনা শিবির—দুজনেই এক সঙ্গে পি
স্বরে চমকে যায়। ফিরে দাঁড়ায় কিশোর—এস অরুণ
ওখানে অলকাকে কিছু দিন রাখ তারপর ওকে আন্‌বো
তৈরী হলে। অলকাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল কিশোর
যেতে দেখা গেল আনতমুখী অলকাকে। সদ্য সিঁদুরাঙ্কি
ওর ভোরের প্রভাত সূর্য্যের লাল আভা এসে আবছা পড়ে
কোণের পথ দিয়ে, তারই দীপ্তিতে অলকাকে চমৎকার
অরুণ বিস্ময় বিহ্বল ওর দিকে চায়, কিশোর তৃতীয়
সঙ্গে দ্রুত পায়ে অরুণের দিকে চেয়ে বেরিয়ে যায়, টুপি
পরতে পরতে।—বিশ্রাম কর অরুণ ফিরে আসছি বলে
তারপর শোনা যায় প্যারেডের সমবেত পদধ্বনি মাঠে।

শেষ